হুমায়ুন নামা

همایون نامه

গুলবদন বেগম বিরচিত

گلبدن بیگم بنت بابر بادشاه

বাংলা একাডেমী : ঢাকা

প্রথম প্রকাশ
চৈত্র, ১৩৭৮
[এপ্রিল, ১৯৭১]

প্রকাশক

ফজলে রাব্বি

পরিচালক

প্রকাশন-মুদ্রণ-বিক্রয় বিভাগ

বাংলা একাডেমী, ঢাকা-২

মুদ্রক

মানিক লাল শর্মা

মনোরম মুদ্রায়ণ

২৪, শ্রীশদাস লেন, ঢাকা—১

অনুবাদকের কথা

পাক-বাংলা-ভারত উপমহাদেশে মোগল শাসনের ইতিহাসের এক-গুরুত্ব-পূর্ণ অধ্যায় জুড়ে রয়েছেন সম্রাট হুমায়ুন। সম্রাট বাবুর এদেশে মোগল শাসনের যে প্রথম ভিত্তি রচনা করেন, সম্রাট হুমায়ুন সে ভিত্তিকেই সুদৃঢ় ও সুবিস্তৃত করেন। কেমন করে তিনি তা করলেন তারই সংগ্রামমুখর আখ্যান-ভাগ বিধৃত হয়েছে এই গ্রন্থে। ইতিহাসবেত্তারা জানেন, হুমায়ুন তাঁর শাসনকে সুদৃঢ় ও বিস্তৃত করার জন্য জীবনের সিংহভাগ যুদ্ধবিগ্রহ করে কাটিয়েছেন শের শাহ ও তাঁর নিজের ভাইদের (মুখ্যতঃ মির্জা কামরান) সাথে। কিন্তু সেসব প্রাসাদচক্রান্ত ও যুদ্ধবিগ্রহ ইতিহাসের পাতার চাইতে আরো অন্তরঙ্গ ও সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে এই গ্রন্থে। 'হুমায়ুন নামা' কোন ঐতিহাসিকের লেখা নয়, সম্রাট বাবুরের সুযোগ্যা কন্যা গুলবদন বেগম অনেকটা স্মৃতিকথা বা ডায়েরী-নির্ভর লেখার ধাচে বর্ণনা করেছেন এই ঘটনাবলী। ফলে, এই গ্রন্থে ঐতিহাসিক উপাদানের যেমন বিপুল সমাবেশ ঘটেছে, তেমনি রয়েছে এতে মোগল পরিবারের শাহজাদা ও ললনাদের অন্তরঙ্গ ঘরোয়া চিত্র।

মূল ফারসীতে রচিত এই ঐতিহাসিক দলিলগ্রন্থ 'হুমায়ুন নামার' প্রথম ইংরজী অনুবাদ করেন মিসেস এনিটা বিউরেজ। উর্দুতে এই গ্রন্থের একাধিক সংস্করণ বেরিয়েছে, তন্মধ্যে রশিদ আক্তার নদভী কৃত অনুবাদ বেশ উল্লেখযোগ্য।

বাংলা ভাষায় এই গ্রন্থের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ সম্ভবতঃ এ-ই প্রথম। রচনা-শৈলীর সাথে আধুনিক অনুবাদকের যে দ্বন্দ্ব প্রায়শঃ জটিলতার সৃষ্টি করে থাকে, 'হুমায়ুন নামার' বেলায় তা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। আধুনিক অনুবাদের মুখ্য তাগিদ হচ্ছে মূল গ্রন্থের আসল বক্তব্যটুকু পাঠকদের কাছে উপস্থাপিত করা। কিন্তু 'হুমায়ুন নামা' এমন একটি ফারসী রচনা যার শুধুমাত্র বক্তব্যটি গ্রহণ করলেই দায়মুক্ত হওয়া যায় না। প্রাচীন ও ঐতিহাসিক রচনার গুরুত্বের প্রেক্ষিতে 'হুমায়ুন নামার' বাংলা অনুবাদে মূল রচনার আসল মেজাজ, ভাষা-লংকারের বাহুল্য এবং অতিরঞ্জন ও অতিকথনকে এড়িয়ে যেতে পারি নাই। কেননা, তাতে আমরা 'হুমায়ুন নামার' প্রকৃত আড়ম্বর ও আভরণের সাথে

পরিচয় লাভ করতে পারব না। তাই—পাঠকদের ধৈর্যচ্যুতি সম্পর্কে সচেতন থেকেও যথাসম্ভব মূল রচনার গতিধারা ও মেজাজকে সঞ্জীবিত রাখার চেষ্টা করেছি।

'হুমায়ুন নামার' অনুবাদকর্ম ১৯৭১ সালে শুরু করার পর স্বাধীনতা যুদ্ধ ও নানা কারণে আর সমাপ্ত করতে পারি নাই। প্রথম দিকে এর কিছু অংশ 'দৈনিক আজাদ'-এ ধারাবাহিকভাবে ছাপা হয়েছিল। পরে ছিয়াত্তর সালের জুন মাসে চূড়ান্তভাবে এই কাজ শেষ করতে সমর্থ হই। 'হুমায়ুন নামা' অনুবাদের ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে আমাকে যারা উৎসাহিত করেছেন তন্মধ্যে শ্রদ্ধেয় জনাব আবু জাফর শামসুদ্দিন, জনাব মুজীবুর রহমান, বন্ধুবর হাসান গোফরান, শ্রদ্ধেয় পিতা মওলানা শামসুল হক কুফী ও ওস্তাদ মওলানা আবদুর রহমানের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মোস্তফা হারুন

১লা এপ্রিল, ১৯৭৮ মতিঝিল, ঢাকা

সূচীপত্র

রোগশয্যায় হুমায়ুন : প্রার্থনারত সম্রাট বাবুর

طوی میرزا هندال آنکه سلطانم بیگم خواهر مهدی خواجه بودند

با بابام مهدی خواجه فرزند دیگر نداشتند و فرزند نمی شد

آکه جانم سلطانم را بفرزندی نگاه داشته بودند و دو ساله بود

که خانزاده بیگم نگاه کرده بودند و عجایب دوست می داشتند

و به برادرزاده خود دادند و طوی را در کمال لطافت و خوبی

کردند کوشک و بادسقه و پنج توشک و پنج پستوق و یک

تکیه کلان و دو تکیه گاوله و توشقه و لحاف مع خرگاه جلیغ

مع سه توشک همه زردوزی و سروپاهای میرزا چار

و تاج زردوزی و فوطه و رومال زردوزی و

قربوش زردوزی و سلطانم بیگم نه تکمه دار جواهر

یکی از لعل و یکی از یاقوت و یکی از زمرد و یکی از فیروزه و

یکی از زبرجد و یکی از عین الهره دیگر تخته کوره و یک

چارقب و چار قوچی تکمه دار و یک جفت حلقه لعل و

یک جفت حلقه دریتیم و یک خنجر ناسی یکجفت و دو خطب

و دیگر اسباب و اشیا و رخت و زخت و کارخانه ها همه

গুলবদন বেগমের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপির একটি পাতা

বাবুর পর্ব

সম্রাট আকবরের অভিপ্রায়, বংশকুলচূড়ামণি শাহেনশাহ বাবুর এবং প্রিয়তম ভ্রাতা বাদশাহ হুমায়ুন সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা যেন লিপিবদ্ধ করি। শাহেন-শাহ বাবুর যখন ইহধাম ত্যাগ করেন তখন আমার বয়স ছিল সবেমাত্র আট বছর। সত্যি বলতে কি, তখনকার কথা আমার তেমন মনেও ছিল না। তা সত্ত্বেও শাহী ফরমান রক্ষার্থে শ্রুত ঘটনাবলী এবং নিজের স্মৃতিতে যা কিছু জমা ছিল তা নিয়ে লিখতে শুরু করলাম।

এ গ্রন্থের শুরুতেই আমি শ্রদ্ধেয় পিতা সম্রাট বাবুরের জীবনের ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করবো। অবশ্য পিতাজী তাঁর আত্মচরিতেও (ওয়াকেয়া নামা) এর উল্লেখ করেছেন, তা সত্ত্বেও আমি প্রাসঙ্গিক এবং শুভাশীষ জ্ঞানে যৎসামান্য নিবেদন করছি।

হযরত মহাত্মা তৈমুরলঙ্গ থেকে শুরু করে মহামান্য পিতা সম্রাট বাবুর অবধি যে ক'জন নরপতি গত হয়েছেন তন্মধ্যে আমার পিতাই সবচাইতে বেশী তিক্ত অভিজ্ঞতা এবং দুঃখকষ্ট বরণ করেছেন।

আমার পিতার বয়স যখন মাত্র বার বছর, ৫ই রমজান ৯০৯ হিজরীতে তিনি ইন্দ্রজানস্থ ফরগণা রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং যথারীতি তাঁর নামে খোৎবা পাঠ করা হয়। এরপর এগার বছর যাবৎ তিনি ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য চুগতিয়া তৈমুরিয়া ও উজবেকীয়া রাজন্যবর্গের সাথে যে ধরনের সংগ্রামমুখর যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন তা বর্ণনা করার মতো ভাষা আমার নাই। সাম্রাজ্য বিস্তার ও ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য তিনি যে ধারা পরিশ্রম এবং ভয়াবহ পরিস্থিতির মোকাবেলা করেছেন, সে ধরনের সংগ্রামী নরপতি ইতিহাসে বিরল। বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ পরিচালনা, শত্রুদেরকে পরাভূত করার জন্য যে অপরিসীম সংযম এবং পদে পদে তিনি যেভাবে বিপদকে উপেক্ষা করেছেন অবলীলাক্রমে, ইতিহাসে তার তুলনা মেলা ভার। হযরতে আলা পর পর দু'বারই অসির বলে সমরকন্দ জয় করেছেন। তিনি যখন প্রথমবার সমরকন্দ আক্রমণ করেন, তখন তাঁর বয়স ছিল বার বছর। দ্বিতীয় বার আক্রমণ

করেন উনিশ বছর বয়সে। তৃতীয়বার যখন তিনি সমরকন্দ আক্রমণ করেন তখন তিনি বাইশ বছরে উপনীত হয়েছেন। তীব্র সংকটের মাঝে ছ'মাস অবধি এই সমরকন্দের অবরোধ-গ্লানি ভোগ করেন। অবরোধের সময় চাচা সুলতান হোসেন মির্জা খোরাসানে ছিলেন। তিনি আমার পিতাকে কোনরূপ সাহায্য করেন নি। সুলতান মাহমুদ খান কাশগড়ে ছিলেন। তাঁর পক্ষ থেকেও আমার পিতা কোনরূপ আনুকূল্য লাভ করেননি। কারো পক্ষ থেকেই কোনরূপ সহযোগিতা বা সাহায্য ছিল না বলে পিতা এ সময় মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন।

এই মহাদুর্দিনে শাহীবেগ আমার পিতার খেদমতে পয়গাম দিলেন, তোমার সহোদরা খানজাদা বেগমকে যদি আমার পাণি গ্রহণ করতে সম্মতি দাও তাহলে আমাদের মাঝে সন্ধি স্থাপিত হবে এবং ঐক্যজোট স্থাপন করতে পারি।

বাধ্য হয়ে পিতাজী শাহীবেগের প্রস্তাবে সম্মত হন এবং খানজাদা বেগমকে তার কাছে বিয়ে দেন। এরপর পিতা দুর্গ ত্যাগ করে চলে আসেন।[১]

এসময় মাত্র দু'শজন পদাতিক আমার পিতার সহযাত্রী ছিল। এসব লোকদের কাঁধে চাপান ছিল বস্ত্র আর পায়ে ছিল পাষাণদের চপ্পল (চারুক) আর হাতে ছিল লাঠি।

এই দুঃখ-দুর্দশা এবং অস্থৈর্যপূর্ণ সময়ে আমার পিতা আল্লাহ্র উপর ভরসা করে বদখশান ও কাবুলের দিকে যাত্রা করেন।

কন্দজ এবং বদখশানে খসরু শাহের সৈন্যবাহিনী ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছড়িয়ে ছিল। আমার পিতার শিবিরে এসে দলে দলে তারা ভর্তি হতে লাগল। খসরু শাহ নিজেও এসে সালাম জানালেন। অবশ্য খসরু শাহ এক জঘন্যতম কাজ করেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়:

বাইছনগরের মির্জাকে হত্যা এবং সুলতান মাসুদ মির্জার চোখের পল্লব সেলাই করে দিয়েছিলেন তিনি। সকল মির্জারাই আমার পিতার চাচা ছিলেন। দুঃখ-দুর্দশা শুরু হবার পূর্বেই আমার পিতা এদেশের অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করে-ছিলেন। প্রয়োজন তাকে এখানে নিয়ে এসেছে। কিন্তু খসরু শাহ তাঁর সাথে খুবই বাড়াবাড়ি করেন এবং তাকে নিজের দেশ থেকে বিতাড়িত করে দেন।

---

১. এ ঘটনা 'তুজুকে বাবুরী' গ্রন্থে অনেকটা এভাবে বলা হয়েছে যে, মনে হয়, বাবুরের অসম্মতি-তেই এ বিয়ে সম্পন্ন হয়েছে এবং বাবুর যখন আকস্মিকভাবে সমরকন্দ থেকে পলায়ন করেন—খানজাদাকে সেখানেই রেখে চলে আসেন। অবশ্য তাঁর নানীও সেখানে ছিলেন।

আমার পিতার মধ্যে যেহেতু মানবিক গুণাবলী এবং দয়াপ্রবণতা খুব বেশী ছিল, এজন্যে তিনি এ সময় খসরু শাহের এ রকম জঘন্য কৃতকর্মের প্রতিশোধ গ্রহণ করলেন না। পরন্তু খসরু শাহ ইচ্ছানুযায়ী নিজস্ব ধন-দৌলত ও হীরা-জহরত নিয়ে যেন কেটে পড়েন সে সুযোগ দিলেন। অনুমতি পেয়ে খসরু শাহ পাঁচ ছয় সারি উট ও পাঁচ সারি খচ্চরের পিঠে নিজের আসবাবপত্র ও ধনদৌলত গুটিয়ে নিয়ে সম্পূর্ণ নির্বিবাদে খোরাসান অভিমুখে রওয়ানা হয়ে গেলেন। আর আমার পিতাও এরপর কাবুলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

এ সময় কাবুলের শাসনকর্তা ছিলেন জুন্নুন আর গাউনের (নাহিদ বেগমের দাদা) পুত্র মোহাম্মদ মকিম। উলুগ বেগ মির্জার মৃত্যুর পর আবদুর রাজ্জাক মির্জা থেকে তিনি বলপূর্বক শাসনক্ষমতা কেড়ে নেন। আবদুর রাজ্জাক মির্জা ছিলেন পিতা শাহেনশাহ বাবুরের চাচাত ভাই।

কাবুলে উপনীত হয়ে পিতা দুই-তিন দিন যাবৎ দুর্গ অবরোধ করে রাখেন। মোহাম্মদ মকিম কয়েকদিন মাত্র সৈন্য পরিচালনা করেন এবং অতঃপর সন্ধি স্থাপন করে কাবুল নগর হযরতে আলার হাতে সোপর্দ করে নিজের আসবাব-পত্র নিয়ে কান্দাহারের দিকে রওনা হয়ে গেলেন। কান্দাহারে তাঁর পিতা অবস্থান করছিলেন।

কাবুলের এই বিজয় ঘটেছিল ৯১০ হিজরীর রবিউস-সানিতে। কাবুল অধিকারের পর পিতা বঙ্গস-এর দিকে যাত্রা করেন এবং একই অভিযানে বঙ্গস জয় করে পুনরায় কাবুলে ফিরে আসেন।

এ সময় বাবুর জননী মহামান্যা হযরত খানম ছয়দিন জ্বর ভোগের পর ইহধাম ত্যাগ করেন। বাগে নওরোজীতে তাঁকে দাফন করা হয়। মাকে দাফন করার জন্য হযরতে আলা বাগে নওরোজীর মালিককে এক হাজার (মেছ-কাল) মুদ্রা প্রদান করেন।

এ সময় খোরাসানের বাদশাহ সুলতান হোসেন মির্জা পিতাকে বিশেষ তাগিদ করে ফরমান দিলেন, "আমি এবং উজবেক বেগ অচিরেই যুদ্ধে অবতীর্ণ হচ্ছি, এমতাবস্থায় আপনি যদি আমার সাহায্যার্থে এগিয়ে আসেন তো খুবই ভাল হয়।"

হযরতে আলা আল্লাহুর কাছে প্রার্থনা করেই এমন একটা আহ্বান লাভ করেছেন। মির্জার সাথে দেখা করার জন্য খোরাসান রওনা হয়ে গেলেন।

খোরাসান না পৌঁছতেই তিনি পথিমধ্যেই সংবাদ পেলেন যে, সুলতান হোসেন মির্জা পরলোক গমন করেছেন।

সুলতান মির্জার মৃত্যু সংবাদ শুনে সভাসদ ও আমীর-ওমরাহগণ পরামর্শ দিলেন, কাবুলেই ফিরে চলা যাক। কিন্তু হযরতে আলা সম্মত হলেন না এবং বললেন, আমরা এতদুরে যখন এসে পড়েছি তখন খোরাসানে পৌঁছে শাহজাদা-দেরকে কমপক্ষে সমবেদনা তো জ্ঞাপন করে আসতে পারি।

অতঃপর এই সিদ্ধান্তের পর লোক-লস্কর ও সভাসদ সমভিব্যাহারে বাদশাহ বাবুর খোরাসানে পৌঁছলেন। মীর জায়ান যখন জানতে পারলেন বাদশাহ বাবুর খোরাসানে এসেছেন, বদিউজ্জামান ছাড়া সকলেই তাকে সম্বর্ধনা জানাতে আসেন। বদিউজ্জামান এজন্য আসেননি যেহেতু সুলতান হোসেন মির্জার সভাসদ বরনাতুক বেগ ও জুন্নুন বেগ বদিউজ্জামান মির্জাকে বলেছিলেন বাদ-শাহ বাবুর তার চাইতে পনের বছরের বয়ঃকনিষ্ঠ। অতএব তাকেই প্রথম অভিবাদন জানাতে হবে এবং অতঃপর দু'জনে করমর্দন করবেন। এ ব্যাপারে কাশেম বেগ পরামর্শক্রমে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন, নিঃসন্দেহে বাদশাহ বাবুর বয়সে ছোট। কিন্তু চেঙ্গিজী বিধান (তোরা) অনুযায়ী তিনি বড়। কেননা, তিনি কয়েকবারই সমরশক্তি বলে সমরকন্দ জয় করেছেন। অতএব শেষাবধি সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো বাদশাহ যখন প্রবেশ করবেন সকলেই যথারীতি অভিবাদন প্রদর্শন করবেন এবং বদিউজ্জামান সর্বাগ্রে থাকবেন ও কোলাকুলি করবেন।

বাদশাহ যখন ভেতরে প্রবেশ করলেন মির্জাকে খুঁজে পাওয়া গেল না। কাশেম বেগ (পিতার সাথে এগিয়ে আসছিলেন) পিতাকে সম্বর্ধনা জানাতে মুখোমুখি হলেন এবং বরনাতুক বেগ ও জুন্নুন বেগের উদ্দেশ্যে বললেন, কথা ছিল মির্জা অভ্যর্থনা জানাতে আসবেন। একথা শেষ না হতেই মির্জা বদিউজ্জামান হন্তদন্ত হয়ে বাদশাহকে স্বাগত জানাবার জন্যে দৌড়ে এলেন এবং কুশল বিনিময়ের পর উভয়ে আলিঙ্গন করলেন।

বাদশাহ যে ক'দিন খোরাসানে ছিলেন মির্জা সম্প্রদায় তাঁর খুব সমাদর করেন এবং তাঁর সম্মানে বিশেষ ভোজের আয়োজন করেন। মনোরম উদ্যান ও খোরাসানের প্রাসাদরাজি তাঁকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখানো হয়। মির্জা

জায়ান শীতঋতুর প্রতি বাদশাহের মনোযোগ আকর্ষণ করেন এবং ঠাণ্ডায় পথ চলতে কষ্ট হবে বলে গরমকাল অবধি খোরাসানে অবস্থান করার জন্য অনুরোধ করে বলেন, গরম কালের প্রারম্ভেই তিনি উজবেকদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি যুদ্ধ সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন নি।

সুলতান হোসেন খান মৃত্যুর পূর্বক্ষণ অবধি খোরাসানকে জাগ্রত এবং সুনিয়ন্ত্রিত রেখেছিলেন, কিন্তু পুত্র মির্জা জায়ান পিতার মৃত্যুর ছ'মাস পরেও পিতার যথার্থ উত্তরাধিকারী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন নি।

বাদশাহ বাবুর যখন দেখলেন মির্জা জায়ান বিলাসব্যসনে নিয়ন্ত্রণহীন-ভাবে অর্থ ব্যয় করে চলেছেন, তখন তিনি বিজিত দেশগুলো পরিদর্শন করার অজুহাতে কাবুলে চলে আসেন।

এ বছর পর্যাপ্ত পরিমাণে বরফপাত হয়। ফলে শাহী লোক-লস্কর পথ-ভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। বাদশাহ বাবুর এবং কাশেম বেগ আলাদা পথ ধরে চলতে শুরু করেন। তারা মনে করেছিলেন, রাস্তাটি খুবই ছোটখাট। আমীর ওমারাহরা বাদশাহকে ভিন্ন পথে চলতে বারণ করেন, কিন্তু বাদশাহ তাতে সম্মত হননি বলে তারা বাদশাহকে রেখেই তাদের মনোনীত পথে চলতে শুরু করেন। বাদশাহ বাবুর, কাশেম বেগ ও তাঁর পুত্ররা তিন চারদিন অমানুসিক পরিশ্রম করে বরফাবৃত রাস্তা পরিষ্কার করেন। অতঃপর এই পথে অন্যান্য লোকজন ও সৈন্যবাহিনী চলতে শুরু করে। এভাবে বহুকষ্টে পথ চলার পর তারা গৌড়বন্দ এসে উপনীত হন। এখানে কিছুসংখ্যক বিদ্রোহী হাজারা লোক তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পরাজিত হয়। শাহী ফৌজ এদের অসংখ্য গরুছাগল গনিমত হিসাবে লাভ করে এবং তা নিয়ে সবাই কাবুলে এসে উপনীত হয়।

বাদশাহ বাবুর মিনার পাহাড়ের পাদদেশে এসে উপস্থিত হতেই খবর আসে মির্জা মোহাম্মদ হোসেন গুরকান ও মির্জা খান বিদ্রোহ ঘোষণা করে কাবুল অধিকার করেছেন। বাদশাহ এ খবর পেয়ে কাবুল দুর্গে অবস্থানরত লোকদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে এক পত্রে বলেন, "তোমরা মোটেই অধীর হয়ো না আমি এসে পৌঁছলাম বলে। আমি 'মাহরো' পর্বত শৃংগে অগ্নি প্রজ্বলিত করব, আর তোমরাও ধনাগার ভবনের শীর্ষে অগ্নি প্রজ্বলিত করবে—যাতে

তোমরা আমার আগমন সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারো। সকাল হতে না হতেই আমরা শত্রুদের আক্রমণ করব। তোমরা ওদিক থেকে আর আমি এদিক থেকে।" কিন্তু সকাল বেলা বাদশাহ বাবুর কাবুলের লোকদের অপেক্ষা না করে নিজেই আক্রমণ চালান এবং বিজয় লাভ করেন।

মির্জা খান তার মায়ের বাড়ীতে (বাদশাহের খালা) যেয়ে আত্মগোপন করেন। মাতা পুত্রকে নিয়ে স্বয়ং বাদশাহের দরবারে এসে হাজির হন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করেন। ওদিকে মির্জা মোহাম্মদ হোসেন নিজের স্ত্রীর ঘরে অন্তরীণ ছিলেন। এই স্ত্রী বাদশাহ বাহাদুরের কনিষ্ঠ খালা ছিলেন। প্রাণের ভয়ে তিনি কালিনের নীচে আত্মগোপন করেছিলেন। চাকরদেরকে চারদিকের কালিন ভালভাবে লেপ্টে দেবার জন্য বলেছিলেন।

কিন্তু বাদশাহর চাকর-নফররা তার এই আত্মগোপন ফাঁস করে দেয়। তারা মোহাম্মদ হোসেন মির্জাকে বাদশাহ বাবুরের খেদমতে পেশ করেন। বাদশাহ খালাদের খাতিরে তাকে ক্ষমা করে দেন এবং স্বভাবসিদ্ধ রীতিতে তিনি প্রত্যহ খালাদের কুটিরে যাতায়াত করতেন, কুশলাদি জিজ্ঞাসা করতেন। তিনি খালাদের প্রতি খুব বেশী প্রসন্ন এবং হৃদ্যতা প্রকাশ করেন যাতে খালাদের মনের জটিলতা দূর হয়ে যায়। বাদশাহ পরন্তু তাদেরকে বিস্তৃত এলাকার জায়গীর প্রদান করেন। এইভাবে মির্জা খানের হাত থেকে কাবুল ভূখণ্ড আমার পিতার শাসনাধীনে চলে আসে। এ সময় আমার পিতার বয়স ছিল মাত্র তেইশ বছর। তখনো তাঁর কোন সন্তান-সন্ততি হয়নি। একটি ছেলের খুবই বাসনা ছিল তাঁর।

পিতার বয়স যখন সতের বছর, স্ত্রী আয়েশা সুলতান বেগমের (মির্জা সুলতান আহমদের কন্যা) গর্ভে একটি কন্যা সন্তান জন্মে। কিন্তু এক মাস পরই এই শিশু মৃত্যুবরণ করে।

খোদার অসীম অনুগ্রহে কাবুল বিজয় পিতাকে সৌভাগ্যের সিংহদ্বারে পৌঁছে দেয়। কাবুল শাসনামলে একে একে পিতার আঠারজন সন্তান-সন্ততি জন্মলাভ করে।

প্রথম স্ত্রী মহম বেগমের গর্ভে হযরত হুমায়ুন বাদশাহ, বারবুল মির্জা, মেহের জান বেগম, ঈশান বেগম ও ফারুক মির্জা জন্মলাভ করেন।

দ্বিতীয় স্ত্রী মাসুমা বেগমের গর্ভে একটি কন্যা সন্তান জন্মে। ভূমিষ্ঠ হওয়ার মুহূর্তে মাতা মৃত্যুবরণ করেন। মায়ের স্মৃতি রক্ষার্থে মেয়ের নামও মাসুমা বেগম রাখা হয়। তৃতীয় স্ত্রীর নাম ছিল গুলরুখ বেগম। গুলরুখ বেগমের গর্ভে কামরান মির্জা, আসকারী মির্জা, শাহরুখ মির্জা, সুলতান আহমদ মির্জা ও গুল গাদার বেগম জন্মলাভ করেন। চতুর্থ স্ত্রী দিলদার বেগমের গর্ভে গোলরং বেগম, গুলচেহারা বেগম, হিন্দাল মির্জা, গুলবদন বেগম (আমি) ও আলোয়ার মির্জা জন্ম গ্রহণ করেন।

মোটকথা, কাবুল বিজয় পিতার সংসারকে যেন ফুলে ফলে ভরে দিল। আমার ভাইবোনদের দু'জন ছাড়া (মেহেরজান বেগম ও গোলরং বেগম—খোস্ত নামক স্থানে জন্মলাভ করেন) আর সবাই কাবুলে জন্মগ্রহণ করেন।

হযরত হুমায়ুন বাদশাহ আমাদের সকলের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। তিনি ৪ঠা জিলকদ (৯১৩ হিজরী) রোজ মঙ্গলবার কাবুলে ভূমিষ্ঠ হন। তার জন্মলগ্নে অস্তাচলের সূর্য আরক্তিম ছিল। হুমায়ুনের জন্ম সালে বাদশাহ বাবুর সকল আমীর-ওমরাহ ও শাসনকর্তাদের নামে এইমর্মে ফরমান জারি করেন যে, এখন থেকে তাঁকে 'বাদশাহ' সম্বোধন করতে হবে। ইতিপূর্বে তাঁকে শুধু মির্জা বাবুর সম্বোধন করা হতো। এই সম্বোধনেই চিঠিপত্র পেতেন। কেননা সেকালে শাহজাদাদের মির্জা বলা হতো।

হুমায়ুন বাদশাহর জন্মদিনে তাঁকে সুলতান হুমায়ুন খান ও শাহ ফিরোজ কদর নামে অভিহিত করা হয়। হুমায়ুন ও অন্যান্য ভাইবোনদের জন্মের পর এক মোবারক খবর এসে পৌঁছল যে, শাহ ইসমাইল শাহী বেগকে হত্যা করেছে।

এ খবর শুনে হযরত বাদশাহ বাবুর নাসের মির্জার হাতে কাবুল সোপর্দ করে পরিবার পরিজনসহ অর্থাৎ হুমায়ুন মির্জা, মেহের জান বেগম, বারবুল মির্জা, মাসুমা সুলতান বেগম ও কামরান মির্জাকে সাথে নিয়ে সমরকন্দের উদ্দেশ্যে রওনা হন। বাদশাহ বাবুর শাহ ইসমাইলের সহযোগিতায় সমরকন্দ অধিকার করেন এবং আটমাস সময়কালের মধ্যে মাউরাউন্নাহর এলাকাও নিজের আওতাভুক্ত করে নেন।

কিন্তু তাঁর ভাই ও কতিপয় মোগল আমীর-ওমরাহ তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করে। ফলে, 'কুল' অঞ্চলে তিনি ওবায়দুল্লা খানের কাছে পরাজয় বরণ করেন।

এ সময় তিনি এতখানি দুর্বল হয়ে পড়েন যে, এখানে থাকার আর তিলমাত্র ইচ্ছা রইল না তাঁর। এজন্য বদখশান এবং কাবুলের দিকে ফিরে আসেন এবং মাউরাউন্নাহারে রাজত্ব করার ইচ্ছা সম্পূর্ণ পরিহার করেন। ৯১০ হিজরীতে পুনরায় তিনি কাবুলে সমাসীন হন।

প্রথম থেকেই হিন্দুস্থান আক্রমণ করার একটি সদা-জাগ্রত ইচ্ছা তাঁর ছিল। কিন্তু তাঁর ভাই, পরামর্শদাতা ও উজির এ ব্যাপারে একমত পোষণ করত না। এজন্য তাঁর ইচ্ছা মনে মনেই থেকে যেতো। কিন্তু কালক্রমে তিনি এই বিরুদ্ধ মতপোষণকারীদের বেড়াজাল থেকে মুক্ত হন। ৯২৫ হিজরীতে ভারত আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেন এবং বজুর আক্রমণ করে দুই তিন ঘাটি যুদ্ধ চালানোর পরই বজুর অধিকার করেন। তিনি স্থানীয় বাসিন্দাদেরকে হতাহত করেন।

এ সময় মালিক মনসুর ইউসুফজায়ী তার কন্যা আফগানী আগাচাকে নিয়ে পিতার খেদমতে হাজির হন। পিতা আফগানী আগাচাকে পত্নী হিসাবে বরণ করেন এবং ইউসুফজায়ীকে বিদায় জানান।

বিদায় মুহূর্তে শাহেনশাহ বাবুর তাকে শাহী খেলাত এবং একটি ঘোড়া প্রদান করে নির্দেশ দেন যে, দেশে ফিরে গিয়ে মজদুর ও অন্যান্য লোক-জনদেরকে নিয়ে যেন নিজের এলাকা আবাদ করেন।

এ সময় কাশেম বেগ কাবুলে ছিলেন। তাকে এক পত্রে অবহিত করা হলো, বাদশাহ বাহাদুর একটি পুত্র সন্তান লাভ করেছেন। কাশেম বেগ পত্রোত্তরে প্রার্থনা করল, হিন্দুস্থান বিজয় হোক আর বাদশাহ বাবুর তাঁর সিংহাসনে আসীন হবেন। আপনি মালিক, আপনার যা ইচ্ছা তা-ই হবে।

এ সময় বাদশাহ তাঁর নবজাত শিশুর 'হিন্দাল' নামকরণ করেন। বজুর অধিকারের পর বাদশাহ ভেরার দিকে অগ্রসর হন এবং ভেরা অধিকার করে সেখানকার বাসিন্দাদের অভয় দান করেন। এদের কাছ থেকে চার-লাখ 'শাহরুখী' (সম্ভবতঃ মুদ্রা) আদায় করে সৈন্যদের মাঝে বিতরণ করেন। (বিতরণকালে সৈন্যদের চাকর-নফরদেরকেও বাদ দেন নাই) অতঃপর কাবুল অভিমুখে যাত্রা করেন।[১]

১. হুমায়ুন নামার উর্দু অনুবাদক জনাব রশিদ আখতার নদভী এ ব্যাপারে মতদ্বৈধতা পোষণ করে বলেন যে, বাবুরের আত্মচরিতে মালিক মনসুরের কন্যার বিপদ সম্পর্কিত ঘটনাবলী অন্যভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সম্রাট বাবুর ৯১৫ হিজরীর ৫ই মহরম বজুর জয় করেন। কিন্তু এই বিবাহ সম্পর্কে ২৩শে মহরম প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। (তজুকে বাবুরী পৃষ্ঠা : ১৪৩, অনুবাদ রশিদ আখতার নদভী দ্রষ্টব্য)

ইতিমধ্যে বদখশান অধিবাসীদের পক্ষ থেকে এক নিবেদনপত্র এলো। এতে বলা হয়েছে, মির্জা খানের জীবনাবসান হয়েছে এবং মির্জা সোলায়মানের বয়স খুবই কম। উজবেক এখান থেকে খুবই কাছে। ভেবে দেখুন, বদখশান যেন আবার হাতছাড়া হয়ে না যায়।

বদখশান সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না নেওয়া পর্যন্ত মির্জা সোলায়মানের মাতা বাদশাহের দরবারে অবস্থান করছিলেন। বদখশানবাসীদের বাসনা, মির্জা সোলায়মান ও তার মায়ের ইচ্ছানুযায়ী তিনি মির্জা সোলায়মানকে পর্যাপ্ত জায়-গীর ও তার পিতার উত্তরাধিকারী-সম্পদ ফিরাইয়া দেন এবং মির্জা হুমায়ুনকে এদেশের শাসনভার অর্পণ করেন।

বদখশান শাসনের পরোয়ানা হাতে পেয়েই হুমায়ুন সেখানে রওয়ানা হয়ে যান। শাহেনশাহ বাবুর ও আমার বিমাতাও হুমায়ুনের বিদায়ের অব্যবহিত পরেই বদখশানে যাত্রা করেন। কিছুকাল অবস্থানের পর আমার পিতা ওবিমাতা আবার ফিরে আসেন আর হুমায়ুন সেখানেই থেকে যান।

কিছুকাল পর হযরত বাদশাহ কালাত ও কান্দাহার বিজয়ের মনস্থ করেন। কালাত পৌঁছামাত্রই তা পিতার অধিকারে চলে আসে। পিতা অতঃ-পর কান্দাহার আক্রমণ করেন। দেড় বৎসর অবধি কান্দাহারবাসী অবরুদ্ধ জীবন কাটায়। অতঃপর তারা প্রচণ্ড যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। কিন্তু যুদ্ধে আল্লাহ্র অনুগ্রহে আব্বা হুজুরই বিজয়লাভ করেন। কান্দাহার জয় করে পিতা প্রচুর স্বর্ণসম্পদ লাভ (গনিমত) করেন। প্রাপ্ত সম্পদ ও অর্থ হযরত বাদশাহ সৈন্যদের মাঝে বিতরণ করেন এবং কামরান মির্জাকে কান্দাহারের শাসন ক্ষমতা অর্পণ করে কাবুলে ফিরে আসেন।

সেদিন ছিল ৯৩২ হিজরীর সফর মাসের কোন এক শুক্রবার। উষার আলোকে পূর্বাচল লোহিত বরণ ধারণ করেছে।

পিতা হুজুর এ সময় কাফেলা নিয়ে বের হলেন। নানা বন্ধুর পথ অতিক্রম করে 'ইয়াকুব' নামক একটি গ্রামে এসে থামলেন এবং সেখানে অবস্থান কর-লেন। রাত্রিযাপনের পর সাত-সকালে হিন্দুস্থান বিজয়ের অভিলাষ নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

৯৩২ হিজরী অবধি সাত বা আট বৎসরের মাঝে পিতার শাহীফৌজ

কয়েকবার ভারত আক্রমণ করে। প্রত্যেকবারই কোন না কোন এলাকা অধিকার-ভুক্ত করেন। উদাহরণস্বরূপ ভেরা, বজুর, শিয়ালকোট, দেবলপুর ও লাহোর ইত্যাদি তিনি প্রথমবারের আক্রমণেই জয় করেন। ইয়াকুব গ্রাম থেকে রওনা দিয়ে পিতা লাহোর, সীমান্ত এলাকা এবং চলার পথের সকল স্থান অধিকার করে নেন।

৯৩২ সালের রজব মাসে আলা হুজুর সুলতান সেকান্দর বিন বহলুলের পুত্র ইব্রাহিম লোদির সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য পানিপথে সৈন্যদেরকে সজ্জিত করেন এবং খোদার অসীম অনুগ্রহে পিতা জয়লাভ করেন। যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদি পরাজিত ও নিহত হন। এ সমুদয় বিজয়ে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহই কার্যকরী ছিল। কেননা, পানিপথের যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদি একলক্ষ আশী হাজার ঘোর সওয়ার ও পনের শো জঙ্গী হাতী নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। পক্ষান্তরে. আলা হুজুরের কাছে ব্যবসায়ী ও অন্যান্য লোক-লস্কর মিলিয়ে বারশো লোক ছিল। তন্মধ্যে পেশাদার সৈন্য ছিল মাত্র ছয় কিম্বা সাত শো।

পিতা হুজুর এ যাবৎ পাঁচজন বাদশাহর ধনসম্পদ গনিমত হিসাবে লাভ করে-ছিলেন। কিন্তু তার সবই তিনি সকলের মাঝে বন্টন করে দিয়েছিলেন। হিন্দুস্থানী আমির-ওমরাহরা এই রীতির প্রতিবাদ করে বলেছিলেন, হিন্দুস্থানী বাদশাহের ধনভাণ্ডার এইভাবে নিঃশেষ করা সবিশেষ নিন্দনীয়। পূর্বকালে সকল নতুন নরপতি এসে এসব ধনভাণ্ডারকে বরং আরো উন্নত ও সম্প্রসারিত করেছেন। কিন্তু আলা হযরত তাদের কথায় কর্ণপাত না করে এসব ধনভাণ্ডার বিনাদ্বিধায় সকলের মাঝে বন্টন করে দেন।

খাজা কাঁলা বেগ একাধিকবার অনুরোধ-উপরোধ করে প্রার্থনা করেছিলেন "হিন্দুস্থানী আবহাওয়া আমার স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল নহে। অনুমতি পেলে কিছুকালের জন্য কাবুলে ঘুরে আসতাম।" আলা হুজুর কাঁলা বেগকে কাবুলে যেতে দিতে অসম্মত ছিলেন। কিন্তু কাঁলা বেগ কাবুলে যাওয়ার পণ করে বসেছে যেন, এজন্য পিতা শেষাবধি সম্মত হলেন এবং কাবুলে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। পিতা কাঁলা বেগকে বললেন, তুমি কাবুলে যাওয়ার পথে কতকগুলো ভারতীয় ঐতিহাসিক নিদর্শন ও নানা মুল্যবান দ্রব্যাদিসহ একটি পত্র নিয়ে যেয়ো। পানিপথের যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদিকে পরাজিত করে আমি

যেসব দ্রব্যাদি লাভ করেছি এসব দ্রব্যাদিতে তা রয়েছে। কাবুলে অবস্থানরত আমার সুহৃদ আত্মীয়-বান্ধব, সহোদর ও অন্তঃপুরবাসিনীদের মাঝে এসব বিতরণ করবে। চিঠির সাথে আমি একটি তালিকাও দিচ্ছি। এই তালিকা অনুযায়ী এসব সকলের মাঝে বণ্টন করবে।

তিনি আরো বললেন, বাগ এবং দিওয়ানখানাতে সকল বেগমদের জন্য আলাদা আলাদা প্রকোষ্ঠ নির্মাণ করে দিবে এবং আলাদাভাবে তাদেরকে বলবে, সম্পূর্ণভাবে বিজয় লাভ না করা পর্যন্ত তারা যেন নিয়মিত খোদার দরবারে সেজদা এবং প্রার্থনা করে।

আলা হযরতের নির্দেশক্রমে নিম্নলিখিত উপহারের দ্রব্যাদি (তোহফা) বেগমদের মাঝে বিতরণ করা হবে।

প্রত্যেক বেগমকে সুলতান ইব্রাহিম লোদির একজন নৃত্যবালা দিতে হবে। তাছাড়া জওহর, দমর্দআরিদ, ইয়াকুত, আলমাস, জমরুদ, ফিরোজা, জবরজদ ও আইনুত্তমর ইত্যাদি মহামূল্য প্রস্তরাদি দিয়ে সজ্জিত একটি সোনার থালা-সমেত সদফি আশরফী ভর্তি ও অন্যান্য রকমারী আশরফী ভর্তি একটি খাঞ্চা পেশ করতে হবে।

অনুরূপভাবে একটি নৃত্যবালা, একটি সোনালী জওহর, সোনার আশরফী, সোনালী শাহরখী ইত্যাদি সমন্বয়ে সজ্জিত একটি উপঢৌকন সম্ভার আমার সকল শ্রদ্ধাস্পদ আত্মীয়-স্বজনদেরকে নজরানা পেশ করতে হবে।

আমি তাদের জন্যে আরো কিছু উপহার নিজের কাছে রেখে দিয়েছি, সময়ান্তরে তা পাঠাবো। আলা হযরতের নির্দেশক্রমে এসব উপঢৌকন তাঁর সহোদরা, পুত্রগণ, হেরমান, আত্মীয়-স্বজন, বেগমগণ, আগাহা, ধাত্রীমাতা, বৈমাত্রেয় ভাই ও বোন এবং সকল শুভানুধ্যায়ীদের মাঝে বিতরণের জন্য বিস্তারিত তালিকা প্রদান করা হয়।

খাজা কাঁলা যখন কাবুলে এসে পৌঁছলেন, শাহী হেরমান ও অন্যান্য তালুকদারগণ তিনদিন ধরে দেওয়ান খানার বাগে অবস্থান করেন। গর্বে, আনন্দে তাহাদেব বক্ষ স্ফীত হয়ে উঠেছে যেন। তারা এখানে আলা হযরতের সাফল্য, উন্নতি, সুস্বাস্থ্য ও কুশল কামনা করে খোদার দরবারে সেজদা জ্ঞাপন করেন।

আমার মামা 'আপস'[১]-এর জন্য আলা হযরত খাজা কাঁলাকে একটি বৃহদাকার আশরফী দিয়েছিলেন। বাদশাহী ওজন অনুযায়ী আশরফীটির ওজন তিন সের ও হিন্দুস্থানী ওজন অনুযায়ী পনের সের। তিনি খাজা কাঁলাকে বলেছিলেন, আপস যখন জিজ্ঞাসা করবে বাদশাহ বাবুর আমার জন্য কি দিয়েছেন, প্রতিউত্তরে বলবে, একটি আশরফী মাত্র। প্রকৃতপক্ষে, এই বৃহদাকার বস্তুটি আশরফীই ছিল। আপস যারপরনাই বিস্মিত হন—তিন দিন যাবৎ এ নিয়ে আনন্দে উৎফুল্লে কাটান। আলা হযরত বলেছিলেন, আশরফীটির মাঝখানে একটি ছিদ্র করে তাতে একটি রশি বেঁধে আপসের গলায় পরিয়ে দেবে এবং এ অবস্থায় তাকে নিয়ে হেরেমের চারদিকে প্রদক্ষিণ করবে।

আশরফী যখন আপসের গলায় পরিয়ে দেয়া হলো তিনি যেমন বিস্মিত হলেন. তেমনি আশরফীর ভারে তার ঘাড় ভেঙ্গে যাবার দশা হলো। বাধ্য হয়ে তাকে আশরফীটি গলা থেকে নাবিয়ে হাতে ঝুলিয়ে নিতে হলো। তিনি চারিদিকে প্রদক্ষিণ করে কৌতুকচ্ছলে সবাইকে বলতে লাগলেন, সাবধান, আমার আশরফীর গায়ে কেউ হাত দিবে না কিন্তু।

বেগমগণও খুশী হয়ে তাকে দশ দশ আশরফী দিলেন। ফলে তার কাছে সত্তর-আশী আশরফী জমা হলো।

খাজা কাঁলার বিদায়ের পর বাদশাহ বাবুর আগ্রাতে মির্জা হুমায়ুন, অন্যান্য মির্জা ও সুলতান এবং আমির-ওমরাহদেরকে এনাম প্রদান করেন। তাছাড়া তিনি সকল সম্পর্কশীল মহল এবং আত্মজনের কাছে পত্র প্রেরণ করে অবহিত করেন যে, যারা এ সময় আমার কাছে চাকুরী প্রার্থনা করবে আমি তাদের প্রতি সবিশেষ সহানুভূতি প্রদর্শন করব। বিশেষতঃ যারা ইতিপূর্বে আমার পিতা বা পিতামহদের খেদমতে কর্মরত ছিলেন তাঁদের সম্পর্কে বিশেষ বিবেচনা করা হবে। তাদেরকে উপযুক্ত মাইনা ও পদমর্যাদা প্রদান করা হবে।

হযরত সাহেবে কেরান (তৈমুর লঙ্গ) ও চেঙ্গিস খানের বংশসম্ভূত উত্তরপুরুষদেরকে অবহিত করা করা হচ্ছে যে, তারা যেন অচিরেই এসে আমার দরবারে হাজির হয়। খোদা মেহেরবান আমাকে ভারত সাম্রাজ্যের রাজত্ব প্রদান করেছেন, এ সময় আমার আনুকূল্য লাভ করে তারা ধনবান এবং মর্যাদাসম্পন্ন হবে, এই আমার ইচ্ছা।

১. আপস সম্ভবতঃ বয়স্ক লোক এবং হুমায়ুনের মাতা মহম বেগমের ভাই ছিলেন—অনুবাদক।

শাহেনশাহ বাবুরের এই আহ্বান শুনে সুলতান আবু সাঈদের সাত কন্যা গওহর শাদ বেগম, ফখর জাঁহা বেগম, খোদেজা সুলতান বেগম, বদিউল জামাল বেগম ও আক বেগম প্রমুখ—তুঘাই বাদশাহ সুলতান মাহমুদ খানের কন্যা জয়নব সুলতান খানম এবং এলাচা খান তুঘাই খুর্দ-এর কন্যা মোহেব সুলতান খানমও এখানে আগমন করেন।

এভাবে শাহী খান্দানের প্রায় ৯৬জন মহিলা হিন্দুস্থানে আগমন করেন। বাদশাহ বাবুর তাদের বসবাসের জন্য আলাদা ভবন ও ভরণপোষণের জন্য জায়গীর প্রদান করেন। তাছাড়া তাদের ইচ্ছানুসারে নগদ অর্থও প্রদান করেন।

পিতা একাধারে চার বছর আগ্রাতে অতিবাহিত করেন। প্রত্যেক জুমা-বারে তিনি নিজের ফুফু-আম্মাকে সালাম আদাব জানাবার জন্য তাদের আস্তনায় গিয়ে কুশলাদি জিজ্ঞেস করতেন। একদিন চারদিকে খুব লু হাওয়া চলছিল। আমার পরম পূজনীয় মাতা আব্বা হুজুরকে বললেন, এত গরমের মাঝে আজকে এক শুক্রবার আপনার ফুফুদের না দেখতে গেলে তারা মনে তেমন কোন কষ্ট নিবেন না।

হযরত বাদশাহ আমার আম্মাকে বললেন, মহম, তুমি একি কথা বলছ? সুলতান আবু সাঈদ মির্জার কন্যাগণ আজ মা-বাপ ও ভাই হারা, আজ আমি যদি তাদের দেখা-সাক্ষাৎ না করি তাহলে কে করবে? আমার বিলক্ষণ মনে আছে, বৃদ্ধ খাজা কাশেমকে আমার পিতা একদিন হুকুম দিয়ে বলেছিলেন, আমি তোমার কাছে একটি ত্যাগের অঙ্গীকার চাই। তা হলো, আমার বাবার ফুফুরা যদি নিজেদের মহল্লায় তোমার দ্বারা যত বড় কাজই করিয়ে নিতে চায় তুমি তা অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে সম্পাদন করবে।

আলা হযরত আগ্রার যমুনা নদীর তীরে একাধিক মহল ও প্রাসাদরাজী নির্মাণের হুকুম জারি করেন। নিজের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য একটি প্রস্তর-মণ্ডিত মহল তৈরী করেন। এই মহলের হেরেম এবং বাগের মধ্যবর্তী স্থানে বিশ্রামাগার নির্মাণ করা হয়। দিওয়ানখানাতেও একটি সুদৃশ্য প্রস্তরমণ্ডিত কক্ষ নির্মাণ করা হয়—যার মাঝখানে হাওজ এবং চার প্রান্তে চারটি প্রকোষ্ঠ নির্মিত হয়েছিল।

আলা হযরত নদী তীরে একটি চৌবারীও তৈরী করেছিলেন। তিনি একটি ফরমান জারি করেছিলেন যে, ধোলপুরের একটি সুরক্ষিত প্রান্তরে খোদাই করে

পর্যায়ক্রমে হাওজ তৈরী করা হবে। তিনি বলতেন, এই হাওজ যখন সুসম্পন্ন হবে আমি রাশি রাশি শরাব এনে এই হাওজ ভর্তি করব। কিন্তু পিতা হুজুর যেহেতু রানাসঙ্গের যুদ্ধে মদ্য পান পরিহার করে তওবা করেছিলেন তাই এসব হাওজ মদের পরিবর্তে লেবুর শরবত দিয়ে ভর্তি করা হয়েছিল।

সুলতান ইব্রাহিম লোদির সাথে পানিপথের যুদ্ধের এক বছর পরই এই রানাসঙ্গ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মণ্ড অঞ্চল থেকে একটি অভ্যুত্থানকারী দল ক্রমশঃ মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। যে সকল নবাব, আমীর-ওমরাহ, রানা ও রাজা ইতিপূর্বে বাদশাহ বাবুরের দরবারে এসে আনুগত্য স্বীকার করেছিলেন, এখন তারা বিশ্বাস ভঙ্গ করে রানার দলে এসে ভীড়ে। এমনকি, কুল জালালী, সম্বল ও রাপুড়ী পরগণাতে যেসব রানা, রাজা এবং আফগান ছিলেন তারাও বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং প্রায় দু'লাখ সওয়ার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

এ সময় শাহী জ্যোতিষী একটি কথা রটনা করে বেড়াতে লাগল যে, বাদশাহ বাবুর যুদ্ধে অবতীর্ণ না হলেই ভালো করবেন। কেননা, এ সময় বাবুরের রাশি নক্ষত্র অশুভ ইঙ্গিত জানাচ্ছে। জ্যোতিষীর এই ভবিষ্যৎবাণী শুনে শাহী যোদ্ধাদের মাঝে বিশৃংখলা সৃষ্টি হয় এবং তিনিও বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়েন। তাদের নৈরাশ্য এবং অধৈর্য ক্রমেই প্রকট হয়ে উঠল। বাদশাহ বাবুর সৈন্যদের এ অবস্থা দেখে বড় ভাবিত হয়ে পড়লেন, কেননা শত্রুসৈন্য প্রায় কাছাকাছি এসে গেছে। এই সন্ধিক্ষণে তাঁর মাথায় একটি শুভবুদ্ধির উদয় হলো। তিনি ভাবলেন, যেসব আমীর-ওমরাহ সুবেদার ও সম্ভ্রান্ত ছোট-বড় ব্যক্তি পলায়ন করেন নাই, তাদেরকে একত্রিত করতে হবে। তারা একত্রিত হলে তিনি তাদের উদ্দেশ্যে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভাষণ প্রদান করেন। তিনি বললেন, "এখান থেকে আমাদের পৈত্রিক ভূমির দূরত্ব মাসাধিককালের ব্যবধান। আমরা যদি হেরে যাই আর আল্লাহ্ যদি এই দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতি থেকে আমাদের উদ্ধার করেন তাহলেই বা আমাদের পরিণতি কি দাঁড়াবে। তখন কোথায় থাকব আমরা, আর কোথায় আমাদের পৈত্রিক নিবাস। এই বিদেশ বিভূঁয়ের লোকদের কাছে আমাদেরকে বিপর্যস্ত হতে হবে। অতএব এই দুর্যোগপূর্ণ সময়ে আমাদের কাছে পরিত্রাণের মাত্র দু'টি পথ—আমাদেরকে সর্বাগ্রে দু'টি পণ গ্রহণ করতে হবে। একমাত্র খোদার রাহে আমরা অবিচলভাবে সংগ্রাম

করে যাব। বেঁচে থাকলে গাজী হব আর মৃত্যুবরণ করলে শহীদ হব। এই দু'টি পথই আমাদের নৈতিক অবলম্বন ও নিজেদের নিরাপত্তার প্রধান সহায়ক।"

উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর মনে এই ভাষণ বিশেষভাবে রেখাপাত করে। প্রত্যেকেই বাদশাহর প্রস্তাব সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করেন এবং স্ত্রী বিয়োগের (বজমে তালাক) শপথ ও কোরান পাকের কসম খেয়ে সূরায়ে ফাতিহা পড়ে বলে উঠলেন, হে মহাত্মন বাদশাহ, আপনি জেনে রাখুন, আমাদের দেহে যতক্ষণ পর্যন্ত একবিন্দু রক্ত থাকবে, আমরা এ ব্যাপারে প্রাণ উৎসর্গ করতে বিন্দুমাত্র পশ্চাৎপদ হব না।

রানাসঙ্গের যুদ্ধের মাত্র দুইদিন আগে বাদশাহ বাবুর মদ্যপান এবং অন্যান্য পাপজনিত ক্রিয়াকর্ম পরিহার করেন। বাদশাহর দেখাদেখি আরো চারশ' অমিততেজিয়ান বীর্যবান যোদ্ধাপুরুষও মদ ও অসৎ কর্মাদি থেকে বিরত হয়। স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত শরাবের যত পেয়ালা, সোরাহী ইত্যাদি ছিল, চূর্ণ-বিচূর্ণ করে, এসব স্বর্ণ-রৌপ্য দুস্থ ও ফকিরদের মাঝে বিতরণ করে দেয়া হয়। অধিকৃত সমস্ত এলাকায়ও কঠোর নির্দেশসহ ফরমান জারি করা হলো যে, খাজনা, জিজিয়া এবং জাকাতের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন অবৈধ নীতি থাকলে অবশ্যই তা বর্জন করতে হবে এবং আমি তা ক্ষমা করে দিয়েছি। ব্যবসায়ী বা মুসাফির (যে-কোন লোকই) সর্বত্র বিধিনিষেধহীনভাবে চলাফেরা এবং আসা-যাওয়া করতে পারবে। তাদের ওপর কোন রকম নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা চলবে না। রানাসঙ্গের যুদ্ধের মাত্র আগের রাতে খবর এলো যে, সুলতান কাসেম হোসেন (সুলতান হোসেন মির্জার তনয়া আয়েশা সুলতান বেগমের পুত্র) শাহী শিবিরের মাত্র দশ ক্রোশ ব্যবধানে এসে পৌঁচেছেন। তিনি খোরাসান থেকে আসছেন। এ খবর শুনে আলা হযরত যারপরনাই আনন্দিত হন। তিনি লোকদের জিজ্ঞেস করলেন যে, কাসেম হোসেন কত সংখ্যক সৈন্য নিয়ে আসছেন? জানা গেল, তিনি নাকি মাত্র ত্রিশ/চল্লিশ জন ঘোড় সওয়ার নিয়ে এগিয়ে আসছেন। আলা হুজুর এ খবর শুনে অর্ধরাত্রে অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে এক হাজার সৈন্যকে প্রস্তুত করে হুকুম দিলেন তারা যেন কাশেম হোসেনের লস্করদের সাথে যেয়ে মিলিত হয় এবং সকালের দিকে সকল সৈন্যবাহিনী এমনভাবে আবির্ভূত হবে যে, শত্রু-বাহিনী মনে করবে এরা সবাই নতুন এসেছে। বাদশাহর এই নতুন প্রস্তাব সকলেই পছন্দ করলেন।

পরদিন সকালে (২রা জমাতুল উলা ৯৩৩ হিজরী) কো কোহ্ সিক্রির উপকণ্ঠে রানাসঙ্গের যুদ্ধের দামামা বেজে উঠে। খোদা যেহেতু সদয় ছিলেন এজন্য যুদ্ধে বিজয় লাভ করেন এবং গাজী আখ্যা বরণ করেন।

রানাসঙ্গ বিজয়ের এক বছর পর আমার জননী মহম বেগম কাবুল থেকে হিন্দুস্থানে রওনা হয়ে আসেন। আমিও আমার মায়ের সাথে ছিলাম। আমার অন্যান্য বোনেরাও পূর্বেই এখানে এসে পৌঁচেছিল। মহম বেগম যখন কুল (আলীগড়ে) এসে পৌঁছলেন, আলা হযরত তিনজন ঘোড় সওয়ার সমভিব্যাহারে দেহরক্ষী পাঠালেন। তিনি কুল থেকে আগ্রা অবধি দেহরক্ষী-দের সাথে সফর করেন। আমার পিতার অভিপ্রায় ছিল কুল জালাল অবধি গিয়ে আমার মাতাকে অভ্যর্থনা জানাবেন।

মাগরিব নামাজের সময় কে যেন এসে খবর দিল যে, আমার মা শিবিরের চার মাইল ব্যবধানে এসে পৌঁচেছেন। একথা শুনে আমার আব্বা ঘোড়া প্রস্তুত করারও প্রতীক্ষা করলেন না। খবর শুনে তিনি পদব্রজেই চলতে শুরু করেন। পায়ে হেঁটেই আম্মার কাছে যেয়ে পৌঁছেন। আমার মায়ের ইচ্ছা ছিল তিনিও সওয়ারী থেকে নেমে আলা হুজুরের সাথে পদব্রজে চলবেন। কিন্তু আব্বা তাঁকে বিরত করেন এবং তিনি মায়ের হাওদার সাথে পায়ে হেঁটে হেঁটে শিবিরে নিয়ে আসেন।

আব্বা এবং আম্মার পুনর্মিলনের পর আমার প্রতি হুকুম হলো আমি সকালে সূর্যালোক উঠার পূর্বেই যেন আব্বা হুজুরের খেদমতে হাজির হয়ে সালাম আদাব জ্ঞাপন করি।

ন'জন সওয়ার, আব্বার প্রেরিত মোহাফা (পাল্কীবাহক বিশেষ), কাবুল থেকে আনীত মোহাফা, তাছাড়া আমার মাতার সাথে কাবুল থেকে যে একশ'জন মোগল খাদেম এসেছিল, সবাই সুসজ্জিত ঘোড়ায় সওয়ার হলো।

আমার পিতার খলিফা ও তার স্ত্রী নওগ্রামে আমাদের অভ্যর্থনা জানাতে আসেন। আমিও মোহাফাতে সওয়ার ছিলাম। আমার মামারা আমাকে বাগানে অবতরণ করালেন। বাগানে কিছু না বিছিয়ে আমাকে সেখানে বসতে দেয়া হলো। যখন শাহ বাবার খলিফা আসলেন মামারা আমাকে তাঁর সম্মানে দণ্ডায়মান হওয়ার জন্য বললেন।

খলিফা এলেন, আমি দাঁড়িয়ে গিয়ে তার বুকে মাথা রাখলাম। এরপর তার সহধর্মিনী সুলতানুম যখন আসছিলেন, আবার আমি দাঁড়াবার উপক্রম করতেই খলিফা আমাকে নিরস্ত করে বললেন, 'আমি তোমাদের অতি পুরনো মামা, আর দাঁড়াতে হবে না। আমি তোমার বাবা শাহেনশাহ বাবুরের অতি পুরনো খাদেম। তিনিই আমাকে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি সকলকে বলে রেখেছেন, আমার সম্মানে সকলকে দাঁড়াতে হবে। এছাড়া, আমার কিইবা তেমন আর প্রাধান্য'।

খলিফা আমার সম্মানার্থে ছ'হাজার শাহরখী ও পাঁচটি ঘোড়া নজরানা পেশ করলেন, আর আমি তা সানন্দ চিত্তে গ্রহণ করলাম। এরপর সুলতানুম বেগমও আমাকে তিন হাজার শাহরখী ও তিনটি ঘোড়া পেশ করেন।

এরপর সুলতানুম বললেন যে, সাময়িকভাবে যে আহার্য প্রস্তুত আছে, যদি তা গ্রহণ করি তাহলে এসব চাকর-নফর এবং দাসীদের সম্মান বৃদ্ধি হবে। আমি রাজী হয়ে গেলাম। উদ্যানের মাঝে সুদৃশ্য একটি জায়গায় একটি সুবর্ণ মঞ্চ তৈয়ার করা হয়েছে। মঞ্চের উপরে বহুবর্ণ রঞ্জিত একটি শামিয়ানা টানানো হয়েছে। ভেতরে লোহিত বর্ণ চাদর যাতে গুজরাটি জরাফতের কারুকার্য উৎকীর্ণ। তাছাড়া এই সুদৃশ্য কারুকার্যমণ্ডিত সম্পূর্ণ ভিন্ন বর্ণের আরো ছ'টি শামিয়ানা সাজানো ছিল। তাছাড়া চতুষ্কোণবিশিষ্ট অপর একটি শামিয়ানা দিয়ে কৃত্রিম পাচিল তৈরী করা হয়েছে। বাঁশের খুঁটি ইত্যাদির সাথে একই রং-এর কাপড় দিয়ে আচ্ছাদন রচনা করা হয়েছে।

আমি শাহবাবা খলিফার নিজস্ব কক্ষে বসে গেলাম। এবং সেখানে আহার্য গ্রহণ করলাম। পঞ্চাশটি খাশী ভুনা করে রাখা হয়েছিল। রুটি ও শরবত জাতীয় পানীয়ও ছিল অজস্র।

এরপর পর আমি পুনরায় মোহাফায় ফিরে এলাম এবং আরোহণ করার পূর্বে শাহবাবার কদমবুচি আদাপ জ্ঞাপন করলাম। শাহবাবা আমাকে অনেক কিছু জিজ্ঞেস করলেন। তিনি আমাকে দু'হাতে তুলে নিয়ে বুকের সাথে পিষ্ট করলেন এবং অশেষ স্নেহ জানালেন। এতে আমি কতখানি আনন্দিত হয়েছিলাম, তা প্রকাশ করার ভাষা জানা নাই।

আগ্রাতে আমাদের তিনমাস গত হয়ে গেছে। হযরত বাদশাহ ধোল-পুর পরিভ্রমণ করেন। হযরত মহল বেগম আর আমিও সেখানে ভ্রমণ করতে গিয়েছিলাম। ধোলপুরের প্রান্তরকে খোদাই করে একটি পর্যায়-ক্রমিক হাওজ বানানো হয়েছে। ঢোলপুরের পর আমরা সিক্রিতে আসি। আলা হযরত হাওজের মধ্যবর্তী স্থানে একটি বেদী নির্মাণের হুকুম দেন। এই বেদী তৈরী হওয়ার পর পিতা ছোট নৌকাতে চড়ে সেখানে পৌঁছতেন এবং চারদিকের সৌন্দর্য উপভোগ করতেন।

এই বেদী (চবুতরা) অদ্যাবধি সংরক্ষিত আছে। সিক্রিবাগে আরো একটি মঞ্চ (চৌকন্দী) নির্মাণ করা হয়েছিল। আমার বাবা এখানে তুরখানাও তৈরী করেছিলেন। এখানে বসে তিনি গ্রন্থাদি রচনা করতেন।

একদিন আমি এবং আফগানী আগাচা নীচতলায় বসেছিলাম। শ্রদ্ধেয় আম্মা নামাজ পড়তে চলে গিয়েছিলেন। আমি আফগানী আগাচাকে বললাম, আমার হাতটা একটু টেনে দাও তো। কিন্তু সে এত জোরে টান দিল যে, আমার হাতের কব্জী আলাদা হয়ে এলো। আমি সজোরে চীৎ-কার দিলাম। আমার অবস্থা খুবই বিপদাপন্ন হয়ে পড়ল। সকলে দৌড়া-দৌড়ি করতে লাগল, লোকরা হাত ঠিক করার লোকদের ডেকে আনল। তারা আমার হাত তুলে ব্যাণ্ডেজ করে দিল। অতঃপর আলা হযরত আগ্রাতে আসেন।

আগ্রাতে এসেই তিনি খবর পেলেন, অন্যান্য বেগমরাও কাবুল থেকে রওয়ানা হয়েছেন এবং বর্তমানে পথিমধ্যে রয়েছেন।

শাহ বাবা অভ্যর্থনার জন্য নওগ্রামে যাত্রা করলেন। আমার বড় ফুফী ও বড় বোনের অভ্যর্থনাই মুখ্য ছিল। এদের সাথে যেসব বেগমরা এসে ছিলেন তারা শাহ বাবার প্রতি সালাম আদাব প্রদর্শন করেন। সবাই আনন্দিত, পুলকিত। আল্লাহ্‌র দরবারে শোকরিয়ার সেজদা জ্ঞাপন করে সবাই আগ্রায় রওনা হলেন। শাহ বাবা তাদের সকলের জন্য আলাদাভাবে থাকার বাড়ীর বন্দোবস্ত করে দিলেন।

কিছুদিন পর আলা হযরত 'বাগে জর আফশা' পরিভ্রমণে আসেন। এখানে একটি অজুখানা তৈরী করা হয়েছিল। তা দেখে তিনি বললেন,

এতদিনে আমার বাদশাহী এবং রাজত্ব মানস পরিতৃপ্ত হলো। ইচ্ছা হচ্ছে সব কিছু রেখে এই বাগের নিরিবিলিতে দিন যাপন করি। আমার খেদমতের জন্য তাহের আফতাবচীই যথেষ্ট। বাদশাহীটা হুমায়ুনের হাতে ছেড়ে দেবো।

হযরতে আলার এ উক্তি শুনে আমার আম্মা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনরা কান্নাকাটি করতে লাগলো এবং বিনীতভাবে আরজ করলো, খোদা আপনাকে সুখে রাখুন এবং আপনি বহুকাল অবধি বাদশাহী করবেন। হাজার হাজার বৎসর আপনার দীর্ঘায়ু হোক, আর আপনার সামনেই আপনার সকল সন্তান-সন্ততি বার্ধক্য বরণ করুক।

কিছুদিন পর আলোয়ার মির্জা রোগাক্রান্ত হন। তাঁর পেটের ব্যথা আর কোনক্রমেই নিরাময় করা সম্ভব হলো না। হাকিম, কবিরাজ আর চিকিৎসকদের হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি আরোগ্য লাভ করতে পারলেন না এবং শেষাবধি এই নশ্বর ধরা থেকে বিদায় গ্রহণ করেন।

হযরত বাদশাহ বিশেষভাবে শোকাভিভূত হন। আলোয়ার মির্জার মায়ের নাম ছিল দিলদার বেগম। তিনিও পুত্রের মৃত্যুতে ভেঙ্গে পড়েন। কারণ তাঁর ছেলে যেমন ছিলেন অনন্য-সাধারণ, তেমনি ছিলেন সুদর্শন। পুত্রশোকে দিলদার বেগম শেষাবধি পাগল হয়ে গেলেন। তাঁর পুত্রশোক সত্যিই সহ্যাতীত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আব্বা হযরত, আম্মা এবং অন্যান্য বেগমদের বললেন, চলো, ধোলপুরে ভ্রমণ করতে চলো। ধোলপুরে গেলে মনটা হালকা হয়ে যাবে। বলেই তিনি নিজে নৌকায় উঠে পড়লেন এবং বেগমদেরকেও নৌকায় তুলে নিলেন।

এ সময় আকস্মিকভাবে দিল্লী থেকে মওলানা মোঃ ফরগলীর এক চিঠি এল। চিঠিতে বলা হয়েছে, হুমায়ুন মির্জা অসুস্থ। অবস্থা ক্রমাবনতির দিকে। হযরত বেগম এক মুহূর্তও বিলম্ব না করে দিল্লী রওনা হলেন। খবর শুনেই আমার আম্মা জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছিলেন এবং ডাঙ্গার মাছের মত ছটফট করতে করতে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করলেন। মথুরাতে মা-পুত্রের সাক্ষাৎ হলো। দেখলেন যতটুকু অসুস্থ বলা হয়েছিল হুমায়ুন তার চাইতেও বেশী রোগা হয়ে গেছেন। মথুরা থেকে মা-পুত্র আগ্রাতে চলে এলেন।

আগ্রাতে আসার পর আমি ও অন্যান্য বোনেরা মিলে ফেরেশতা সাদৃশ্য চরিত্রের ভাইটিকে দেখার জন্য তাঁর রোগশয্যার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম।

তিনি এতখানি দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন যে, থেকে থেকে বেহুশ হয়ে পড়ছিলেন। যখনি সংজ্ঞা ফিরে পেতেন, অর্ধনিমীলিত চোখে আমাদের দিকে স্নেহাপ্লুত স্বরে বলতেন, বোনরা, তোমরা আমার শুভেচ্ছা জেনো। তোমরা আমার কাছে চলে এসো এবং কণ্ঠ লগ্ন হয়ে আদর বিনিময় করো। আমি কোনদিন তোমাদেরকে বুকের সাথে আলিঙ্গন করে স্নেহাশীষ জানাতে পারিনি। তিনি এভাবে প্রায় তিনবার আমাদের উদ্দেশে এ ধরনের বাণী উচ্চারণ করলেন। এরপর হযরত বাদশাহ এসে যখন বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করলেন এবং হুমায়ুন মির্জার পাণ্ডুর চেহারা দেখলেন, রীতিমত অধীর হয়ে উঠলেন তিনি। হুমায়ুন মির্জাও শ্রদ্ধাষ্পদ পিতাকে দেখে ভাবাবিষ্ট ও আবেগ-বিহ্বল হয়ে পড়েন। আমার আম্মা হযরতে আলাকে বললেন, আমার ছেলের জন্য তোমার এত মাথা ব্যথা থাকার কিবা প্রয়োজন। তুমি বাদশাহ এবং তোমার আরো সন্তান-সন্ততি রয়েছে। আমিই হতভাগী, আমার একই মাত্র পুত্রধন।

জবাবে হযরতে আলা বললেন, এটা ঠিকই বলেছ যে, আমার আরো ছেলে মেয়ে রয়েছে। কিন্তু আমি হুমায়ুনকেই সবচেয়ে বেশী ভালবাসি। আমি কামনা করি তোমার এই দেশবরেণ্য এবং অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী ছেলে চিরকাল নিরাপদ ও সুখে শান্তিতে থাকবে। তাছাড়া আমি তাকে আমার বাদশাহী অর্পণ করব। কেননা, হুমায়ুনের মতো যোগ্যতাসম্পন্ন আমার আর কোন পুত্র-সন্তান নেই।

হুমায়ুন মির্জার রোগ যখন ক্রমাবনতির দিকে, আব্বা হুজুর হযরত আলী মুর্তজার ধ্যানস্থ হয়ে হুমায়ুন মির্জার পালং-এর চারদিকে প্রদক্ষিণ করে খোদার কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন। পুত্রের জীবন সম্পর্কে শেষাবধি তিনি নিরাশ হয়ে আকুল প্রার্থনায় আল্লাকে বললেন ঃ

"হে খোদা, যদি প্রাণের বিনিময়ে প্রাণদান করা সম্ভব[১] হয় তাহলে আমি আমার পুত্রের প্রাণের বিনিময়ে আমার নিজের প্রাণ দিতে প্রস্তুত। আমি সম্রাট বাবুর পুত্রের প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ দিতে চাই। হযরতে আলা বুধবার থেকে এই প্রদক্ষিণ ও আরাধনা শুরু করেছিলেন। এই প্রার্থনার পর সম্রাট

---

১ ইংরেজী অনুবাদক হুমায়ুনের স্থলে 'হিন্দাল' শব্দ ব্যবহার করেছেন এবং মন্তব্য করেছেন যে, এটা ভুল।

বাবুর একদিন অসুস্থ হয়ে পড়লেন আর মির্জা হুমায়ুন ক্রমশঃ সুস্থ হয়ে উঠতে লাগলেন।

প্রায় দু'তিন মাসাবধি তিনি রোগশয্যায় পড়ে রইলেন। ইতিমধ্যে হুমায়ুন মির্জা কালিঞ্জরে চলে গিয়েছিলেন। এদিকে সম্রাট বাবুরের আকস্মিক-ভাবে রোগ বেড়ে যায়। এজন্য লোক মারফত খবর দিয়ে হুমায়ুন মির্জাকে ডেকে পাঠানো হলো। হুমায়ুন হন্ত দন্ত হয়ে অতি দ্রুত পথ অতিক্রম করে পিতার খেদমতে হাজির হলেন। খাদেমদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন,

'আব্বাজান হঠাৎ করে এত বেশী অসুস্থ হয়ে পড়লেন কেমন করে?' যথাসময়ে ডাক্তার, হাকিমকে আনয়ন করা হলো। তাদেরকে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন,

আমিতো আব্বাকে বেশ সুস্থই দেখে গিয়েছিলাম। কিন্তু তিনি হঠাৎ কেমন করে এভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তারা তার সন্তোষজনক জবাব দিতে পারলেন না।

রোগশয্যায় থেকে মাননীয় পিতা বার বার হুমায়ুনের কথা জিজ্ঞেস করতেন এবং বলতেন হুমায়ুন কোথায় কি করছে? এমতাবস্থায় একজন বার্তাবাহক এসে জানাল যে, মীর খুর্দ বেগের পুত্র মীর ব্রোহী বেগ এসেছেন এবং তিনি হুজুরে আলার দর্শন প্রার্থী। এ সময় মাননীয় পিতা চরম ব্যাকুলতার সাথে ব্রোহী বেগকে অন্দরে আসতে বললেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, হিন্দাল কোথায়? কবে আসবে? তার জন্যে আর কত প্রতীক্ষা করতে হবে? ব্রোহী বেগ জানান যে, শাহজাদা এতদিনে দিল্লী অবধি পৌঁছে গেছেন এবং এক-দু'দিনের মধ্যেই আপনার খেদমতে হাজির হবেন। পিতা বললেন, কিন্তু আমি শুনেছি কাবুলে তোমার বোন নিকাহ বসেছে আর তুমিও লাহোরে বিবাহ করেছ। এজন্যে আমার ছেলে তাড়াতাড়ি এখানে পৌঁছতে পারেনি। তার জন্যে আমি প্রতীক্ষা করে করে অস্থির হয়ে গেছি।

আব্বা হুজুর জিজ্ঞেস করলেন, হিন্দাল এখন না জানি কত বড় হয়েছে, কত উঁচু হয়েছে আর সে দেখতে আজকাল না জানি কেমন হয়েছে?

ব্রোহী বেগ মির্জা হিন্দালের কোর্তা পরিধান করে এসেছিল। জামা দেখিয়ে সে বলল, আমার গায়ের জামাটি মির্জা হিন্দালের। মির্জা এই খাদেমকে এটি দান করেছেন।

আলা হযরত তাকে কাছে ডেকে বললেন, দেখি আমাকে দেখতে দাও, পুত্র আমার কত বড় হয়েছে।

পিতা বার বার একথা আওড়াচ্ছিলেন। বলছিলেন, আফসোস, আমি হিন্দালকে দেখলাম না। যে কোন লোকই ভেতরে আসতো, তিনি তাকেই জিজ্ঞেস করতেন, হিন্দাল কবে আসবে বলতে পার তোমরা ?

রোগশয্যা থেকেই পিতা আমার দায়িত্ব আম্মার উপর অর্পণ করেন, তিনি যেন গুলরং বেগম ও গুলচেহারা বেগমের বিবাহের বন্দোবস্ত করেন। এ ব্যাপারে আরো বললেন যে, যখন হযরত মোহাম্মদ জিউ এখানে পদার্পণ করে তাহার কুশলাদি জিজ্ঞেস করবেন তখন তাকে বলতে হবে যে, বাদশাহ বাহাদুরের আত্মার শান্তির নিমিত্ত গুলরংকে ইয়াসিন তৈমুর সুলতান ও গুল চেহারাকে তোখতা বোগা সুলতানের সাথে বিবাহ সম্পন্ন করতে হবে।

আমার মাতা হঠাৎ মুচকি হেসে অন্দরে প্রবেশ করলেন। বাদশাহর অভি-প্রায় তাঁকে জানানো হলো এবং তাঁর মতামত ব্যক্ত করতে অনুরোধ করা হলো। বললেন, আপনার যা ইচ্ছা বাদশাহও তাতে সম্মত হবেন। তিনি আব্বা হুজুরের অভিপ্রায়কে খুবই পছন্দ করলেন এবং এই অভিপ্রায় যেন কার্যে পরিণত হয় এজন্য দোয়া করে বললেন, বাদশাহ যা ইচ্ছা করেছেন তা খুবই সুন্দর এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ।

আমার আম্মা, বদিউল জামাল বেগম এবং আক বেগম বাদশাহ হুজুরের খেদমতে হাজির হলেন। একটি মণ্ডপ তৈরী করে তার উপর সুসজ্জিত চাদর বিছানো হলো। একটি শুভলগ্ন নির্ধারণ করে আমার মা ভাবী জামাতা সুলতান-দ্বয়কে কদমবুছির সৌভাগ্য দান করেন এবং জামাতা হিসাবে বরণ করেন।

এ সময় বাদশাহ জাঁহাপনার পেটের ব্যথা নিদারুণভাবে বৃদ্ধি পেল। হুমায়ুন পিতার এহেন অবস্থা দেখে বিশেষ ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। হাকিম এবং চিকিৎসাবিদদেরকে তলব করলেন এবং বললেন, বাদশাহর চিকিৎসার প্রতি বিশেষ যত্ন নিতে হবে এবং যেভাবেই হোক তাকে সারিয়ে তুলতে হবে।

হাকিম কবিরাজগণ বাদশাহর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করলেন এবং পরস্পরে সলা-পরামর্শ করলেন। অতঃপর লাচার হয়ে মির্জা হুমায়ুনের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে বললেন, আমরা দুঃখিত যে, আমাদের কোন ঔষধই বাদশাহ বাবুরকে

সারিয়ে তুলতে পারছে না। এখন একমাত্র খোদার কাছে প্রার্থনা করুন, তিনিই অদৃশ্য ঔষধের মাধ্যমে তাকে সারিয়ে তুলতে পারেন।

এই কথোপকথনের পরই চিকিৎসকরা আব্বা হুজুরের নাড়ি পরীক্ষা করে বললেন. নাড়ীর স্পন্দন থেকে বুঝা যায় বাদশাহকে বিষ প্রয়োগ করা হয়েছে। (সুলতান ইব্রাহিমের মাতা যে বিষ দিয়েছিলেন)।

এই ডাইনি নারী অনেক কৌশলে এই বিষ প্রয়োগ করতে সমর্থ হয়। এক তোলা পরিমাণ বিষ নিয়ে তিনি তা তার দাসীদের হস্তে ন্যস্ত করে বললেন, এই বিষ আহমদ চাসনী গীরকে (পাচক) দিয়ে বলবে, এই বিষ যেভাবেই হোক, শাহী আহার্যের সাথে যেন মিশিয়ে দেয়। আহমদ পাচককে এজন্য অনেক পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল।

অথচ হযরত বাদশাহ এই ডাইনী বুড়িকে 'মা' বলে সম্বোধন করতেন। থাকার জন্য উপযুক্ত বাড়ী, পর্যাপ্ত জায়গীর ও নানা সুযোগ সুবিধা প্রদান করেছিলেন। প্রায়শঃ বলতেন, মা তুমি আমাকে তোমার সুলতান ইব্রাহিম বলেই মনে কর।

কিন্তু এরা ছিল যেহেতু ছোট জাতের। এজন্য পিতার কোন অনুগ্রহই তাদেরকে সৎস্বভাব সম্পন্ন করতে পারেনি। প্রবাদ আছে, প্রত্যেক বস্তু নিজের মৌলিক সত্তার দিকেই প্রত্যাবর্তন করে।

মোদ্দা কথায়, এই বিষ যখন বাবুচির হাতে এল, সে তার চক্ষুকর্ণের প্রক্রিয়া যেন হারিয়ে বসল। সে বিষের গুড়াগুলো শুধু নানরুটির উপর ছড়িয়ে দিল। বাদশাহ নানরুটি অতি সামান্যই খেয়েছিলেন। কিন্তু একটুতেই বাদশার দেহে বিষ ছড়িয়ে পড়েছিল। এই বিষের ক্রিয়ার দরুনই তিনি বেশী কাবু হয়ে পড়েছিলেন। অতঃপর তিনি দিন দিন দুর্বল এবং চলৎশক্তি রহিত হয়ে পড়লেন। দেহ মনের স্থৈর্য দিন দিন বাড়তে লাগল এবং চেহারা পাংশুবর্ণ হয়ে গেল।

পরদিন আলা হযরত আমীর ওমরা এবং উজিরদেরকে সমবেত করলেন এবং বললেন, বহুকাল থেকে আমার মনে একটি সুপ্ত ইচ্ছা ছিল যে, আমার সিংহাসন মির্জা হুমায়ুনের হাতে সোপর্দ করে যাব এবং আমি 'বাগে জর আফসাঁতে' অবসর জীবন যাপন করব।

খোদার দয়া এবং অনুগ্রহে আমি সকল ঐশ্বর্য লাভ এবং অন্তিম ইচ্ছা পূরণ করতে পেরেছি। তবে আমার সুস্থ এবং সবল অবস্থায় আমি এ ইচ্ছা পূরণ করতে পারিনি। কিন্তু রোগব্যাধি যখন আমাকে দুর্বল করে দিয়েছে, তখন এ অবস্থাতেই অসিয়ত করছি যে, "আমার সব কিছুই (সিংহাসন, মুকুট ইত্যাদি) হুমায়ুনকে দিয়ে যাচ্ছি। তোমরা সকলে তার অনুগত হয়ে থাকবে এবং সকল কাজে ঐক্যমত পোষণ করবে। আমি পরম করুণাময়ের কাছে আশা করি, হুমায়ুন সকল লোকের সাথে সদ্ব্যবহার করবে এবং সকলের প্রিয় হবে।"

তারপর একটু থেমে বললেন, হুমায়ুন তোমার ভাইদেরকে, আত্মীয়স্বজন-দেরকে এবং প্রজা সাধারণকে আল্লাহ্‌র হাতে সপে দিয়ে যাচ্ছি।

আলা হযরতের একথা শুনে উপস্থিত সকলেই কাঁদতে শুরু করেন। স্বয়ং বাদশাহ সালামতের চোখও অশ্রুসজল হয়ে উঠে। এই ঘটনার কথা যখন অন্দরমহল ও বাইরের লোকদের কাছে গিয়ে পৌঁছল, তারাও কান্নাকাটি ও আহাজারি করতে লাগল।

এই ঘটনার তিনদিন পরই আলা হযরত শাহেনশাহ বাবুর ইহধাম ত্যাগ করেন। দিনটি ছিল ৯৩৭ হিজরীর জমাদিয়াল আউয়ালের ৫ তারিখ, রোজ সোমবার।

মৃত্যুর মুহূর্তে আমার ফুফুদেরকে এবং আম্মাদেরকে এই ছলনা করে অন্দর মহলে যেতে বাধ্য করা হয়েছিল যে, এখানে চিকিৎসকরা আসছেন।

এই দিনটি আলা হযরতের বংশধর, আত্মীয়-স্বজন ও আপনজনদের জন্য চরম শোকাবহ দিন ছিল। এরা সকলেই যারপরনাই কান্নাকাটি ও আহাজারীর মাধ্যমে নিজেদের শোক প্রকাশ করেন।

প্রথমদিকে আলা হযরতের মৃত্যুসংবাদ গোপন করে রাখা হলো। কিন্তু শেষাবধি আরায়েশ খান নামক জনৈক হিন্দুস্থানী আমীর পরামর্শ দিয়ে বললেন, সম্রাট বাবুরের মৃত্যু এভাবে লুকিয়ে রাখা ঠিক নয়। কেমনা, অতীতে যখনই কোন হিন্দুস্থানী বাদশার জীবনাবসান ঘটেছে তখনই বাজারী দুর্বৃত্ত লোকরা লুটতরাজ শুরু করে দিত। অতএব, মোগল পরিবারের এই একটুখানি ভুলের জন্য পাছে লুটতরাজ শুরু হয়—এজন্য এখন এক অভিনব পন্থা অবলম্বন করতে হবে। লাল পোশাক পরিধান করিয়ে হাতে ঢাক দিয়ে একজনকে হাতীর পিঠে

চড়িয়ে ঘোষণা করিয়ে দিতে হবে যে আলা হযরত অবসর গ্রহণ করে নিরিবিলি জীবন যাপন করছেন। এমতাবস্থায় রাজকার্য পরিচালনার সকল দায়িত্ব মির্জা হুমায়ুনের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে।

সম্রাট হুমায়ুন তাতেই সম্মত হলেন এবং সেমতে ঘোষণা করার নির্দেশ দেন।

রাজকীয় ঘোষণা শুনে লোকেরা বিশ্বাস করলো যে, আলা হযরত শাহেন শাহ বাবুর সত্যি অবসর জীবন গ্রহণ করেছেন। সবাই মিলে তার জন্য খোদার কাছে দোয়া করল।

হুমায়ুন পর্ব

জমাদিয়াল আউয়াল মাসের ৯ তারিখ রোজ জুমাবারে বাদশাহ হুমায়ুন সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং সারা বিশ্ব তার সিংহাসন প্রাপ্তির জন্য মোবারকবাদ জানায়।

সিংহাসনে আরোহণ করার অব্যবহিত পরেই বাদশাহ হুমায়ুন মা বোন ও মহলের অন্যান্যদের কাছে আসেন এবং শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। তাদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে কুশলাদি জিজ্ঞেস করেন এবং অতঃপর ঘোষণা করেন যে, যারা ইতিপূর্বে জায়গীর, পদাধিকার এবং যে কোন রাজকীয় সুযোগ ভোগ করতে ছিলেন, এখনও তারা সেসব যথানিয়মে ভোগ করে যাবেন।

এইদিনে মির্জা হিন্দাল কাবুল থেকে প্রত্যাবর্তন করে হুমায়ুন বাদশাহর খেদমতে হাজির হন। হুমায়ুন বাদশাহ ভাইয়ের প্রতি সদ্ভাব প্রদর্শন করেন এবং উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত পৈত্রিক সম্পত্তির অনেক কিছুই মির্জা হিন্দালকে দিয়ে দেন।

সিংহাসন লাভের পর হুমায়ুন বাদশাহ সর্বপ্রথম যে কাজে আত্মনিয়োগ করেন, তাহলো মরহুম আব্বা হুজুরের মাজারে উপস্থিত হন এবং মোহাম্মদ আলী আছিসকে মাজারের মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত করে ষাটজন কোরানে হাফেজ ও সুললিত কণ্ঠের অধিকারী কারীদেরকে মাজারের খেদমতের নিমিত্ত নিয়োজিত করেন। তারা পাঁচ বেলা বাজামাআত নামাজ পড়বে এবং কোরানখানি করবে, যার বদৌলতে বংশকুল চূড়ামনি হযরত শাহেনশাহ বাবুরের বিদেহী আত্মা সওয়াব হাসিল করবে।

সিক্রি, যার বর্তমান নাম ফতেপুর, এই অঞ্চলকে মরহুম বাবুরের মাজারের ব্যয়ভার বহন করার নিমিত্ত ওয়াকফ করে দেন। উপরন্তু বিয়াজ জেলার পাঁচ লক্ষ টাকার রাজস্বসম্পন্ন এলাকা আলেম-ওলামাদের বেতনের জন্য নির্দিষ্ট করেন।

আমার মোহতারেমা জননী মাজারে অবস্থানকারী লোকদের জন্য দুবেলা খাবার তৈরী করিয়ে দিতেন। সকাল বেলা এজন্য একটি গাভী, দু'টি মেষ

ও পাঁচটি ছাগল জবাই করা হতো। ফজর নামাজান্তে আরো পাঁচটি ছাগলের 'আস' তৈয়ার করা হতো।

জননী 'আকাম'-এর তৈরী (সম্ভবতঃ মরহুম বেগমকে আকাম বলেও সম্বোধন করা হতো) আড়াই বছর যাবৎ দু'বেলা এই খাবার মাজারে পাঠানো হতো। আড়াই বছর পর তার মৃত্যু হয়।

আকামের জীবদ্দশায় আমি হযরত বাদশাকে তাঁর বাসভবনে কদাচিত দেখতাম। যখন আকামের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ল এবং মৃত্যুপহযাত্রী হলেন, আমাকে ডেকে বললেন, আমার মৃত্যুর পর সম্রাট বাবুরের কন্যাগণ বিবি গুলরং-এর বাসভবনে তাদের ভাইয়ের দর্শনলাভ করতে পারবে।

জননী আকাম যেমন বলেছিলেন, ঠিক সেই অনুপাতে মীর্জা হুমায়ুন যদ্দিন হিন্দুস্থানে থাকতেন, নিজে এসেই আমাদের দেখে যেতেন। কোন রকম দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়াই সাদা-সিদেভাবে আমাদের কাছে আসতেন এবং আমাদের প্রতি প্রভূত অনুগ্রহ করতেন।

তিনি এই হত-ভাগিনীর বাড়ীতেও আসতেন। এখানেই মাসুমা সুলতান বেগম, গুলরং বেগম এবং গুলচেহারা বেগমও এসে হাজির হতেন। এরা সকলেই বিবাহিতা মহিলা ছিলেন। এরা যথানিয়মে ভাইকে সালাম জানাতেন।

মোট কথা, আমার জননী আকাম ও মরহুম আব্বা হুজুরের মহা প্রয়াণের পর ভগ্নহৃদয় ও আশ্রয়হীনা এই বোনটির প্রতি বাদশাহ হুমায়ুন এতটুকু দৃষ্টি রেখেছেন যে, সব রকম দুঃখ কষ্ট আমার মন থেকে দুরীভূত হয়ে গেছে।

আব্বা হুজুরের মৃত্যুর পর সম্রাট হুমায়ুন দশ বছর হিন্দুস্থানে ছিলেন। এই দীর্ঘ দশ বছর কাল রাজ্য শাসনের আমলে সবদিকে শান্তি-শৃংখল বিরাজমান ছিল। সকলে তার বাধ্য এবং অনুগত ছিল।

আব্বা হুজুরের মৃত্যুর ছ'মাস পর বাহমন ও বায়জীদ গৌড় আক্রমণ করে। এ সংবাদ শুনেই হযরত বাদশাহ আগ্রা থেকে যাত্রা করেন। হযরত বাদশাহ তাদেরকে পরাজিত করেন। পরাজিত করার পর চিনাদা অভিমুখে রওয়ানা হন এবং তা জয় করে আগ্রায় ফিরে আসেন।

আমার মাতা মহম বেগমের একান্ত ইচ্ছা ছিল বাদশাহ হুমায়ুনের কোন পুত্র সন্তান দেখে দু'নয়ন স্বার্থক করবেন। তিনি যেখানেই কোন ভাল

ও সুন্দরী মেয়ে দেখতে পেতেন হুমায়ুনের কাছে এনে হাজির করে বলতেন. 'নাও একে গ্রহণ কর।'

আমীর হুজুর খাজং-এর কন্যার নাম ছিলো মেওয়াজান। মেওয়াজান আমার খেদমতে থাকতো। শাহেনশাহ বাবুরের মৃত্যুর পর মহম বেগম একদিন হুমায়ুন বাদশাহকে বললেন, মেওয়াজান তো মন্দ নয়, তুমি নিজের জন্যে তাকে কেন মনোনীত করছ না। এ কথার পর সে-রাতেই তিনি মেওয়াজানের পাণি গ্রহণ করেন।

তিনদিন পর বেঘা বেগম কাবুল থেকে হিন্দুস্থানে আসেন এবং কিছুকাল পর গর্ভধারণ করেন। এক বছর পর হুমায়ুন বাদশাহর এক কন্যা সন্তান জন্ম লাভ করে। কন্যার নামকরণ করা হয় আফিফা বেগম।

মহম বেগমের কাছে এসে মেওয়াজান বলল. আমিও সন্তান সম্ভবা। তিনি একথা শুনে দুই রকমের 'ইরাক' (সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্য) প্রস্তুত করিয়ে নিলেন এবং বললেন, তোমাদের দু'জনেরই যার গর্ভে ছেলে সন্তান হবে তাকে উৎকৃষ্ট ধরনের ইরাক খেতে দেওয়া হবে। উৎকৃষ্ট ইরাকটি তৈয়ার করা হয়েছিল পেস্তা বাদাম ও চারটি মগজের সাথে স্বর্ণ এবং রৌপ্য ভষ্ম মিশিয়ে। দ্বিতীয় ইরাকটি তৈয়ার করা হয়েছিল ইয়ালকানের সমন্বয়ে। সকলেই আশাবাদী ছিলেন যে, দু'জনের মধ্যে একজন অবিশ্যি পুত্র সন্তান জন্ম দেবে।

সকলেই প্রতীক্ষারত ছিলেন। কিছুকাল পর বেঘা বেগম এক কন্যা সন্তান প্রসব করলেন, এর পর সকলে মেওয়াজানের সন্তান কামনা করে বসে রইলেন। গর্ভধারণের দশম মাসটি অতিক্রান্ত হলো। এভাবে একাদশ মাসটিও গত হালা, মেওয়াজান বলল, আমার খালা (জওয়ানে বেগের স্ত্রী) ঠিক বার মাস পর পুত্রসন্তান জন্ম দিয়েছিলেন। সম্ভবতঃ আমিও তারই মতো বার মাস পর পুত্র সন্তান লাভ করব।

তার একথা শুনে প্রসূতি-কক্ষ নির্মাণ করা হলো এবং ভারী তোষক ও আসবাবপত্রে সুসজ্জিত করা হলো। কিন্তু পরে জানা গেল সবই অনর্থক। শুধু শুধুই সে ছলনা করেই বেড়াচ্ছিল।

এ সময় বাদশাহ[১] হুমায়ুন চিনাদাতে ছিলেন। সেখানে থেকে নির্বিঘ্নে, নিরাপদে ফিরে এলেন। বাদশাহ হুমায়ুনের নির্বিঘ্নে প্রত্যাবর্তনের আনন্দে

আমার মাতা মহম বেগম এক আনন্দোৎসব ও ভোজ সভার আয়োজন করেন। এই উপলক্ষে নগরের সর্বত্র আলোক মালায় সুসজ্জিত করা হলো। এইদিন আমার আম্মা বিশেষ পদস্থ সামরিক ও সৈন্যদের নামে নির্দেশ জারি করেন যে, এই উপলক্ষে তারাও নিজেদের আবাসিক এলাকা আলোকমালায় সুসজ্জিত করবে। এইদিন থেকেই এ ধরনের আইন হিন্দুস্থানে প্রবর্তিত হয়।

বহুমূল্য মোতি ও জওহর সমন্বিত একটি সুউচ্চ মঞ্চ তৈয়ার করা হলো। মঞ্চের চারিদিকেই সিঁড়ি স্থাপন করা হলো। মঞ্চের উপরিভাগে চারটি 'জরুদী' সামিয়ানা টানানো হলো এবং একই রং-এর তোষক ও তাকিয়া দেওয়া হলো। খড়গা এবং 'বারগা' তৈয়ার করা হলো যার অভ্যন্তরে ফিরিঙ্গি জরবক্ত শিল্প কর্ম এবং বাইরে পর্তুগীজ সাদৃশ্য মকলাত সুসজ্জিত ছিল। বারগার থামগুলোতে স্বর্ণালংকার মণ্ডিত শিল্পকর্ম করা হয়েছিল। খুবই মনোহারিণী দৃশ্য ছিল তা।

আমার আম্মা গুজরাটি সৌকর্যমণ্ডিত শিবির মডেল স্থাপন করেন। এবং তাতে স্বর্ণনির্মিত আফতাস, গোলাপ দান এবং পেয়ালা তৈরী করেন।

এই উৎসবে আমার আম্মা বার সারি উট, বার সারি খচ্চর, সত্তরটি সওয়ারী ঘোড়া ও সত্তরটি সাধারণ ঘোড়া বাদশাহ হুমায়ুনের পক্ষ থেকে লোকদেরকে দান করেন। তা ছাড়াও এই উৎসবে সাত হাজার লোককে রাজকীয় খেলাত প্রদান করা হয়। বেশ কয়েকদিন ব্যাপী এই আনন্দোৎসব উৎযাপিত হয়।

ইতিমধ্যে খবর ছড়িয়ে পড়ল যে, মোহাম্মদ জামান হাজী মোহাম্মদ খান কুকীর পিতাকে হত্যা করেছে এবং বিদ্রোহ ঘোষণার ইচ্ছা পোষণ করছে। হযরত বাদশাহ তাকে আনবার জন্য লোক পাঠালেন এনং গ্রেফতার করে বিয়ানাতে বন্দী করে তার দেখাশুনার জন্য ইয়াদ গার তুগাইলকে নিয়োজিত করেন। কিন্তু ইয়াদগারের লোকজনেরা মোহাম্মদ জামানের সাথে গোপনে আঁতাত করে তাকে মুক্ত করে দেয়।

এ সময় একটি ফরমান জারি করে বলা হলো যে, সুলতান মোহাম্মদ মির্জা এবং নিখুব সুলতান মির্জার চোখ সেলাই করে বন্ধ করে দেয়া হোক। সেলাই করার সময় নিখুবের চোখ অন্ধই হয়ে গেল, কিন্তু মোহাম্মদ সুলতান

মির্জার চোখ সেলাই করার সময় চোখের দৃষ্টিতে কোন রূপ আঘাত হানা হয়নি। এর পর মোহাম্মদ জামান মির্জা, মোহাম্মদ সুলতান মির্জা এবং শাহ মির্জা পলায়ন করতে সক্ষম হয়। আমরা যতদিন হিন্দুস্থানে ছিলাম এসব লোকরা বরাবর উৎপাত করতো এবং যুদ্ধ বিগ্রহ সৃষ্টি করতো।

বাদশাহ হুমায়ুন বাবন এবং বায়েজিদকে পরাজিত করার পর ফিরে এসে বরাবর আগ্রাতে অবস্থান করছিলেন। এভাবে এক নাগাড়ে তিনি এক বছর আগ্রাতে অতিবাহিত করেন। তিনি একদিন আমার আম্মাকে ডেকে বললেন, মনটা তেমন ভালো যাচ্ছে না, কোন কাজে মন বসে না, কি করি, আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে চলুন আপনি আর আমি একবার গোয়ালিয়র থেকে ভ্রমণ করে আসি

গোয়ালিয়র ভ্রমণের সময় আম্মা মহম বেগমসহ আমার মায়েরা, বোনেরা, মাসুমা সুলতানা বেগম (তাকে আমরা মাহ্ চামচা বলতাম) ও গুলরং বেগম (গোলচামচা বলতাম) সম্রাট হুমায়ুনের সাথে ছিলাম।

এ সময় আমাদের এক বোন গোল চেহারা বেগম অযোধ্যায় ছিল। কেননা তার স্বামী তোখতা বোগা সুলতান সেখানে 'থাকতো। তোখতা বোগা খান আকস্মিকভাবে ইন্তেকাল করেন। গোল চেহারার চাকর নফররা এ খবর নিয়ে হযরত বাদশাহর কাছে হাজির হলো এবং বলল, তোখতা বোগা সুলতান মৃত্যুবরণ করেছেন। এখন বেগম সাহেবা সম্পর্কে হযরতের কি আজ্ঞা?

হযরত বাদশাহ মির্জাচে'কে হুকুম দিলেন, তিনি যেন অযোধ্যা গিয়ে বেগমকে নিয়ে এসে আগ্রাতে পৌঁছে দেন। হযরত বাদশাহও এদিক থেকে আগ্রাতে আসবেন বলে জানালেন।

এ সময় হযরত আকাম বললেন, যদি অনুমতি হয় তাহলে বেগা বেগম এবং আকিকা বেগমকেও আগ্রা থেকে গোয়ালিয়ারে ডেকে পাঠানো হোক, যাতে তারাও গোয়ালিয়র দেখে নিতে পারে। নওকার এবং খাজা কবিরকে আগ্রা পাঠানো হলে। তারা দুজনে বেগা বেগম ও আকিকা সুলতানা বেগমকে আগ্রাতে নিয়ে এলো। তারা দু'মাস ধরে আমাদের সাথে গোয়ালিয়রে থাকলো, তারপর এক সময় আমরা আগ্রা অভিমুখে রওনা দিয়ে শা'বান মাসে আগ্রা এসে পৌঁছলাম।

শাওয়াল মাসে আকাম পিঠের পীড়ায় আক্রান্ত হলেন এবং ৯৪০ হিজরীর ১৩ই শাওয়াল তারিখে তিনি ইহধাম ত্যাগ করে পরলোকে যাত্রা করেন। এ সময় সন্তানদের মাঝে হযরত শাহ বাবার মৃত্যু শোক আবার উথলে উঠে। বিশেষ করে, আমি এ সময় বেশী বিহ্বল হয়ে পড়ি, কেননা হযরত আকামই আমাকে বিশেষতঃ প্রতিপালন করেছিলেন। দিনরাত বেহুশ বেকারার হয়ে কান্নাকাটি করতে লাগলাম। আমার সকল শান্তি এবং স্থৈর্য যেন হারিয়ে গিয়েছে এই একটি ঘটনা থেকে। হযরত বাদশাহ আমাকে সান্ত্বনা এবং ধৈর্য ধরার জন্য পরামর্শ দিলেন। আমার শোক তাঁর মনেও যেন সমভাবে রেখাপাত করেছে।

হযরত আকাম যখন আমাকে আমার গর্ভধারিণী মায়ের কাছ থেকে নিয়ে প্রতিপালন করতে শুরু করেন তখন আমার বয়েস সবেমাত্র দুই বছর। কিন্তু আমার বয়েস দশ বছর হতে না হতেই তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। হযরত আকামের মৃত্যুর পর আমি এগার বছর বয়স অবধি আকামের বাসভবনেই অবস্থান করি এবং অতঃপর হযরত বাদশাহ যখন ধোলপুর গমন করেন আমার আপন মা দিলদার বেগম আমাকে গ্রহণ করেন।

আকামের কুলখানি (চল্লিশা) উদযাপনের পর হযরত বাদশাহ দিল্লীতে গমন করেন এবং সেখানে 'দ্বীন-পানাহ' দুর্গের ভিত্তি স্থাপন করে আগ্রায় ফিরে এলেন।

আকা জানম একদিন হজরত বাদশাহকে বললেন, আপনি মির্জা হিন্দালের বিবাহোত্তর অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণ ক:ব করছেন ?

হযরত বাদশাহ বললেন, 'আল্লার নাম নিয়ে বলুন। মির্জা হিন্দালের বিয়ের সময় আমার মা জীবিত ছিলেন।' কিন্তু নানা কার্যকারণে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়নি তা আমি জানি। 'আকা জানম বললেন, 'আপনি (হুমায়ুন) বরং আপনার বিয়ের অনুষ্ঠান আগে সেরে নিন, পরে না হয় মির্জা হিন্দালের অনুষ্ঠান করা যাবে।'

আলা হযরত বললেন, 'তথাস্তু'।

আকা জানম বললেন, 'খোদা মোবারক।'

এই অনুষ্ঠানের নিমিত্ত নদী তীরে যে কৃত্রিম উৎসব ভবন ও তোরণ নির্মাণ করা হলো তার নাম রাখা হলো 'যাদুঘর।' প্রস্তর নির্মিত সবচাইতে

বৃহদাকার যে কামরাটি বানানো হলো তার মাঝখানে পাকা এক হাওজ এবং হাওজের মাঝখানে স্থাপন করা হলো এক বৃত্তাকর বেদী। মখমলের কার্পেটে আচ্ছাদিত এই বেদীতে (মঞ্চ) সুদর্শন গায়ক-গায়িকা ও রকমারী যন্ত্রী ও শিল্পীদের সমাবেশ করা হলো।

সম্রাট হুমায়ুনের (ক্ষমতা গ্রহণের) অভিষেক অনুষ্ঠান কালে মহম বেগম তাঁকে যে কারুকার্য খচিত সিংহাসনটি উপঢৌকন দিয়েছিলেন, তা সদর দরজায় স্থাপন করে তার চারদিকে মখমল ও জরিশোভিত তোষক বিছিয়ে দেয়া হলো। সুসজ্জিত সিংহাসনে হযরত বাদশাহ ও আকা জানম পাশাপাশি আসীন হলেনঃ আকা জানম-এর ডান প্রস্থে সম্রাট বাবুরের ফুফীকুল সুলতান আবু সাইদ মির্জার কন্যা ফখর জাঁহা বেগম, বদিউল জামাল বেগম, আক বেগম, সুলতান বখত বেগম, গওহর সা'দ বেগম ও খোদেজা সুলতানা বেগম আসন গ্রহণ করলেন। অপর দিকের তোষকে আমার ফুফীকুল অর্থাৎ বংশকুল চূড়ামণি সম্রাট বাবুরের বোন শহরবানু বেগম, ইয়াদগার সুলতান বেগম (সুলতান হোসেন মির্জার কন্যা), অলুগ বেগম (হযরত বাদশাহর চাচী জয়নব সুলতান বেগমের কন্যা), আয়েশা সুলতান বেগম, সুলতানী বেগম, বেগা সুলতান বেগম (সুলতান খলিল মির্জার কন্যা), মহম বেগম ও বেগী বেগম (উলুগ বেগ মির্জা কাবুলীর কন্যা), খানজাদা বেগম (সুলতান মাসুদ মির্জার কন্যা), শাহ খানম (বদিউল জামাল বেগমের কন্যা), খানম বেগম (আক বেগমের কন্যা), জয়নব সুলতান খানম (সুলতান মাহমুদ খান তুগাইর কন্যা), মোহেব্বা সুলতান খানম (এলাচা খান খ্যাত সুলতান আহমদ খানের কন্যা), খানেশ মির্জা হায়দার (খালা বাদশাহ কন্যা), বেগা কেলা বেগম, কিচক বেগম, শাহ বেগম (দিলশাদ বেগমের মাতা), কাচকানা বেগম ও আপাক বেগম (সুলতান বখ্‌ত বেগমের কন্যা), শাদ বেগম ও মহর আংরেজ বেগম (মোজাফ্‌ফর মির্জার কন্যা)। শেষোক্ত দু'জন পরস্পরে ঘনিষ্ঠ সই ছিল। দু'জনই প্রায়শঃ পুরুষদের পোশাক পড়তো। অত্যন্ত গুণবতী বলে খ্যাত এই দুই মহিলা সূচিকর্ম, শিল্পকর্ম, কুস্তি, সাঁতার ও তীরন্দাজীতে সিদ্ধহস্ত ছিল। যন্ত্র সংগীতও বেশ বাজাতে পারতো। এই মজলিসে আরো নাম না জানা অনেক মহিলার সমাবেশ ঘটেছিল, যাদের সর্বমোট সংখ্যা ছিল ছিয়ানব্বই।

এই মুখ্য জমজমাট অনুষ্ঠানের অব্যবহিত পরেই মির্জা হিন্দালের বিবাহের নিমন্ত্রণ পর্ব শুরু হলো। এই অনুষ্ঠানেও মোঘল-কন্যারা আসল বেদীর ডান দিকে বেশী সংখ্যক বসেছিলেন। অবশ্য এই অনুষ্ঠানে কিছু সংখ্যক মহিলা উপস্থিত থাকতে পারেন নি। যারা ছিলেন তন্মধ্যে আগা সুলতান আগা (ইয়াদ-গার সুলতানের মাতা), সলিমা বেগম, সকিনা বেগম, বিবি হাবিবা ও হানিফা বেগমের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই অনুষ্ঠানে বাম দিকের এলাকা জুড়ে যারা বসেছিলেন তাঁরা হলেনঃ মাসুমা সুলতান বেগম, গুলরং বেগম, গুল চেহরা বেগম, এই অধম গুল বদন বেগম, আকিকা সুলতান বেগম, আ'জম (মালদার বেগমের মাতা), গুলবাগ বেগম, বেগা বেগম, মাহম ননিচা, সুলতানম কুচ আমিরে খলিফা, আলুশ বেগম, নাহিদ বেগম, খুরশিদ কোকা, মহামান্য পিতার বৈমাত্রেয় বোনেরা যথাঃ আফগানী আগাচা, গুলনার আগা, নাজগুল আগাচা, ফাতেমা সুলতান, আঙ্গা (রওশন কোকার মাতা), ফখরুন নেছা আঙ্গা (নাদিম কোকার মাতা), কুচ মির্জা কুলি কোকা, কুচ মোহাম্মদী কোকা, কুচ মোয়াইয়েদ বেগ, বাদশার দ্বিতীয় পক্ষ খোরশেদ কোকা, শরফুন্নেসা কোকা, ফতেহ কোকা, রাবেয়া সুলতান কোকা, মাহলেকা কোকা, সভাসদ ও পরিষদদের স্ত্রী-পরিজনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ডানদিকের এলাকা জুড়ে যারা বসেছিলেন তন্মধ্যে সলিমা বেগা, বিবি নেকা, খানম আগা (খাজা আবদুল্লা মারওয়ারেদীর কন্যা),- নিগার আগা (মোগল বেগ-এর মাতা), নার সুলতান আগা, আগা কোকা, বেগম মোনেম খান (মীর শাহ হোসাইনের কন্যা), আইপেস বেগা, কিছক মাহম,.কাবুলী মাহম, বেগী আগা, খানম আগা, সদিত সুলতান আগা, বেবী দওলত বখত, নসীব আগা, আয়পাস কাবুলী ও অন্যান্য আমীর ওমরাহদের স্ত্রী-পরিজন ও পরিচারিকাগণ।

উৎসব ও নিমন্ত্রণ নির্বাহের জন্য তৈরী এই জমকালো যাদুঘর ভবন-এর সাজগোছ এবং আড়ম্বরের ব্যাপারে কোন কার্পণ্য করা হয় নাই। সদর কক্ষ, ছোট কক্ষ ও অন্যান্য স্থান নানা আভরণে আচ্ছাদিত ছিল। বড় কক্ষটিতে কারুকার্য উৎকীর্ণ করা রকমারী আসন সাজান ছিল। আসনের উপর এবং মেঝেতে রঙ্গীন ঝালর আচ্ছাদিত। বিভিন্ন চাদর ও ঝালরে দুষ্প্রাপ্য ও অমূল্য

মোতি ও জহরত (দেড়গজ লম্বমান) সুশোভিত। ঝালরের লড়ির পাশে ছোট ছোট কাচের টুকরোও সাজানো ছিল।

স্বর্ণ আসনসমূহের নীচে এ ধরনের ত্রিশ চল্লিশটি লড়ি দোলায়মান ছিল। ছোট কক্ষে কারুকার্য খচিত ছপ্পর খাট ছিল। সম্মুখে সোনার পান দান, সুন্দর সোরাহি এবং রূপোর তৈরী বিভিন্ন বিলাসদ্রব্য সজ্জিত ছিল। এই যাদুঘরের পশ্চিম প্রান্তে ছিল দিওয়ানখানা এবং পূর্বদিকে ছিল বাগান। দক্ষিণ প্রান্তের কোণ দিওয়ানখানাবিশিষ্ট এবং উত্তর কোণের দিকে সুসজ্জিত ছোট কামরা-বিশিষ্ট। এই তিনটি কক্ষের উপরেই বালাখানা তৈরী করা হয়েছে। প্রথমটিকে 'বালাখানায়ে দওলত' আখ্যায়িত করা হলো। এতে ৯টি যুদ্ধাস্ত্র সাজানো হয়েছিল যথা: কারুকার্য খচিত শামশীর (তলোয়ার), জরাহ বক্তর, খঞ্জর, জমদহর, খাপ্প্, তারকাশ ইত্যাদি। জরাহ বকতর-এর উপর রঙ্গিন গিলাফে আচ্ছাদিত ছিল।

দ্বিতীয় বালাখানাকে সা'দতখানা বলা হতো। কক্ষটি জুড়ে জায়নামাজ বিছানো ছিল। থরে থরে কেতাব, নক্শা-উৎকীর্ণ কলমদান ও সুন্দর জুজদান সাজানো। চমৎকার চিত্রাবলী এবং রকমারী হস্তাক্ষরসমূহ আর চন্দন কাঠের ফ্রেমে বাঁধানো মনোহর শিল্পকর্ম সুশোভিত। ছপ্পর খাটের নীচের সোপানে এক বিশেষ ধরনের 'নেহালচি' বিছিয়ে তার সামনে 'জরবক্ত'-এর দস্তরখান সাজিয়ে তার উপর বিভিন্ন ধরনের ফল; শরবত ও সবরকম বিলাস পানীয় রাখা হয়েছে।

এই অনুপম বিবাহোত্তর অনুষ্ঠানের—প্রথম পর্বে হযরত বাদশাহ হুকুম দিয়েছিলেন যে সকল অভ্যাগত, বেগমকুল এবং আমীর ও ওমারাহগণ যেন উপঢৌকন নিয়ে আসেন। বাদশাহর হুকুম মতো সকলেই বিভিন্ন ধরনের উপঢৌকন নিয়ে মজলিশে আসেন। প্রাপ্ত উপঢৌকন সম্ভার তিন পর্যায়ে ভাগ করার হুকুম হলো। আশরফী ভর্তি পাত্র হলো তিনটি আর ছ'টি পাত্র হলো শাহরুখের। এক পাত্র আশরফী ও দুই পাত্র শাহরুখী হিন্দুবেগকে দেয়া হলো এবং তা সরকারী খাজাঞ্চীখানার জন্যে উৎসর্গীকৃত বলে তা শাহজাদা (মির্জা), আমির ওমারাহ এবং সৈন্যদের মাঝে বণ্টন করার হুকুম হলো। এক পাত্র আশরফী ও দুই পাত্র শাহরুখী মাওলা ফেরগরীকে ন্যস্ত

করে বলা হলো যে, এসব জ্ঞানী-গুণী, বিদ্বজন, গবেষক, চিকিৎসক, দরবেশ, উপাসক ও ফকির মিসকিনদের বিলিয়ে দেয়া হোক।

এক পাত্র আশরফী ও দুই পাত্র শাহরুখী অতঃপর তিনি (হুমায়ুন) নিজের কাছে নিয়ে আসতে ইঙ্গিত করলেন। সামনে আসতেই তিনি বললেন, 'এগুলো গুণে দেখবার দরকার নেই।' বলেই তিনি এক মুষ্টি ভরে কতগুলো আশরফী তুলে নিলেন। তারপর অবশিষ্ট মুদ্রা পাত্র সমেত বেগমদের সামনে নেবার ইঙ্গিত করে বললেন, তারা নিজেদের ইচ্ছামতো তুলে নেবে এরপর অবশিষ্ট মুদ্রা গুণে দেখা গেল যে, আশরফী প্রায় দু'হাজার এবং শাহরুখীর পরিমাণ দাঁড়ালো দশ হাজারে। সেগুলো প্রথমতঃ বিশেষ অভ্যাগতদের এবং অন্যান্য-দের মাঝে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেয়া হলো। প্রায় প্রত্যেকেই অন্যূন দেড় হ'তে দু'শো মুদ্রা পেল। হাওজ পরিবেষ্টিত বেদীতে যারা ছিল তাদের ভাগে এর পরিমাণ একটু বেশীই পড়ল।

আলা হযরত আকা জানমকে বললেন, যদি অনুমতি দেন তাহলে হাওজের পানি ছেড়ে দেয়া যায়। আকা জানম বললেন বেশ হয়। বলেই সিড়ির উপর বসে পড়লেন। লোকরা জানতো না যে এমনটি হবে। ক্রমান্বয়ে হাওজ যখন ভরতে লাগল এবং চারদিক প্লাবিত করতে লাগল তখন জোয়ান ছেলে পিলেরা ওদিক থেকে হৈ হুল্লোড় ও শোরগোল করে উঠল। হযরত বাদশাহ বললেন, ঘাবড়াবার কোন কারণ নেই, তোমাদের মধ্যে যে গলুলা, শ্বেত এবং মা'জুন খেতে পারবে, হাওজ পেরিয়ে তারা এদিকে আসতে পারবে। একথা শুনে যে যত তাড়াতাড়ি মা'জুন খেয়েছে সে তাড়াতাড়ি আসতে পেরেছে। দেখতে দেখতে পানি প্লাবিত হয়ে পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত উঠে এলো।

মোটকথা, মা'জুন খেয়ে খেয়ে এক এক করে অনেকেই পানির স্পর্শ থেকে রক্ষা পেল। এরপর দস্তরখান বিছিয়ে সবাইকে উৎসবের 'আস' (খাদ্য) খেতে দেয়া হলো। খেলাত এবং পুরস্কার দেয়া হলো। যারা মা'জুন খেয়েছে তাদের পুরো পোশাক প্রদান করা হলো।

হাওজের পাশে কাষ্ঠনির্মিত দরিচাসম্পন্ন ছাপ্পর স্থাপন করা হলো। যুবকরা এতে আসন নিল। তাদের সামনে বাজীকররা নানা তামাশা প্রদর্শন করতে লাগল। মেয়েদের জন্য মিনা বাজারও বসেছিল।

ছয় আসন ও কুঞ্জবিশিষ্ট কৃত্রিম নৌকা সাজানো হলো। বালাখানার নৌকার উপরে এবং নীচে ফুলের গাছ লাগানো হলো। কিলফা, তাজে খেরাস এবং নাফরমান বেলালা ফুলের গাছে সুসজ্জিত এ-ধরনের আটটি নৌকা যখন একত্রিত করা হলো তখন আটটি সুন্দর বাগান হেলে দুলে উঠল যেন। মোটকথা, আল্লাহ্‌তা'লা বাদশাহ হুজুরের মাথায় এমন সব সৃজনী ক্ষমতা প্রদান করেছেন যা দেখে কেহই অবাক না হয়ে পারলো না।

মির্জা হিন্দালের বিবাহের রোয়েদাদ (বিবরণ) হচ্ছে এই যে, তাঁর বেগম সুলতানম বেগম মেহদী খাজার বোন ছিলেন। আমার পিতার সম্পর্কিত ভাই জাফর খাজার একমাত্র সন্তান ছিলেন। আকা জানম সুলতানম বেগমকে নিজের মেয়ে হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। দু'বছর বয়ক্রমকালে খানজাদা বেগম আবার তাকে প্রতিপালনের জন্য গ্রহণ করেন। খানজাদা বেগম তাকে খুব স্নেহ করতেন। কোন দিনই ভাইয়ের মেয়ে হিসাবে মনে করতেন না, মনে করতেন তার নিজেরই মেয়ে। এই মেয়ের বিয়ের ব্যাপারটা খুবই সুন্দর-ভাবে সম্পন্ন করার ব্যাপারে তাঁর আন্তরিকতা ছিল অপরিসীম।

বিবাহে তিনি নিম্নলিখিত যৌতুক প্রদান করেন, যথাঃ কোশ্‌কা এবং সেকা (পর্দা), পাঁচটি তোষক, পাঁচটি পিশ্‌তোক, একটি বড় উপাধান, দু'টি দেহধারক উপাধান, দুটি সাধারণ তোষক, দুটি নেকাব এবং তিনটি তোষক সমেত একটি তাবু (খিমাগাহ্‌)। এই তোষক সমুদয় সম্পূর্ণ জর্দুজি আদলে (বিলাসভিত্তিক) তৈরী। এ-ছাড়া মির্জা হিন্দালকে তাজ (শিরোপা)-সহ জোড়া, রোপাক, রুমাল এবং জর্দুজী কুরপোশ উপঢৌকন দান করেন।

সুলতানম বেগমকে যে কোর্তা এবং জ্যাকেট প্রদান করা হয় তাতে বিভিন্ন তকমা বা খাণ্ডির স্থলে লাল ইয়াকুত, জমরুদ, ফিরোজা, জবরজদ ও আইনুল মারা নামক বহুমূল্য পাথর সুশোভিত ছিল। ন'টি গলাবন্ধ দেয়া হয়েছে তন্মধ্যে একটি গ্রীবা প্রদেশ পর্যন্ত বাড়ানো। ৭টি কারুকার্য খচিত গরি-বান ও একমাদার চারটি আঙ্গুলের নেকাব প্রদান করা হয়। লাল হালকা সম্পন্ন একটি জেফত (জুড়ি) এবং হালকাদার একটি জেফত (হার) প্রদান করা হয়। তিনটি পাখা, একটি চতরশাহী, একটি উঁচু শামাদান, দুটি খতব

(শামাদান বিশেষ) এবং খানজাদা বেগম ঘরোয়া তৈজসপত্র বরতন এবং আসবাবপত্র যা কিছু সংগ্রহ করেছিলেন তার সব কিছুই দান করেন।

খানজাদা বেগম এই বিবাহ অনুষ্ঠানে সুলতানম বেগমকে যা কিছু যৌতুক উপঢৌকন দিয়েছেন এবং যে পরিমাণ আড়ম্বরের আয়োজন করেছিলেন সম্রাট বাবুরের সন্তানদের মধ্যে আর কারো জন্যে এ ধরনের আয়োজন সম্ভব হয়নি।

খানজাদা বেগম ন'টি ভালজাতের ঘোড়া (কারুকার্য খচিত জিন, লাগাম সহ), জহুর্জী স্বর্ণ এবং রৌপ্য নির্মিত বাসন কোসন, তৈজসপত্র চর্কস, ইদ্রিস এবং হাবশী বংশোদ্ভূত ন'জন দাস-দাসী (গোলাম) মেয়েকে যৌতুক হিসাবে দান করেন।

মির্জা হিন্দালের এই বিয়েতে আমার পিতার ভগ্নিপতি (মেহদী বেগ) যা কিছু দিয়েছেন তা'হলো : কারুকার্য খচিত লাগাম এবং ছড়িসমেত ন'টি নাদুস-নুদুস ঘোড়া, স্বর্ণ এবং রৌপ্য নির্মিত বরতন, দু'ধরনের আরো আঠারটি ঘোড়া, মখমল নির্মিত লাগাম ও জিনসমেত বার বেরাদরী খচ্চর (তিন জাতের ন'টি করে), হাবশী, হিন্দুস্থানী এবং তুর্কী দাস-দাসী আর ৩টি হাতী।

আলা হযরত হুমায়ুন বাদশাহ উৎসব শেষে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন এমন সময় খবর এলো যে, খোরাসানের খান উজির সুলতান বাহাদুর বিয়ানা আক্রমণ করেছেন। আলা হযরত মীর ফকর আলী বেগ, মীর তরদী বেগ ও কয়েকজন আমীর-ওমরাহ সমভিব্যাহারে মির্জা আসকারীর নেতৃত্বে একটি বাহিনী নিয়ে বিয়ানা পৌছেন এবং খোরসান খানকে পরাজিত করেন। এই ঘটনার পর আলা হযরত গুজরাটে গমন করেন।

সময়টা ছিল ৯৪১ সালের ১৫ই রজব। আলা হযরত গুজরাট গমনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর 'বাগে-জর আফশাঁ'তে প্রাক-শিবির স্থাপন করেন। এখানে একমাস পর্যন্ত লোক-লস্কর জমা হতে থাকল। শেষ সময় পর্যন্ত তিনি এখানেই ছিলেন।

আলা হযরত সোমবার এবং বুধবারের দিন (সপ্তাহের এ দু'দিন দরবার বসত) নদীর অপর প্রান্তে চলে যেতেন। যখন বাগে জর আফশাঁতে অবস্থান করতেন তখন প্রায়শঃ আজম, সহোদর ভগ্নি এবং হেরেম পরিচারিকাগণ তাঁর খেদমতে উপস্থিত থাকতো।

শিবির স্থাপনের রীতি অনেকটা এ ধরনের ছিল। জেনানা শিবিরগুলোর মধ্যে মাসুমা সুলতানা বেগমের শিবিরের প্রাধান্য ছিল সবচাইতে বেশী। দ্বিতীয় পর্যায়ে ছিল গুলরং বেগমের শিবির। আজমের শিবিরও তাঁর পাশেই ছিল। এরপর আমার মাতা, গুল্‌বর্‌গ্‌ বেগম ও বেগা বেগমের অবস্থান ছিল। সরকারী সভাসদ ও কর্মচারীদের জন্য দফতর স্থাপন করা হলো পযায়ক্রমে। এসব শিবির, দফতর এবং অবস্থান রচনা করার পর যখন তিনি (হুমায়ুন) তা পরিদর্শন করতে এলেন যথারীতি তাঁর ভগ্নি এবং বেগমদের সাথেও দেখা করেন।

আলা হযরতের শকট যেহেতু প্রথম মাসুমা সুলতানার শিবিরের সামনে থামলো, তাই প্রথমে তিনি তার সাথেই দেখা করলেন।

এর পর পালাক্রমে দেখা করার সময় আমরা ক্রমান্বয়ে তার সাথচেলতাম। কোন ভগ্নি বা বেগমদের সাথে যখন তিনি দেখা করতেন আমরা তার পাশে থাকতাম। দ্বিতীয় দিন আলা হযরত এই অধমের শিবিরে পদার্পণ করেন এবং রাতের তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত অবস্থান করেন। অনেক বেগম তার সঙ্গে ছিলেন। ছোটখাট অনুষ্ঠানের মতো এই জলসায় হযরত বাদশাহর ভগ্নিগণ, বেগমবৃন্দ, বেগাহ্ঃ, আগাহা এবং আগাচা অংশগ্রহণ করেন। যন্ত্রসঙ্গীত শিল্পী ও কণ্ঠ শিল্পী মেয়েরা মধুর সুরের মূর্ছ্ণা তুলে বিমোহিত করেন। রাত তৃতীয় প্রহর অতিক্রান্ত হবার পর হযরত বাদশাহ বিশ্রাম গ্রহণ করেন। সহচারিণী বোন এবং বেগমরা যে যেখানে বসেছিলেন সেখানেই ঘুমের কোলে ঢলে পড়লেন।

সকালে বেগা বেগম এসে সকলকে ঘুম থেকে জাগাতে চেষ্টা করেন এবং বলেন নামাজের সময় গেল বলে। হযরত বাদশাহ সেখানেই অজুর পানি আনার নির্দেশ দিলেন। বেগম বুঝতে পারলেন বাদশাও জেগেছেন। এই মুহূর্তেই বেগম অভিযোগ করে বলে উঠলেন, আপনি এই বাগে এসেছেন কতদিন হলো, অথচ একদিনও আমাকে দেখতে চাইলেন না। আমার শিবিরের পথে কেউতো কাঁটা বিছিয়ে রাখেনি। আশা ছিল, আমার ওখানেও এ-ধরনের জলসা বসবে। আর কতকাল আপনি আমাদের মতো অবলাদের প্রতি এ ধারা নির্বিকার থাকবেন? আমাদেরও তো হৃদয় বলে কিছু একটা

আছে। একই জায়গায় আপনি তিনবারও পদার্পণ করেছেন এবং হাসি আনন্দে কাল যাপন করেছেন।

বেগা বেগমের এই অভিযোগ শুনে বাদশাহ হুজুর কোনরূপ দ্বিরুক্তি না করে নামাজ পড়ার নিমিত্ত উঠে চলে গেলেন।

দিনের প্রথম প্রহরে তিনি বাইরে সময় কাটালেন এবং এক সময় ভগ্নি, বেগম আর দিলদার বেগম, আফগানী আগাচা, গুলনার আগাচা, মেওয়াজান, আগাজান ও আঙ্গাহাকে ডেকে পাঠালেন।

আমরা সবাই এসে মিলিত হলাম কিন্তু আলা হযরত মুখ থেকে একটি কথাও বের করলেন না। সহজেই আমরা বুঝে নিলাম আলা হযরত খুব রেগে আছেন।

কিছুক্ষণ পর হযরত বললেন, "বেগম আজ তোমরা যেধারা অভিযোগ আমার প্রতি উত্থাপন করেছ তা করার কি এটা উপযুক্ত সময় ছিল? তোমরা সবাই জান, আমি তোমাদের শ্রদ্ধাস্পদ আত্মীয় স্বজনদের (মোগল বংশের মুরুব্বীবের) কাছে এসেছি। তাঁদের দেখাশোনা এবং সমস্যাবলীর প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করা রীতিমত আমার নৈতিক দায়িত্ব। তা সত্ত্বেও আমি সময়ের টানা পোড়েনের জন্য দেরীতে এসেছি, এজন্য আমি লজ্জিত। এটা আমি সব সময় মনে মনে ভেবে রেখেছিলাম, বিষয়টি সকলকে বুঝাতে হবে। এটা ভালই হলো, তোমরা আমাকে সে কথাটি বলার একটা সুযোগ করে দিলে। আমি আফিম সেবন করে থাকি, আমার কোন খেয়াল থাকে না, আমি যদি কাউকে দেখতে না পারি তাতে যেন অসন্তুষ্ট না হন। আপনারা এ কথাটুকু আমাকে লিখে দিন যে, তুমি আমাদের দেখতে আসো বা না আসো আমরা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকব।"

শুনে গুলবর্গ বেগম তখনই কথা ক'টি লিখে দিল এবং আলা হযরত তা সানন্দে গ্রহণ করলেন। কিন্তু বেগা বেগম কিছুটা ভাবনা চিন্তা করছিল এবং বলল, কৈফিয়ত দেয়া ভুলের চাইতেও দোষণীয়। আমার অভিযোগের মূলে উদ্দেশ্য ছিল আপনি যেন আমাদের প্রতি দৃকপাত করেন। কিন্তু আপনি ব্যাপারটিকে এ পর্যন্ত এনে ঠেকিয়েছেন। এর সমাধান কি? আপনি হলেন সম্রাট 'আর আমরা হলাম অবলা।' বলেই উপরোক্ত কথা দুটো কাগজে লিখে

হযরত বাদশাহর দিকে এগিয়ে দিল। বাদশাহ ব্যাপারটি এখানেই শেষ করলেন।

৯৪১ হিজরীর চৌদ্দই শা'বান তারিখে আলা হযরত বাগে জর আফশা ত্যাগ করে গুজরাট অভিমুখে সুলতান বাহাদুর শাহের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার মানসে রওনা দেন। মখসুর নামক স্থানে উভয় বাহিনী সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হলো। সুলতান বাহাদুর পরাজিত হয়ে চম্পানীর পালিয়ে গেলেন। হুমায়ুনের বাহিনী যখন পিছু ধাওয়া করে চম্পানীর পৌঁছলো সুলতান বাহাদুর আহমদা-বাদের দিকে পালিয়ে গেল।

হযরত বাদশাহ আহমদাবাদের অধিকৃত এলাকাও সুলতান বাহাদুরের দখল থেকে উদ্ধার করেন এবং অতঃপর পুরো গুজরাট এলাকা নিজের লোক-দের মধ্যে বণ্টন করে দেন। আহমদাবাদ মির্জা আসকারীকে, ভরোচ কাসেম হোসেন সুলতানকে এবং পতন ইয়াদগার মির্জাকে দেয়া হলো। হযরত স্বয়ং এরপর কতিপয় লোকজন সহ কমনবায়তের দিকে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন।

ক'দিন পর এক মহিলা এসে খবর দিল যে, কমনবায়তের লোকরা গোপনে সংঘবদ্ধ হয়েছে এবং অচিরেই আপনার উপর হামলা করবে, আপনি কেন গা ঢেলে দিয়ে বসে আছেন? জলদি অশ্বারোহী পাঠিয়ে দিন। আলা হযরতের আমীর ওমরাহ ও সৈন্যরা এই দলের উপর হামলা চালিয়ে দিলো এবং সকলকে বন্দি করে তাদের বেশীর ভাগ লোককে হত্যা করা হলো। এখান থেকে আলা হযরত বরোদা চলে আসেন এবং পরে চম্পানীর গমন করেন।

চম্পানীরে আমরা বেশ আসর জাঁকিয়ে বসেছিলাম। হঠাৎ একটা গোলমাল বেধে গেল। মির্জা আসকারীর লোকরা আহমদাবাদ থেকে এসে বাদশাহের কাছে নিবেদন করল যে, মির্জা আসকারী এবং ইয়াদগার নাসের মির্জা দু'জনে মিশে গিয়ে মিলিতভাবে আগ্রার দিকে চলে গেছেন। এ খবর শুনেই বাধ্য হয়ে তিনি আগ্রা অভিমুখে যাত্রা করলেন। গুজরাটের প্রশাসনিক ভাগ-বাটোয়ারা অগোছালো অবস্থায় রেখেই তাঁকে রওনা দিতে হলো। আগ্রা পৌঁছে তিনি সেখানে এক বছর কাটিয়ে দেন।

এরপর তিনি চিনাদা যান এবং এক সঙ্গে চিনাদা ও বেনারস জয় করেন।

শেরখান নিবেদন করে খবর পাঠালো যে, এই অধম আপনাদেরই পুরনো খাদেম। কোন এক এলাকার সীমানা নির্ধারণ করে আমাকে দিয়ে দিন, আমি তাতেই সন্তুষ্ট হয়ে যাব।

হযরত এই আবেদন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করছিলেন এমন সময় খবর এলো বাংলাদেশের শাসনকর্তা সংঘর্ষে আহত হন এবং পালিয়ে বাঁচেন। শেরখানের আবেদন সম্পর্কে বিচার-বিবেচনার আর সময় হলো না, বাধ্য হয়ে দ্রুত গৌড় বাংলার দিকে রওনা দিলেন।

শের খান জানতে পারল যে, বাদশাহ গৌড়ের দিকে রওনা হয়ে গেছেন, তিনিও সৈন্য সামন্ত নিয়ে তাঁর পুত্রের সাথে এসে মিলিত হলেন। তাঁর পুত্র এবং অনুগত কর্মী খাওয়াছ খান এ সময় গৌড়ে ছিলেন। শের খান তাঁর পুত্র এবং খাওয়াছ খানকে নির্দেশ দিলেন তারা যেন গড়হি গিয়ে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করে। সুতরাং তারা গড়হিকে মজবুত করলো।

আলা হযরত জাহাঙ্গীর বেগকে লিখলেন যে, আরো এক মনজিল এগিয়ে গিয়ে যেন গড়হিতে পৌছেন। জাহাঙ্গীর বেগ গড়হিতে গিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। যুদ্ধে তিনি আহত হন এবং তার বহু লোকজন নিহত হয়।

আলা হযরত কোঘলগানুতে তিনচার দিন পর্যন্ত অবস্থানের পর মনস্থ করলেন যে, গড়হির দিকে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। অতঃপর গড়হির দিকে রওনা দিলেন। গড়হিঁতে পদার্পণ করতেই শের খান এবং খাওয়াছ খান রাতের অন্ধকারে পালিয়ে গেল। সেখান থেকে আলা হযরত গৌড় বাংলায় আসেন এবং তা দখল করেন।

এই দুরাঞ্চলের প্রদেশে হযরত ন'মাস অবস্থান করেন এবং এই অঞ্চলের নাম রাখেন জান্নাতাবাদ। গৌড়ের দিনগুলো তাঁর ভালই কাটছিল, এমন সময় খবর এলো যে, কতিপয় আমীর-ওমরাহ বিশ্বাসঘাতকতা করে মির্জা হিন্দালের সাথে গোপনে হাত মিলিয়েছেন। খসরু বেগ, জাহেদ বেগ ও সৈয়দ আমির মির্জা হিন্দালের কাছে উপস্থিত হয়ে অনুরোধ করলো যে, বাদশাহ যেহেতু এখন বহুদূরে রয়েছেন এজন্য মির্জা সম্প্রদায়ের মোহম্মদ সুলতান মির্জা এবং তার পুত্র উলুগ মির্জা ও শাহ মির্জা পুনরায় বিদ্রোহ প্রকাশ করেছে এবং ক্রমাগত একে অপরের সাথে কানাঘুষা করে চলেছে।

ঠিক এ সময়ই খবর পাওয়া গেল, শেখ বহলুল জররা বখ্‌তর এলাকায় প্রচুর যুদ্ধাস্ত্র এবং ঘোড়ার কাঠি শেরখান এবং বিদ্রোহী মির্জাদের সরবরাহ করার জন্য মাটিতে পুঁতে রেখেছে।

মির্জা হিন্দাল এ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করলেন না। এজন্যে মির্জা নুরুদ্দিনকে এর তদন্তের জন্য নিয়োগ করলেন। তদন্তে দেখা গেল ঘটনা সত্যি। তিনি বন্দেগী শেখ বহলুলকে হত্যা করে ফেললেন। বাদশাহ এই চালঞ্চল্যকর সংবাদ পেয়ে আগ্রার দিকে রওনা দিলেন।

তিনি দলবল লোক-লস্কর নিয়ে গঙ্গা নদীর ডান তীর দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলেন। যখন মুংগের-এর কাছাকাছি পৌঁছেলেন আমীর ওমরাহগণ আরজ করলেন যে, আপনি রাজাধিরাজ সম্রাট। আপনি যে রাস্তায় এসেছেন সে রাস্তাতেই ফিরে চলুন যাতে শের খান না বলতে পারে যে আপনি সব সময় এজন্যে রাস্তা বদল করে চলেন, যেহেতু যাত্রাপথে আপনি (শের খান দ্বারা) বাঁধাপ্রাপ্ত হন। এ কথা শুনে আলা হযরত মুংগের অভিমুখে যাত্রা করেন এবং অধিকাংশ পুরুষ আত্মীয়-পরিজন ও লোকদের নৌকা যোগে পাটনার হাজিপুরে প্রেরণ করেন। তিনি যখন বাংলা প্রদেশের শেষ প্রান্তে পৌঁছেন কাসেম হোসেন সুলতান উজবককে সেখানে রেখে যান। এ সময় শের শাহের অবস্থান খুবই কাছাকাছি বলে খবর পাওয়া গেল। শের খান এবং রাজকীয় সৈন্যদের মাঝে যত যুদ্ধ হয়েছে বরাবর শের খান পরাজিত হয়েছেন। এ সময় বেগা বেগ জৌনপুর থেকে, মিরাক বেগ চিনাদা থেকে আর মোগল বেগ অযোধ্যা থেকে এসে বাদশাহের সাথে মিলিত হন। এদের আসার পর এতদাঞ্চলের খাদ্য দ্রব্যের দুর্মূল্য দেখা দেয়।

এটা খোদারই অনুগ্রহ ছিল যে, রাজকীয় সৈন্যরা কিছুটা অপ্রস্তুত ছিল, এমতাবস্থায় শের খানের দল হামলা করে বসল। রাজকীয় সৈন্যরা পরাজিত হলো এবং অনেক আপন লোকজন বন্দী হলেন। হযরত বাদশাহের হাতেও ক্ষত হয়। তিন দিন চিনাদাতে অবস্থান করেন। এরপর আড়িয়ালের নদী তীরে এসে ওপারে যাবার চিন্তা-ভাবনা করছিলেন। নদী পারাপারের জন্য ভীষণ অস্থির হয়ে উঠেন। এ সময় রাজা পাঁচ ছ'টি সওয়ারী নিয়ে সেখানে উপস্থিত হন এবং বাদশাহ হুমায়ুনকে ওপারে পৌঁছে দেন। চার পাঁচ দিন

লোকদের খাবার মেলেনি। পরে রাজা তাদের জন্যে একটি বাজার মিলাবার আয়োজন করেন। সৈন্যদের বেশ ক'দিন আরাম আয়েশে কাটল। বাজারে ঘোড়ার দামও বেশ সস্তা ছিল। যাদের ঘোড়া ছিল না তারা এখান থেকে ঘোড়া কিনে নিল। মোটকথা, রাজা খুব খাতির যত্ন এবং সহযোগিতা করেন। পরদিন বাদশাহ রাজাকে বিদায় জানালেন এবং তিনি জোহর নামাজের সময় স্বচ্ছন্দে পায় পায় যমুনা নদী তীরে পৌঁছেন। নদীর সংকীর্ণ একটা অঞ্চল দিয়ে সৈন্যদের পায়ে হেটে পার করিয়ে দিলেন। ক'দিন পর কোররাতে পদার্পণ করেন। এখানে খাদ্যদ্রব্য ও ভোগ্যপণ্য বেশ সুলভ ছিল। অঞ্চলটা বাদশাহের এলাকা বলেই চিহ্নিত ছিল। সৈন্যেরা এখানে বেশ আরাম আয়েশ করে কাটাল। এখান থেকে আলা হযরত কাল্‌পী আসেন এবং সেখান থেকে আগ্রার দিকে যাত্রা করেন।

আগ্রা পৌঁছার পূর্বেই পথিমধ্যে খবর পেলেন যে, শের খান 'চুসা' এসে পৌঁছে গেছেন। সৈন্যরা এ খবর শুনে হতবাক হলো। ওদিকে পেছনে চুসাতে যে সৈন্যরা আসছিল তাদের কাছে পুরোপুরি এ খবর পৌঁছেনি। সুল-তান হোসেন মির্জার কন্যা আয়েশা সুলতান বেগম, শাহ্‌বাবার (বাবুর) খলিফা বাচকাকা, বেগা জান কোকা (আকিকা বেগম সমভিব্যাহারে), চান্দ বিবি (সাত মাসের সন্তানের গর্ভধারিণী) এবং শাদ বিবি—এ তিনজনই হুমায়ুনের বেগম ছিলেন। এদের সম্পর্কে কোন খবরই সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। এঁরা নদীতে ডুবে মরেছেন না অন্য কোন বিপদাপদে পড়েছেন, কোন কিছুই জানা যায়নি অথচ তাদের যথেষ্ট খোঁজ করা হয়েছে।

হযরত বাদশাহ চল্লিশ দিন রোগাক্রান্ত ছিলেন। এরপর ধীরে ধীরে সুস্থ হতে থাকেন।

খসরু বেগ, দেওয়ান বেগ, জাহেদ বেগ এবং সৈয়দ আমীর আলা হযরতের আগে ভাগেই এখানে এসে পৌঁছেন। আবার খবর এসে পৌঁছল যে মির্জাগণ, মোহাম্মদ সুলতান মির্জা এবং তার পুত্রগণ কনৌজ পৌঁছে গেছেন।

শেখ বহলুলের হত্যার পর মির্জা হিন্দাল দিল্লী চলে যান। তিনি মীর ফকর আলী এবং অন্যান্য শুভানুধ্যায়ীদের এ সময় সাথে নিয়ে যান যাতে মির্জাদের মধ্যে সহজেই ভাঙ্গন ধরে। বাধ্য হয়ে অন্যান্য মির্জাগণ পালিয়ে কনৌজ গিয়ে আশ্রয় নেন। মীর ফকর আলী মির্জা ইয়াদগার নাসেরকে

দিল্লীতে নিয়ে এসেছিলেন। যেহেতু মির্জা হিন্দাল ও ইয়াদগার নাসের-এর মধ্যে সদ্ভাব এবং মতৈক্য ছিল না এবং মীর ফকর আলী (তাকে দিল্লীতে নিয়ে এসে) একটা ভুল কাজ করল, এ জন্য মির্জা হিন্দাল উত্তেজিত হয়ে দিল্লী অবরোধ করে বসেন।

মির্জা কামরান যখন এ খবর শুনলেন তার মনেও ক্ষমতার (সম্রাট হওয়ার) লোভ দানা বেধে উঠে। বার হাজার অশ্বারোহী নিয়ে তিনি দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করলেন। এই দল দিল্লী পৌঁছলে মির ফকর আলী ও মির্জা ইয়াদগার নাসের দিল্লীর নগর-দ্বার বন্ধ করে দেন। দু'তিন দিন পর মীর ফকর আলী মির্জা কামরানের সাথে আলাপ আলোচনার জন্য উপস্থিত হয়ে নিবেদন করেন এবং সম্রাট হুমায়ুন ও শের খানের সংঘর্ষের খবর দিয়ে বলেন, মির্জা ইয়াদগার নাসের ইচ্ছা করেই আপনার কাছে আসেন নাই। এই নাজুক পরিস্থিতিতে আপনার উচিত হবে কৌশলে মির্জা হিন্দালকে গ্রেফতার করে তাকে নিয়ে আপনি আগ্রা চলে যান। দিল্লীতে অবস্থানের ইচ্ছা পরিত্যাগ করুন।

মির্জা কামরান মীর ফকর আলীর কথাবার্তা মনযোগ সহকারে শোনেন এবং তার আপাদমস্তক সম্মানসূচক খেলাত পরিধান করিয়ে দিল্লীতে পাঠিয়ে দেন। অতঃপর তিনি মির্জা হিন্দালকে বন্দী করে আগ্রার দিকে রওনা দেন। সেখানে মহাত্মা সম্রাট বাবুরের মাজার জেয়ারত করেন এবং মাতা ও সহোদর ভাইবোনদের সাথে মিলিত হয়ে 'বাগে গুল আফশাঁ'তে অবস্থান করেন।

এমতাবস্থায় নুর বেগ এসে খবর দিল যে, হযরত বাদশাহ এদিকে আসছেন। যেহেতু মির্জা হিন্দাল শেখ বহলুলকে হত্যা করেছিলেন, বাদশাকে কি জবাব দিবে এই লজ্জায় মির্জা হিন্দাল আলোরের দিকে পালিয়ে গেলেন।

হযরত বাদশাহ এসেছেন বেশ ক'দিন হলো। মির্জা কামরান 'বাগে গুল আফশাঁ' থেকে এসে বাদশাহ হুজুরের খেদমতে শ্রদ্ধা জানালেন। সেদিন সন্ধ্যায় আমরা সকলে বাদশাহর দরবারে উপস্থিত হয়েছিলাম। তিনি আগ্রা এসে এই অধমের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'আরে, আমি তো প্রথম তোমাকে চিনতেই পারিনি। আমি সৈন্যবাহিনী নিয়ে যখন গৌড় বাংলায় রওনা হয়েছিলাম তখন তোমার পরণে ছিল এক ধরনের পোশাক। কিন্তু এবারে তোমার পরণে রয়েছে ঢিলে ঢালা পোশাক (লচক কাসাবা)। এ জন্য প্রথম দৃষ্টিতেই

আমি তোমাকে চিনতে পারিনি। গুলবদন ইতিমধ্যে আমি তোমাকে অনেক স্মরণ করেছি। মনে মনে দুঃখ প্রকাশ করেছি যে, কেন আমি তোমাকে আমার সাথে নিয়ে আসলাম না। কিন্তু যখন বিপদাক্রান্ত হলাম এবং যুদ্ধে পরাজিত হলাম, খোদার কাছে শোকরিয়া জানিয়ে বললাম, ভাগ্যিস গুলবদনকে নিয়ে আসিনি। অথচ বোনদের মধ্যে আকিকা ছিল সর্বকনিষ্ঠা। আমার আজ হাজার দুঃখ যে, কেন আমি তাকে রণাঙ্গনে নিয়ে গিয়েছিলাম।

কিছুদিন পর হযরত বাদশাহ মাননীয়া মাতাকে দেখার জন্য এলেন। এবারে তাঁর হাতে রয়েছে কোরানে পাক। তিনি উপস্থিত হযেই হুকুম দিলেন, অল্প সময়ের জন্য সবাই একটু গাত্রোত্থান করুন। সবাই চলে গেলে তিনি একাকী আজম, দিলদার বেগম, এই অধম গুলবদন, আফগানী আগাচা, গুলনার আগাচা, নারগুল আগাচা এবং আমার আম্মাকে আলাদা ডেকে বললেন, হিন্দাল আমার জীবনে এক শক্তি ও অস্ত্রবিশেষ। সে আমার দু'চোখের আলো, আমার বাহুবল। আমি তাকে খুবই পছন্দ করি। যা হবার হয়ে গেছে। শেখ বহলুলের করুণ পরিণতির ব্যাপারে হিন্দালকে আর কী-ইবা বলতে পারি। খোদার যা হুকুম ছিল, তাই হয়ে গেছে। এ সময় মির্জা হিন্দাল সম্পর্কে আমার মনে কোন গ্লানি নেই। আপনারা যদি এতে আস্থাপোষণ না করেন তাহলে আমি কোরান হাতে নিয়ে শপথ করে বলতে চাই। হযরত মাতা দিলদার বেগম এবং আমি বাদশার হাত থেকে কোরান শরীফ কেড়ে নিলাম এবং সবাই সমস্বরে বললাম, "আপনি যা বলবেন সে মতে সব কিছু হবে, সেজন্য এ সব (কোরান শপথ করার) অনাসৃষ্টি করার প্রয়োজন কি?"

হযরত বাদশাহ বললেন, "গুলবদন, তুমি যেয়ে যদি মির্জা হিন্দালকে নিয়ে আসো তাহলে মন্দ হয় না।" আমার জননী বললেন, "এত কমবয়েসী মেয়ের পক্ষে তা কেমন করে সম্ভব? সে কোন দিন কোথাও একাকী ভ্রমণও করেনি। আপনি অনুমতি করলে আমি নিজে যেয়ে এ কাজ সম্পন্ন করতে পারি।" আলা হযরত বললেন, "আমি আসলে আপনাকেই এ কাজে প্রেরণ করতে চাই, যেহেতু ছেলেমেয়েদের দুর্দিনে বাপ-মায়ের সহানুভূতি ও সহমর্মিতা প্রকাশ করা উচিত। মা হিসাবে যদি আপনি স্বয়ং এ কাজে যেতে চান আমি যার-পর-নাই আনন্দিত হবো।"

আমীর আবুল বকা ও হযরতের মাতা মির্জা হিন্দালকে ফিরিয়ে আনার জন্য রওনা হয়ে গেলেন। এঁদের আগমনের খবর শুনে মোহাম্মদ হিন্দাল তাদের কাছে ছুটে এলেন এবং হযরত মাতাকে দেখে আনন্দিত হলেন। মির্জা হিন্দাল অতঃপর এঁদের সাথে আগ্রা আসেন এবং হযরত বাদশার খেদমতে হাজির হয়ে শেখ বহলুলের পরিণতি সম্পর্কে বাদশাহর কাছে নানাভাবে সাফাই পেশ করতে থাকেন। বললেন, শেখ বহলুল ঘোড়ার জিন ও নানা যুদ্ধাস্ত্র জমা করে গোপনে শের খানকে সরবরাহ করেছিল এবং তদন্ত করার পর তা সত্য বলে প্রমাণিত হওয়ায় আমি তাকে হত্যা করেছিলাম।"

ক'দিনের মধ্যেই খবর ছড়িয়ে পড়ল যে, শের খান লক্ষ্ণৌ অবধি অধিকার করে বসেছে। এ সময় বাদশাহের সাথে একজন বিশেষ গোলাম (ভিসতি) ছিল। এই গোলাম এক কঠিন বিপদের সময় বাদশাহর জীবন বাঁচিয়েছিল। চুসা এলাকায় যুদ্ধাবস্থায় যখন তিনি ঘোড়া হারিয়ে নদী পার হবার জন্য ভয়ানক বিপন্ন অবস্থায় ছিলেন, তখন সে বাদশাহকে বাঁচিয়েছিল। নদীতে ডুবে যেতে যেতে তার সাহায্যে কোনমতে বাদশাহ বেঁচে গিয়েছিলেন। এ জন্যে বাদশাহ তাঁকে (খুশী হয়ে) পুরস্কারস্বরূপ সিংহাসনে বসিয়েছিলেন। এই নিরীহ ভিসতি লোকটির সত্যিকার কোন পরিচয় আমি জানতাম না। তবে কেউ তার নাম বলতো নিজাম, কেউ সম্বল বলে ডাকতো। সংক্ষেপে বলতে গেলে জীবন বাঁচিয়েছিল বলে হযরত বাদশাহ তাকে সিংহাসনে বসার সৌভাগ্য দান করেছিলেন এবং সকল সভাসদ ও অমাত্যগণকে আদেশ করেছিলেন তাকে কুর্নিশ করার জন্য। নিজাম গোলাম সিংহাসনে বসে ইচ্ছা মাফিক লোকদের খুব দান-দক্ষিণা ও পদ দান করে। এই গোলাম দু'দিন রাজত্ব করেছিল। এ সময় দরবারে মির্জা হিন্দাল উপস্থিত ছিলেন না। তিনি সৈন্য সংগঠনের জন্য দ্বিতীয়বার আলোর রওনা হয়ে যান। মির্জা কামরান ও এই মজলিশে ছিলেন না। তিনি অসুস্থ ছিলেন। বাদশাহকে বলে পাঠিয়েছেন যে, কৃতকর্ম যতই উল্লেখযোগ্য হোক না কেন, একজন গোলামকে কোন কিছু দান অথবা জায়গীর প্রদান করা যেতে পারে। তাই বলে তাকে সিংহাসনে বসাবার কোন প্রয়োজন ছিল না। বিশেষ করে শের খান যখন ক্রমান্বয়ে যুদ্ধাভিযান চালিয়ে এদিকে এগিয়ে আসছেন তখন এসব ছেলেমী করার কোন মানে হয় না।

এ সময় কামরান মির্জার অসুস্থতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। এত দুর্বল এবং কৃশ হয়ে গিয়েছিলন যে, তাঁকে চেনাই মুশকিল হয়ে গিয়েছিল। বাঁচার কোন আশা ছিল না। কিন্তু আল্লাহর অসীম অনুগ্রহে তিনি দিন দিন ভাল হতে লাগলেন। তার মনে একটা ধারণা দানা বেধে ছিল যে, বাদশার ইঙ্গিতে তাঁর মায়েরা তাঁকে গোপনে বিষ খাইয়ে দিয়েছিল। আলা হযরত যখন এই মনোবৃত্তির কথা জানতে পারলেন তখন মির্জা কামরানের কাছে এসে কোরানের কসম করে বললেন যে, তিনি এ ধরনের একটা ষড়যন্ত্র কোন দিন মনে পোষণ করেন নি এবং কাউকে এ ব্যাপারে কোন কিছু করার জন্যও বলেন নি।

কসম খাওয়ার পরও বাদশাহর প্রতি মির্জা কামরানের মনোভাব পরিষ্কার হলো না। এরপর মির্জার রোগ আরো বৃদ্ধি পেতে লাগল এবং শেষাবধি এত অবনতি হয়েছিল যে, কথাবার্তা বলার শক্তি পর্যন্ত রহিত হয়ে গিয়েছিল।

এ সময় আবার খবর এলো যে, শের খান লক্ষ্ণৌ অতিক্রম করে আরো এগিয়ে এসেছে। হযরত আলা আগ্রা ত্যাগ করে কনৌজ-এর দিকে এগিয়ে গেলেন এবং মির্জা কামরানকে আগ্রার শাসনকর্তা নিয়োগ করেন।

কিছুদিন পর মির্জা কামরান জানতে পারলেন যে, আলা হযরত নৌকা দিয়ে কৃত্রিম সেতু নির্মাণ করে ওপার যেতে সমর্থ হয়েছেন। এ খবর শুনতেই মির্জা কামরান আগ্রা থেকে বেরিয়ে পড়েন এবং লাহোরের দিকে এগিয়ে যান। যাবার প্রাক্কালে হঠাৎ 'শাহী ফরমানের' মতো আমার প্রতি হুকুম হলো, 'তোমাকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে তুমি আমার কাছে লাহোর চলে এসো।' আমি ভেবেছিলাম তিনি হয়ত অবশ্যই আলা হযরতকে বলেছেন, আমি খুবই অসুস্থ এবং একাকী কাল যাপন করছি। আমাকে দেখাশুনা বা সঙ্গ দান করার কেউ নেই। আপনি যদি গুলবদনকে বলে দেন আমার কাছে লাহোরে চলে আসার জন্যে তাহলে খুবই বাধিত হবো। আলা হযরত হয়ত তার কথা শুনে প্রস্তাবে সায় দিয়ে বলেছেন, ঠিক আছে গুলবদন তোমার কাছে যেতে পারে।

যেহেতু বাদশাহ হুজুর লক্ষ্ণৌর দিকে দুই তিন মনজিল এগিয়ে যেতেই মির্জা কামরান শাহী ফরমান-এর মতো হুকুম দিয়ে বললেন, তুমি অবিশ্যি আমার সাথে যাবে, আমার মা তাকে বললেন, 'গুলবদন কোন দিনই আমাদের

রেখে একাকী কোথাও যায়নি।' মির্জা কামরান বললেন, 'যদি একাকী কোথাও না গিয়ে থাকে তাহলে আপনিও তার সাথে চলুন।'

মির্জা কামরান পাঁচশ' সৈন্য, মাহুত সজ্জিত হাতী ও দেহরক্ষী সমভি-ব্যবহারে একটি দল আমাকে নিয়ে আসার জন্য প্রেরণ করেন। বলে পাঠিয়েছেন 'যদি লাহোর অবধি না যেতে চাও তো তাতে ক্ষতি নেই, আমার সাথে কিছুদুর গেলেও চলবে।'

শেষাবধি আমরা যখন রওয়ানা দিয়ে কিছুদুর এগোলাম মির্জা কামরান কসম খেয়ে বললেন, আমি তোমাকে আর মোটেই যেতে দেব না। শেষাবধি আমার কান্নাকাটি ও প্রতিবাদ কোন কাজে আসলো না। আমার আপন মা, বোন, পৈত্রিক চাকর-নফর এবং ছেলেবেলার খেলার সাথী যাদের সংস্পর্শে থেকে বড় হয়েছি—এদের সবাইর কাছ থেকে আমাকে ছিনিয়ে জবরদস্তি মির্জা কামরান আমাকে নিয়ে চলে গেল। আমি পরে জানতে পারলাম এ ব্যাপারে বাদশাহর সম্মতি ও নির্দেশ অনুরূপ ছিল। আমি হযরতের কাছে আবেদন জানিয়ে বললাম, আমি কোন দিনই আশা করিনি আপনি এমনটি করবেন এবং আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে মির্জা কামরানের হাতে আমাকে এভাবে তুলে দেবেন।

আমার এ আবেদনের জবাবে বাদশাহ আমাকে শুভেচ্ছা জানালেন এবং বললেন, তোমাকে আমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করবো এটা আমার মন কোন-দিনই চায়নি। তবে মির্জা কামরানের পীড়াপীড়িতে আমি সম্মত না হয়ে পারলাম না। সে খুব ইনিয়ে-বিনিয়ে তোমাকে লাহোর নিয়ে যাবার জন্য আমার কাছে প্রস্তাব করেছিল, ফলে আমি রাজী না হয়ে পারিনি। তাছাড়া, ওদিকে আমি চারদিকে হন্যে হয়ে ফিরছি, যুদ্ধ করে বেড়াচ্ছি। ইনশাল্লা এ সব সংগ্রামের যবনিকাপাত হলেই আমি যথাসময়ে তোমাকে আবার কাছে টেনে নেব।

মির্জা কামরানের কাফেলা লাহোরের দিকে রওনা দিতেই অধিকাংশ আমীর-ওমরাহ এবং সংগতিসম্পন্ন সওদাগর ব্যক্তিরা আত্মীয়-পরিজনদের জন্য পরিবহণের বন্দোবস্ত করে কামরানের সমভিব্যহারে লাহোরের পথে রওনা করে দিল।

লাহোর পৌঁছার পর খবর এলো যে, গঙ্গা নদীর তীরে শের খান এবং সম্রাট হুমায়ুনের মাঝে প্রচণ্ড লড়াই হয়েছে। এই যুদ্ধে হুমায়ুন পরাজিত হয়েছেন। তবে এটা সান্ত্বনার কথা যে, হযরত বাদশাহ আপন ভাই ও পরিজনদের নিয়ে এই বিপদের মাঝ থেকেও কোন মতে বেঁচে গেছেন। আলা হযরতের অন্যান্য আত্মীয়-পরিজন যারা আগ্রায় ছিলেন, এই ঘটনার পর তাঁরা সরাসরি আলোরের পথে লাহোর চলে যান।

এ সময় হযরত বাদশাহ মির্জা হিন্দালকে বললেন, প্রথম সংঘর্ষের সময় আমাদের আকিকা বিবি অপহৃতা হয়েছে। আমি সেই শোক আজও ভুলতে পারিনি। আমার বার বার মনে হয়েছে, এর আগে আমি কেন তাকে নিজ হাতে হত্যা করিনি (তাহলে এই কেলেংকারী থেকে বাঁচা যেতো)। এখন এই যুদ্ধ-বিগ্রহের সময় মহিলাদের নিয়ে চলা-ফেরা করা খুবই দুরূহ ব্যাপার। মির্জা হিন্দাল বললেন, নিজেদের মা বোনদের নিজ হাতে হত্যা করার মতো পরিস্থিতি কত বেদনাদায়ক তা আলা হযরত বিলক্ষণ জানেন। আমিও এ ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে, আমার দেহে এক বিন্দু রক্ত থাকতে রাজ-পরিবারের এসব মহিলাদের রক্ষণাবেক্ষণ করে যাব। আশা করি, আল্লাহ-তালা আমাকে সে শক্তি প্রদান করবেন যেন আমি এদের ইজ্জত-আব্রু রক্ষার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করতে পারি।

অবশেষে হযরত বাদশাহ মির্জা আসকরী, ইয়াদগার নাসের মির্জা ও যেসব আমীর-ওমরাহ যুদ্ধ থেকে অক্ষত অবস্থায় প্রাণ বাঁচিয়ে এসেছেন, তাদের নিয়ে ফতেহপুর যাত্রা করেন। এদিকে মির্জা হিন্দাল হযরত মাতা দিলদার বেগম, সহোদরা গুলচেহারা বেগম, আফগানী আগাচা, গুলনার আগাচা, নারগুল আগাচা এবং অন্যান্য আত্মীয়-পরিজনদের ও সভাসদ সমভিব্যহারে আলোরের দিকে রওনা দেন। পথিমধ্যে দুষ্কৃতিকারীরা নানা-ভাবে তাদের আক্রমণ করে এবং সহগামী সৈন্যদের ক'টি ঘোড়া ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

মির্জা হিন্দাল এসব আক্রমণকারী দুষ্কৃতিকারীদের নির্মমভাবে পরাজিত করেন। প্রতিপক্ষের একটি তীর এসে মির্জার ঘোড়ার গায়ে লাগার পর উভয় পক্ষে প্রচণ্ড লড়াই বাঁধে এবং মির্জা হিন্দাল দুষ্কৃতিকারীদের হিংস্র ছোবল

থেকে মেয়েদের উদ্ধার করে। হযরত মাতা ও অন্যান্য সহোদরা এবং ত্রিশ-জন আমীর-ওমরাহ অবশেষে প্রাণ বাঁচিয়ে আলোরে পৌছতে সক্ষম হন। আলোর থেকে তাঁবু তৈরীর প্রয়োজনীয় জিনিস ও অন্যান্য ভোগ্যবস্তু সংগ্রহ করে ক্রমান্বয়ে লাহোরের পথে এগিয়ে চলেন। মির্জা ও আমীরদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রও এখান থেকে সংগ্রহ করা হয়। কিছুদিনের মধ্যেই এই দল লাহোর উপনীত হয়। হযরত বাদশাহ বিবি হাজ তাজ[১]-এর মাজার সংলগ্ন বাগে খাজা গাজীতে উঠেছিলেন।

আলা হযরত যতদিন লাহোরে অবস্থান করেছিলেন প্রতিদিন নিয়মিত শের খানের খবর আসতো। প্রায়ই শোনা যেতো আজ শের খান আরো ছ'মাইল এগিয়ে এসেছেন, আজ তিনি আরো চার মাইল অতিক্রম করেছেন ইত্যাদি। শেষাবধি একদিন শোনা গেল তিনি সেরহিন্দ পর্যন্ত পৌছে গেছেন।

রাজকীয় সভাসদদের একজনের নাম ছিল মোজাফ্ফর বেগ। তিনি তুর্কমানের বাসিন্দা ছিলেন। আলা হযরত তাকে কাজী আবদুল্লা সমভিব্যহারে শের খানের কাছে বাণী পাঠিয়ে বললেন, "তুমি আমাদের উপর এত অত্যাচার কেন করছ। আমি তোমার জন্য পুরো হিন্দুস্থান ছেড়ে দিয়েছি তুমি লাহোর আমার জন্য ছেড়ে দাও। তুমি এখন সেরহিন্দে এসে পৌছেছ, তোমার আমার মাঝে এখানেই সীমানা নির্ধারিত হোক।"

---

১. আল্লামা আবুল ফজলের বর্ণনা মতে মির্জা হিন্দাল বাগে খাজা গাজীতে উঠেছিলেন এবং বাদশাহ হুমায়ুন বাগে খাজা দোস্ত মুন্সিতে উঠেছিলেন। বিবি হাজ, বিবি তাজ, বিবি নুর, বিবি হুর, বিবি গওহুর এবং বিবি শাহবাজ সম্পর্কে হাজিনাতুল আসফিয়া গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এরা হযরত ইমাম হোসেনের চাচা হযরত আকিল বিন আবি তালিব-এর কন্যা ছিলেন। হযরত ইমাম হোসেন যখন কারবালা ময়দানে শাহাদৎবরণ করেন এই বিবিগণ এক গোপন আমন্ত্রণক্রমে পাঞ্জাবে এসে উপনীত হয়ে যেখানে বর্তমানে তাদের মাজার রয়েছে সেখানে অবস্থান করেছিলেন। এই বোনরা নিজেদের পবিত্রতা ও ব্যক্তিত্বগুণে বহু হিন্দুদের মুসলমান বানিয়েছিলেন। এ খবর শুনে লাহোরের হিন্দু গবর্নর উত্তেজিত হয়ে উঠেন। এবং এদেরকে বলপূর্বক শহর থেকে বের করে দেওয়ার জন্য তার পুত্রকে প্রেরণ করেন। কিন্তু গবর্নরপুত্র যখন এদের কাছে আসেন, তাদের কথাবার্তা শুনে মুগ্ধ হয়ে যান এবং তাদের ভক্ত হয়ে পড়েন। এতে গভর্নর আরো উত্তেজিত হয়ে উঠেন এবং স্বয়ং তাদেরকে উৎখাত করার জন্য চলে আসেন। গভর্নরের উদ্যত মূর্তি দেখে এই মহিয়সী মহিলাগণ আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। কথিত আছে, তাদের প্রার্থনার পর ধরিত্রী দ্বিধা হয়ে ফাটল সৃষ্টি হলো এবং তাতেই তারা আশ্রয় নিল। কালক্রমে সেখানে মাজার গড়ে উঠে।

(হাজিনাতুল আসফিয়া, ২য় খণ্ড, ৪০৭ পৃষ্ঠা)

কিন্তু এই অত্যাচারী নিষ্ঠুর লোকটি এ প্রস্তাবে রাজী না হয়ে বরং পাল্টা খবর পাঠিয়ে বলল, "আমি তোমার জন্য কাবুল ছেড়ে দিয়েছি, তুমি সেখানে চলে যাও।"

মোজাফ্ফর বেগ এই জবাব নিয়ে দ্রুত রওনা হয়ে এলেন। খবরটা আগেভাগে পৌঁছিয়ে দেবার জন্য একজন দ্রুতগামী কাসেদ (দূত) দৌড়ে এসে বলল, বাদশাহ হুজুর তাড়াতাড়ি প্রস্থান করুন। কাসেদ পৌঁছতেই হযরত বাদশাহ লাহোর ত্যাগ করেন। সেদিনটা ছিল কিয়ামত সদৃশ। লোকরা সাজানো গোছানো বাড়ীঘর ও আবাসস্থল সবকিছু ফেলে শুধু নগদ টাকাপয়সা নিয়ে প্রাণ বাঁচিয়ে পলিয়ে যেতে লাগল। সবাই একে একে রাভি নদী অতিক্রম করার পর হাফ ছেড়ে বাঁচল।

বাদশাহ হুমায়ুনের সকল সহযাত্রী রাভি নদী পার হয়ে ওপারে অস্থায়ী-ভাবে অবস্থানের বন্দোবস্ত করে নেন। এখানে শের খানের দূত হযরতের খেদমতে হাজির হন। বাদশাহ পরদিন সকালে এই দূতকে দর্শন দেবেন বলে মনস্থ করেছিলেন। মির্জা কামরান নিবেদন করলেন আগামী দিন আপনি যখন দরবার বসাবেন এবং যথারীতি শের খানের দূত আপনার সাথে দেখা করতে আসবে তখন আমি মসনদে আপনার পাশে বসার অনুমতি চাই। কেননা, আমার এবং আমার অপর ভাইয়ের মাঝে কোন পার্থক্য থাকবে এটা আমার কাছে বড় পরিতাপের বিষয় হবে।

হামিদাবানু বেগম বলেন, মির্জা কামরানের এই আবেদনের জবাবে বাদশাহ মির্জাকে এক চরণ রুবাই কবিতা লিখে প্রেরণ করেন। কিন্তু আমি শুনেছি এই চার লাইন কবিতা তিনি শের খানের উদ্দেশ্যে লিখে উক্ত দূতের হাতে দিয়ে-ছিলেন। রুবাই নিম্নরূপ :

দর আইনা গারচে খোদ নোমাই বাসদ
পায়ওয়াস্তা যে খেশতান জুদাই বাসদ
খোদরা বেমেছালী গায়ের দিদন আজরআস্ত
ইঁবুয়াল আজবী কারে খোদায়ে বাশদ।[১]

---

১. অনুবাদ : দর্পণে মানুষ নিজেরই প্রতিবিম্ব দেখে থাকে। অথচ এই প্রতিবিম্ব সবসময় আসল মানুষটি থেকে বিচ্ছিন্ন। এটা এক বিস্ময় বটে, মানুষ নিজেকে অন্যরূপে দেখে, এসব বিস্ময় কীর্তি খোদারই কারসাজি।

শের খানের দুত এসে যথারীতি বাদশাহর সাথে দেখা করলেন। এসময় বাদশাহ বিশেষ চিন্তিত ও শোকাকুল ছিলেন। মনের অস্থৈর্য দুর করার জন্য আফিম খেয়ে নেশাগ্রস্থ হয়েছিলেন। কিছুক্ষণ পর শুয়ে পড়েছিলেন। স্বপ্নে দেখতে পেলেন একজন সুপুরুষ আপাদমস্তক সবুজ পোশাকে আবৃত অবস্থায় তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। হাতে লম্বমান লাঠি। তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলছেন, "হতাশ হয়োনা, পুরুষ জনোচিত ব্যাক্তিত্ব ধারণ করো, কোন চিন্তা করো না।" একথা বলে তিনি তার হাতের যষ্টি বাদশাহর হাতে ন্যস্ত করলেন এবং বললেন, "খোদা তোমাকে অচিরেই পুত্র সন্তান দান করবেন, তার নাম রেখো জালালুদ্দিন মোহাম্মদ আকবর।"

হযরত বাদশাহ এই মহান ব্যাক্তির নাম জিজ্ঞেস করতে তিনি বললেন, "আমার নাম জেন্দা ফিল আহমদ জাম, তোমার সন্তান আমার বংশোদ্ভূত হবে।"

এসময় বিবি গুনুর গর্ভাবস্থায় ছিলেন। সবাই বলাবলি করছিল তার গর্ভে ছেলে সন্তান হবে। কিন্তু জমাদিউল আউয়াল মাসে বাগে মুন্সীতে গুনুর-এর গর্ভে এক মেয়ে ভূমিষ্ট হলো। হযরত বাদশাহ তার নাম রাখলেন বানু বেগম।

এ সময় কাশ্মীর আক্রমণ করার জন্য মির্জা ওয়াহিদকে প্রেরণ করা হলো। কিন্তু পরক্ষণেই সংবাদ এলো শের খান এদিকেও আসছেন। আবার সীমাহীন অস্থৈর্য, অনিশ্চয়তা। সিদ্ধান্ত হলো পরদিন প্রত্যুষে এ স্থান ত্যাগ করতে হবে।

যে ভাই লাহোরে ছিলেন, প্রতিদিন পারস্পরিক শলা-পরামর্শ করতেন এবং কোন কিছু নিশ্চিন্ত সিদ্ধান্তে না পৌছতেই খবর এলো যে, শের খান এসে গেছে। সাত পাঁচ ভেবে কোন কিছুই সিদ্ধান্ত নেয়া গেল না। তখন ছিল বেলা দ্বিপ্রহর। তখনই রওনা হয়ে গেল সবাই। বাদশাহের ইচ্ছা ছিল কাশ্মীর যাবেন। তিনি সেখানে মির্জা হায়দার কাশ্মিরীকে আগে ভাগেই পাঠিয়েছেন। কিন্তু মির্জা কাশ্মীর জয় করে ফেলেছেন, এমন কোন খবর এখনও অবধি পৌছে নাই। সবাই পরামর্শ দিল, আপনি যদি কাশ্মীর চলে যান এবং তা যদি ইতিমধ্যে জয় না হয়ে থাকে আর এদিকে শের খানও লাহোর অধিকার করে ফেলে তাহলে আগাগোড়া ব্যাপারটা তালগোল পাকিয়ে যাবে, বড় দুঃসময়ে পড়ে যাব আমরা।

খাজা কাঁলা বেগ এ সময় শিয়ালকোটে ছিলেন। তিনি আলা হযরতের খেদমতে হাজির হওয়ার জন্য সেখান থেকে রওনা দিলেন। তার সাথে মুইদ বেগও ছিলেন। মুইদ বেগ হযরত বাদশাহকে এক আবেদনে জানিয়েছেন যে, খাজা আপনার সাথে মিলিত হবার জন্যে খুবই উদগ্রীব এবং আপনার সেবা করার ইচ্ছা পোষণ করেন। কিন্তু মির্জা কামরানের ভাবমূর্তি তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। যদি আপনি এতদঞ্চলে আসেন তাহলে মির্জা আপনার সেবা করার সৌভাগ্য অর্জন করবে। হযরত বাদশাহ একথা শুনতেই জররা পরিধান করে বক্কর রওনা হয়ে সেখানে সন্ধি স্থাপন করে খাজার সাথে মিলিত হবার উদ্দেশ্যে রওনা দেন এবং তার সাথে মিলিত হয়ে তাকে নিয়ে ফিরে আসেন।

হযরত জানালেন, আমি ভাইদের নিয়ে বদখশান চলে যাব এবং কাবুল কামরান মির্জার অধীনে ছেড়ে চলে যাব। কিন্তু মির্জা কামরান কাবুল যেতে রাজী হলেন না। বললেন, মহাত্মা সম্রাট বাবুর জীবদ্দশায় এই কাবুল আমার মাতা জননীকে দিয়েছিলেন। এ জন্যে আমার পক্ষে কাবুল গ্রহণ করা উচিত হবে না। হযরত বাদশাহ বললেন, এই কাবুল সম্পর্কে বংশকুল চূড়ামণি সম্রাট বাবুর প্রায়শঃ বলতেন, এই কাবুল আমি কাউকেই দেব না। আমার সন্তানরা যেন এই কাবুলের লোভ না করে। কেননা আল্লাতায়ালা এই কাবুলেই আমার সকল সন্তান দান করেছেন এবং আমার সকল বিজয় এই কাবুল থেকেই শুরু হয়েছে। মহাত্মা হযরত বাবুর তাঁর লিখিত তুজুকে বাবুরীতে এর স্বপক্ষে অনেক কিছু বলেছেন। তাই এই কাবুল নগরী আমি দয়াপরবশ ও মানবতা প্রদর্শনপূর্বক মির্জাকে দেওয়ার মনস্থ করেছিলাম অথচ আজ মির্জা কামরান ভিন্ন সুরে কথা বলছেন।

মোট কথা, হযরত আলা মির্জাকে অনেক করে বুঝালেন এবং সহানুভূতি প্রকাশ করলেন কিন্তু মির্জা নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকলেন।

হযরত বাদশাহ যখন দেখলেন যে, মির্জার সাথে অনেক লোকজন রয়েছে এবং কোনক্রমেই সে আমার কথা মানছে না তখন বাধ্য হয়ে তিনি ভক্কর এবং মুলতানের দিকে পা বাড়ালেন।

মুলতান আসার পর প্রথম দিন সেখানে কাটালেন। শিবিরে যা কিছু খাবার ছিল সাথীদের মাঝে বন্টন করলেন এবং সে স্থান ত্যাগ করে নদী তীরে

এসে থামলেন। স্থানটি ছিল ৭টি নদীর সঙ্গমস্থল। নদী পারাপারের জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেন। কিন্তু তীরে একটা নৌকাও ছিল না। আলা হযরতের সাথে রয়েছে অনেক সৈন্য। এদের নিয়ে নদী পার হওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। এ-সময় খবর এলো যে, খাওয়াস খান লোকজন নিয়ে হযরত বাদশাহর পিছু নিয়েছে। এলাকাটা ছিল বখশু নামক একজন বালুচ জমিদারের। বখশু বালুচের অসংখ্য নৌকা ছিল। হযরত কতিপয় লোকদের সমভিব্যাহারে বখশুর উদ্দেশ্যে আপাদমস্তক খেলাত, ঘোড়া ও নানা উপঢৌকন পাঠিয়ে কিছু সংখ্যক নৌকা এবং খাদ্যদ্রব্য চেয়ে পাঠালেন। বখশু বালুচ খাদ্যদ্রব্য বোঝাই ১০০টি নৌকা বাদশাহর খেদমতে প্রেরণ করলেন। হযরত নৌকা এবং খাদ্য-সম্ভার পেয়ে যারপরনাই খুশী হলেন। খাদ্যদ্রব্য সকলের মাঝে বন্টন করে দিলেন এবং নৌকায় চড়ে নির্বিঘ্নে নদী পার হলো সকলে। এটা খোদার একটা অনুগ্রহ বটে যে, এমন একটা বিপদের সময় বখশু জমিদার যে আতিথ্য ও সাহায্য দিয়েছে, এমন আর হয় না।

এরপর মুলতান এবং ভক্কর-এর রাস্তা অতিক্রম করার পর আলা হযরত সদলবলে ভক্কর উপনীত হলেন। ভক্কর-এর দুর্গ নদীর ঠিক মধ্যিখানে অবস্থিত ছিল। বেশ মজবুত এবং সুদৃঢ় এই দুর্গের গবর্নর সুলতান মাহমুদ খান দুর্গে স্বেচ্ছাবন্দী বরণ করেন। হযরত বাদশাহ এই দুর্গের পাশেই এক বাগানে ছাউনি ফেললেন। এই বাগানটি মির্জা শাহ হোসাইন সমুন্দর বানিয়েছিলেন।

আলা হযরত শাহ হোসাইনের কাছে এক পয়গাম প্রেরণ করে বললেন,

"আমরা বাধ্য হয়ে আপনার রাজ্যে এসে পড়েছি। আপনার এ রাজ্য আপনার শাসনেই থাকুক। আমরা কোনরকম আক্রমণ করার অভিপ্রায় রাখি না। আপনি যথারীতি আমার খেদমতে হাজির হবার চেষ্টা করুন। আমরা গুজরাটের দিকে যাবার মনস্তাপে আছি। এই প্রদেশ আপনারই অধীনে দিয়ে যাব।"

এই পয়গাম পাবার পর মির্জা হোসাইন হযরত বাদশাহর সাথে চাতুর্য প্রদর্শন করেন এবং নানা ছলনার আশ্রয় নিয়ে পাঁচ মাস এখানে ঠেকিয়ে রাখেন। তারপর এক কাসেদ (দুত) প্রেরণ করে বললেন, আমি আমার কন্যা-রত্নের বিবাহ প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত। আমি একজন কাসেদ আপনার খেদমতে প্রেরণ করছি, আমি শেষে আসব। আলা হযরত তার কথায় বিশ্বাস স্থাপন

করে আরো তিন মাস তার অপেক্ষায় ছিলেন। এ সময় কখনো খাবার পাওয়া যেতো, কখনো পাওয়া যেতো না। ক্ষুধার তাড়নায় সৈন্যরা নিজেদের উট এবং ঘোড়া জবাই করে পর্যন্ত খেয়েছে।

শেষাবধি আলা হযরত শেখ আবদুল গফুরকে শাহ মির্জা হোসাইনের কাছে পাঠিয়ে বললেন, "আর কতোদিন অপেক্ষা করতে হবে? আমার কাছে আসতে কে তোমায় বাঁধা দিচ্ছে? পরিস্থিতি খুবই উদ্বেগজনক। আমার লোকজন পালিয়ে যেতে শুরু করেছে।"

এর জবাবে তিনি বললেন, "কামরান মির্জার সাথে আমার মেয়ের বাগদান হয়েছে। সঙ্গত কারণে আমি আপনার কাছে আসতে পারি না। সত্যি বলতে কি, আমি আপনার কাছে আসতে পারব না।"

এ সময় নদী পার হয়ে মির্জা হিন্দাল এদিকে এলেন। শোনা গেল এঁরা কান্দাহারের দিকে যাচ্ছে। একথা শুনে আলা হযরত তার পেছনে লোক পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "শুনলাম আপনি নাকি কান্দাহার যাচ্ছেন"? মির্জা বললেন, "কে বললে, এ কথা মিথ্যা।" এভাবে সঠিক সংবাদটা জানার পর আলা হযরত মহামান্য মাতাকে দেখার জন্য গেলেন।

অতঃপর মির্জা হিন্দালের হেরেম ও অন্যান্য লোকজনরা আলা হযরতের খেদমতে হাজির হয়ে অভিবাদন জানালো। হামিদাবানু বেগমকে সামনে পেয়েই হযরত বাদশাহ জিজ্ঞেস করলেন, এঁর পরিচয় কি? বলা হলো, ইনি মীর বাবা দোস্তের কন্যা। এ সময় খাজা মোয়াজ্জেম সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি বললেন, 'হামিদা বানু আমার প্রণয়ী।'

এ সময় হামিদা বানুকে প্রায়শঃ মির্জার মহলে আনাগোনা করতে দেখা যেতো। দ্বিতীয় দিন আলা হযরত দ্বিতীয়বারের মতো হযরত মাতাকে দেখার জন্য অন্দরমহলে এলেন এবং বললেন, মীর বাবা দোস্ত আমাদেরই আত্মীয়-স্বজন। আপনি যদি হামিদা বানুর সাথে আমার বিবাহের আয়োজন করেন তাহলে বেশ হয়। মির্জা হিন্দাল প্রতিবাদ করে উঠলো। বলল, 'আমি এই মেয়েটিকে আমার বোন বা কন্যা শ্রেণীর বলে জ্ঞান করি, আপনি সকলের শ্রদ্ধেয় বাদশাহ। আপনার জন্যে এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিন্দার্হ। বিষয়টি অনেকের পীড়ার কারণ হবে। শুনে হযরত বাদশাহ ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গেলেন।

আমার মাতা এরপর আলা হযরতকে এক চিঠিতে লিখলেন, "মেয়ের মা তাকে বুঝাচ্ছেন, অথচ সামান্য কথা শুনেই আপনি মন খারাপ করে চলে গেলেন।" হযরত বাদশাহ জবাবে লিখলেন, "আপনি এ ব্যাপারে আদ্যপান্ত যা লিখেছেন তা পড়ে আমি খুব খুশী হয়েছি। আপনি এ ব্যাপারে যা বলবেন এবং সিদ্ধান্ত নেবেন আমি তা-ই মাথা পেতে নেব। খোরপোষ সম্পর্কে আপনি যা বলবেন আমি তা মানব। আমি পথ চেয়ে আছি।"

হযরত মাতা বাদশাহের কাছে চলে গেলেন এবং তাঁকে নিয়ে ফিরে এলেন। সেদিন খুব জমজমাট আসর বসেছিল। আসর শেষে আলা হযরত নিজের মহলে ফিরে গেলেন। পরদিন আমার মায়ের কাছে এসে বললেন, 'কাউকে পাঠিয়ে হামিদা বানুকে ডাকা হোক।' হামিদা বানু এলো না। বরং বলে পাঠালো, যদি বাদশাহকে সালাম করার অভিপ্রায় হয়ে থাকে তা তো আমি গত দিনই সম্পন্ন করেছি। শুধু শুধু এখন গিয়ে কি করব? এরপর বাদশাহ সোবহান কুলীকে নির্দেশ দিলেন যে, তিনি যেন মির্জা হিন্দালের কাছে গিয়ে বলেন, সে যেন বেগমকে পাঠিয়ে দেয়। সোবহান কুলীকে মির্জা জানালেন, আমি বেশ করে বুঝালাম, কিন্তু সে যেতে চায় না। তুমি বরং নিজে গিয়ে তাকে বলে দেখ' সোবহান কুলী বেগমের কাছে গিয়ে বাদশাহর অভিপ্রায় জানালেন। বেগম বলল, বাদশাহ্‌কে একবার দেখা যায়। দ্বিতীয়বার দেখা না জায়েজ। কেননা তিনি আমার কাছে পরপুরুষ। অতএব আমার পক্ষে আবার যাওয়া সম্ভব নয়। সোবহান কুলী সমুদয় বৃত্তান্ত বাদশাহ্‌কে বললেন। বাদশাহ শুনে স্মিত হেসে বললেন, আমি ভিন পুরুষ, আপন হতে কতক্ষণ?

মোটকথা, এভাবে চল্লিশ দিন যাবৎ হামিদা বানুর পক্ষ থেকে এ ধরনের মান-অভিমান ও দর কষাকষি চলল। বাদশাহকে সে কোন মতেই বিবাহ করতে রাজী নয়। আমার মা দিলদার বেগম তাকে অনেক করে বুঝালেন। বললেন, শেষাবধি তুমি যে কোন একজন পুরুষ মানুষকে তো বিয়ে করবেই। অথচ বাদশাহর পাণি গ্রহণে তোমার অনীহা কেন? বাদশাহর চাইতে বড় পাত্র তুমি কোথায় পাবে?

হামিদা বানু জবাব দিল, 'ঠিকই বলেছেন, যে কোন পুরুষকে আমার বিয়ে করতেই হবে। কিন্তু সে হবে এমন পুরুষ, যাকে আমি সহজেই আমার আয়ত্তে

পাব। যাকে আমি কাছে পাব না, যার দর্শন লাভ করার জন্য আমাকে রীতিমত সাধনা করতে হবে, সে মানুষ আমি কেন বিয়ে করব?'

মোটকথা, এভাবে চল্লিশ দিন নানা যুক্তি-তর্ক ও কথা কাটাকাটির পর অবশেষে ৯৪৮ হিজরীর জমাদিয়াল আউয়াল মাসের মঙ্গলবার দিনক্ষণ ঠিক হলো। হযরত বাদশাহ এস্তেরলাভে হস্তযুগল স্থাপন করে এই শুভক্ষণের দিন ঘোষণা করেন এবং মীর আবুল বকাকে ডেকে নির্দেশ দিলেন—যথারীতি হামিদা বানু বেগমের সাথে তাঁর বিবাহ সম্পন্ন করা হোক। মীর আবুল বকা এই বিবাহ সম্পন্ন করার দক্ষিণা বাবদ ২ লাখ টাকা লাভ করেন। বিবাহের পর তিন দিন বাদশাহ্ এ স্থানে অবস্থান করেন এবং অতঃপর নৌকাযোগে ভক্করের উদ্দেশ্যে রওনা দেন।

ভক্করে একমাস অবস্থান করেন। মীর আবুল বকাকে ভক্করের শাসনকর্তার কাছে কাসেদ হিসাবে প্রেরণ করেন। কিন্তু সেখানে যেয়ে তিনি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন এবং শেষাবধি মৃত্যুবরণ করেন।

আলা হযরত মির্জা হিন্দালকে কান্দাহার রওনা হয়ে যাবার অনুমতি দিলেন এবং মির্জা ইয়াদগার নাসেরকে নিজের স্থলে লেহরীতে রেখে স্বয়ং সাইহোয়ানে যাত্রা করেন। সাইহোয়ান থাট্টা এলাকা থেকে ৬৷৭ মাইল অদূরে অবস্থিত ছিল। এখানটায় একটা মজবুত দুর্গ ছিল। হযরত বাদশাহর মীর আলিকা নামক একজন ভৃত্য এই দুর্গে থাকতো। এর দখলে কয়েকটি তোপ ছিল। কারো পক্ষে এই দুর্গ দখল করার প্রচেষ্টা ছিল সম্পূর্ণ অবান্তর।

আলা হযরতের লোকরা মোর্চা তৈরী করে ক্রমশঃ এই দুর্গের কাছাকাছি পৌঁছে গেল। আলিকাকে বলা হলো এ সময় সে যেন কোন রকম নিমকহারামী না করে। কিন্তু আলিকা সে কথায় সায় দিল না। বাধ্য হয়ে সৈন্যরা সুড়ং তৈরী করে দুর্গের একটি ব্রিজ উড়িয়ে দিল। কিন্তু তারপরও দুর্গ দখল করতে পারলো না।

এ সময় খাদ্যাভাব দেখা দিল এবং দুর্ভিক্ষাবস্থা এসে পড়ল। অনেক সৈন্য সামন্ত পালিয়ে গেল। আলা হযরত এখানে ছ'সাত মাসের মতো অবস্থান করেছিলেন। মির্জা শাহ হোসাইন-এর সৈন্যরা চারদিকে গোয়েন্দা সুলভ চাতুর্য নিয়ে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত শাহী সৈন্যদের পথরোধ করে এবং গ্রেফতার করতে

থাকে। এদের নিজেদের সৈন্যদের হাতে সোপর্দ করে মির্জা হুকুম দিলেন সবাইকে সুর নদীতে ডুবিয়ে মারা হোক।

এই হুকুমের পরিপ্রেক্ষিতে চারশ' সৈন্যকে প্রথমতঃ একটা স্বল্প পরিসর কামরায় বন্ধ করা হলো। তারপর নৌকায় ভর্তি করে সুর নদীতে ফেলে আসা হলো। এভাবে তিন চারশ' করে প্রায় দশ হাজার সৈন্যকে নদীতে ডুবিয়ে মারা হলো।

এভাবে যখন আলা হযরতের কাছে মাত্র সামান্য সংখ্যক সৈন্য রয়ে গেল তখন শাহ হোসাইন মির্জা নৌকাসমূহে তোপবন্দুক স্থাপন করে থাট্টা থেকে আলা হযরতের একেবারে ঘাড়ের উপর এসে উপনীত হলো। সাইহোয়ান শহর নদী তীরে অবস্থিত ছিল। শাহ হোসাইন সাইহোয়ান এসেই আলা হযরতের মালামালসহ নৌকাসমূহ নদীতে ডুবিয়ে দিল এবং একজনকে দিয়ে বাদশাহকে খবর পাঠাল যে, আমি আপনার নিমক খেয়েছি, নিমকহারামী করতে পারব না, তাড়াতাড়ি এখান থেকে সরে পড়ুন। হযরত বাধ্য হয়ে দ্বিতীয়বার ভক্কর ফিরে চললেন। ভক্কর না পৌঁছতেই মির্জা হোসাইন সমুন্দর ইয়াদগার মির্জার সাথে ষড়যন্ত্র করে তাকে বলল, ভক্কর এবার তোমার হলো। আর আমিও তোমার। আমি নিজের মেয়ে তোমার কাছে বিবাহ দিতে চাই। মির্জা ইয়াদগার তার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে হযরত বাদশাহকে ভক্কর আসতে বাধা দান করেন এবং তাকে যুদ্ধ অথবা চাতুর্য, যেভাবেই হোক ভক্কর থেকে ফিরে যেতে বাধ্য করেন।

আলা হযরত ইয়াদগার নাসেরের কাছে কাসেদ প্রেরণ করে বললেন, 'বৎস, তুমি আমার পুত্র সম। আমি তোমাকেই আমার পক্ষ হয়ে প্রতিরোধ করার জন্য এখানে বসেছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল, প্রয়োজনের সময় তুমি আমার কাছে আসবে। কিন্তু তুমি চাকর-নফরদের কুপরামর্শে আমার সাথে এসব কি দুর্ব্যবহার করছ? তুমি জেনে রেখো, এই চাকরটি কোন দিনই তোমার বন্ধু হবে না।' যদিও হযরত বাদশাহ এ ধরনের বহু আদেশ উপদেশ দিলেন, কিন্তু তাতে কোন কাজ হলো না। শেষাবধি বাদশাহ তাকে বললেন, 'যাক, আমি এই শহরের শাসন ক্ষমতা তোমাকে অর্পণ করে স্বয়ং রাজা মলদেবের কাছে চলে যাচ্ছি। মনে রেখ, শাহ হোসাইন তোমাকে কোনদিনই এখানে থাকতে দেবে না।'

মির্জা ইয়াদগার নাসেরকে একথা বলে আলা হযরত মলদেব রাজার উদ্দেশ্যে রওনা হন। জসল্মীরের পথ ধরে হযরত বাদশাহ কয়েকদিনের মধ্যেই মলদেব রাজার রাজ্যের উপকণ্ঠে দিলাদর দুর্গের কাছে পৌছেন। দু'দিন সেখানে অবস্থান করেন। কিন্তু সৈন্যদের জন্য কোন খাবার তো মিললই না, ঘোড়াদের জন্য ঘাসও না। বাধ্য হয়ে জসল্মীরের দিকে ফিরে চললেন। জসল্মীরের কাছে পৌঁছলে জসল্মীরের রাও তাঁর সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। এই যুদ্ধে হযরত বাদশাহর ক'জন সঙ্গী হতাহত হন। তন্মধ্যে সাহাম খান, জলদিয়ারের ভাই লোমা বেগ, পীর মোহাম্মদ আখসা, রওশানক তুশকী ও অন্যান্যদের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু শেষাবধি বাদশাহ জয়লাভ করেন, বিধর্মীগণ পরাজিত হয়ে পালিয়ে গিয়ে দুর্গে আশ্রয় নিল। আলা হযরত এই একদিনে প্রায় ষাট মাইল পথ অতিক্রম করেন এবং এক জলাশয়ের কাছে এসে থামেন। এরপর তিনি জসল্মীরের দিকে যান। সেখানকার লোকরা তাঁকে পথিমধ্যে নানা ধরনের দুঃখ কষ্ট দেয়। শেষাবধি তিনি রাজা মলদেবের পাহলভী নামক এক পরগনায় যেয়ে উপনীত হন। রাজা মলদেব এ সময় যোধপুরে ছিলেন। তিনি এক জররাবক্তর এবং এক পাত্র আশরফী হযরতের জন্য উপঢৌকন পাঠান। রাজা আলা হযরতকে অনেক আশা-ভরসা দেন এবং স্বাগত জানান। বিকানীর অঞ্চল হযরত বাদশাহকে দান করবেন বলেও আশ্বাস দেন।

হযরত বাদশাহ নিশ্চিন্ত মনে পথিমধ্যে সেখানেই ছাউনি ফেলেন এবং আতকা খানকে মলদেবের কাছে পাঠিয়ে জবাবের অপেক্ষা করতে থাকেন। সুরথ্ কেতাবদার নামক একজন বিশ্বস্ত লোক প্রথম পরাজয়ের অব্যবহিত পরে মোগল-দের ক্ষমতাচ্যুতির বিক্ষিপ্ত দিনগুলোতে মলদেবের অঞ্চলে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল এবং শেষাবধি সেখানে চাকুরী গ্রহণ করে। সে গোপনে হযরত বাদশাহর কাছে এক আবেদন পাঠিয়ে জানাল যে, কস্মিনকালেও আর সামনের দিকে এগোবেন না, যেখানে আছেন সেখান থেকেই পালিয়ে যাবার চেষ্টা করুন। মলদেব আপনাকে বন্দী করার ফিকিরে আছে। তার কোন কথায় বিশ্বাস স্থাপন করবেন না, কেননা, এদিকে শেরখানের একজন দূত এসেছে। সে তাকে লিখেছে, যেভাবেই হোক হুমায়ুন বাদশাহকে পাকড়াও করো। যদি তুমি এ কাজ সম্পন্ন করতে পার তাহলে তোমাকে নাগুর, আলোর এবং অন্য যে জায়গা তুমি চাও

তোমাকে দেয়া হবে। আতকা খান ফিরে এসে পরামর্শ দিল যে, এখানে আর অবস্থান করা সমীচীন নয়। জোহরের নামাজের সময় হযরত রওনা দিলেন। রওনা দেবার মুহূর্তে দু'জন গোয়েন্দাকে আটক করা হলো। তাদেরকে কাছে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছিল, এমন সময় বাঁধন থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে মাহমুদ কর্দবাজের কোমর থেকে তলোয়ার ছিনিয়ে নিয়ে প্রথমে মাহমুদকে হত্যা এবং পরে ক'জন গোয়ালিয়রবাসীকে জখম করল। দ্বিতীয় লোকটি একজন সৈন্যের কোমর থেকে ছোড়া কেড়ে নিযে ক'জনকে আহত করে শেষাবধি হযরত বাদশার অশ্বকে মেরে ফেলল। অবশ্য অনেক কষ্টে শেষে এ দু'জন লোককে আয়ত্তে আনা হলো।

এমন সময় সোরগোল শোনা গেল যে, মলদেব এদিকে আসছে। হযরত বাদশাহর কাছে হামিদা বানুকে তুলে নেবার জন্য কোন ঘোড়া ছিল না। হামিদা বানুর জন্য তরদী বেগের ঘোড়াটি চাওযা হলে সে দিতে অস্বীকার করল। হযরত বাদশাহ উটের উপর সুসজ্জিত হাওদা তৈরীর কথা বললেন। বললেন, আমি উটে চড়ে যাব আর আমার ঘোড়াতে চড়ে হামিদা বানু যাবে।

নাদিম বেগ যখন একথা শুনলেন যে, হযরত বাদশাহ তার নিজের সওযারী হামিদা বানুর জন্যে নির্দিষ্ট করে রেখেছেন এবং নিজে উটে চড়ে যাবেন তখন ন তার মাকে উটে চড়িযে দিলেন এবং তার পরিত্যক্ত ঘোড়াটি হযরতের খেদমতে পেশ করলেন।

হযরত এই ঘোড়াতে আরোহণ করে অমরকোটের দিকে রওনা দেন। এখান থেকে একজন লোক পথ দেখিযে এগিযে নিযে যাওযার জন্য সাথে নিলেন। বায়ুপ্রবাহ খুব গরম ছিল। কাফেলার ঘোড়া ও অন্যান্য চতুষ্পদ জন্তুদের পা বালির মধ্যে ডুবে যেতে লাগল। ওদিকে মলদেব পশ্চাদানুসরণ করে আসছিল। এভাবে অনাহার অনিদ্রা বরণ করে কাফেলা এগিয়ে চলেছিল বিরামহীন। তাদের মধ্যে অনেকে চলেছিল পদব্রজে। মলদেবের লোকরা যখন একেবারে কাছাকাছি এসে পড়েছে তখন হুমায়ুন বাদশাহ তৈমুর সুলতান, মোনেম খান এবং অন্য ক'জনকে হুকুম দিলেন, তোমাদের চলার গতি মন্থর করে দাও এবং প্রতিপক্ষের গতিবিধি অবলোকন করো। এদিকে আমরা নিরাপদে কিছুটা পথ অতিক্রম করে নিই। তারা নির্দেশ মতো চলার গতি মন্থর করে পেছনে রয়ে গেল। এভাবে রাত হয়ে এলে তারা রাস্তা ভুলে গেল।

হযরত বাদশাহ রাত ভর পথ চলতে থাকেন। সকালের দিকে একটা জলাশয়ের সন্ধান পাওয়া গেল। তিনদিন যাবৎ ঘোড়াগুলো পর্যন্ত একটু পানি পান করতে পারেনি। আলা হযরত সবে ঘোড়া থেকে নেমেছেন এমন সময় একটা লোক দৌড়ে এসে খবর দিলো যে, অসংখ্য উট ও অশ্বারোহী হিন্দুরা এদিকে ধাবিত হচ্ছে। আলা হযরত শেখ আলী বেগ, রওশন কোকা, নাদিম কোকা, মীর ইয়াবন্দা মোহাম্মদবর, মীর ওয়ালী ও অন্যান্য সৈন্যদের দোয়া ফাতেহা পড়ে শত্রু সৈন্যদের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন।

হযরত ভেবেছিলেন ইতিপূর্বে শত্রু পক্ষের জন্য নিয়োজিত তৈমুর সুলতান, মোনেম খান ও মির্জা ইয়াদগার হয় নিহত হয়েছে, অথবা কাফেরদের হাতে বন্দী হয়েছে। তাদেরকে কাবু করার পরই তারা আমাদের এসে আক্রমণ করেছে। হযরত বাদশাহ পুনরায় অশ্বারোহণ করে ক'জন সহযাত্রী সমেত সামনের দিকে পা চালিয়ে দেন।

আলা হযরত দোয়া ফাতেহা পড়ে কাফেরদের উদ্দেশ্যে নিজের লোকদের পাঠিয়েছিলেন। প্রেরিত শেখ আলী বেগ রাজপুত সর্দারকে তীরবিদ্ধ করে হত্যা করেন। ফলে রাজপুতরা পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে পালিয়ে গেল এবং মুসলমানদের জয় নিশ্চিত হলো। বিজয়ীরা কতিপয় রাজপুত্রকে জীবিতাবস্থায় বন্দীও করেন। জয়লাভের পর সবাই সামনের দিকে এগিয়ে চললেন। অবশ্য হযরত বাদশাহ আরো অনেক দূর এগিয়ে গেছেন। যেসব লোকরা জয়লাভ করেন তাদের সকলকে নিয়ে পুনরায় সৈন্যবাহিনী পুনর্গঠন করেন। বিজয়ী লোকরা বাহাদুর নামক একজন দূতকে দ্রুত হযরত বাদশাহর কাছে প্রেরণ করে বলেন যে, আপনি যাত্রা স্থগিত করুন। খোদার অসীম অনুগ্রহে আমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়েছে, কাফেরগণ পালিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছে।

বাহাদুর হযরতের কাছে পৌছে খবর দিতেই তিনি অশ্বপৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করেন। জায়গাটায় পানির বন্দোবস্ত ছিল। আলা হযরত বিশেষ উদ্বিগ্ন ছিলেন, না জানি তাঁর সৈন্যসামন্ত ও রাজকীয় পরিষদের ভাগ্যে কি ঘটেছে। এ সময় দূর চক্রবালে কতিপয় অশ্বারোহীকে ধেয়ে আসতে দেখা গেল। দ্বিতীয় বার হৈ হৈ রৈ রৈ পড়ে গেল যে, মলদেবের সৈন্যরা আবার আসছে। এদের সম্পর্কে নিশ্চিত হবার জন্য হযরত একজন লোককে প্রেরণ করলেন। লোকটি খবর সংগ্রহ করে ফিরে এসে বলল যে, এরা তৈমুর

সুলতান, মির্জা ইয়াদগার ও মোনেম খান। এরা অক্ষত অবস্থায় ফিরে আসছে। এরা রাস্তা ভুলে গিয়েছিল। এদের ফিরে পেয়ে হযরত বাদশাহ যারপর-নাই খুশী হলেন এবং খোদার দরবারে শোকরিয়া জ্ঞাপন করলেন।

সাত সকালে আবার রওনা দিতে হলো। পথে পানি পাওয়া গেল না। তিনদিন এভাবে কাটল। তিনদিন পর একটি পানির কূপ পাওয়া গেল। কূপ গভীর ছিল। পানির রং ছিল লাল। একটা কূপে হযরত বাদশাহ নেমে পড়লেন। বাকীগুলোতে একে একে তরদি বেগ খান, মির্জা ইয়াদগার, মোমেন খান, নাদিম খান কোকা, তৈমুর সুলতান, খাজা গাজী এবং রওশান কোকা নেমে পড়লেন।

যখনই কুয়া থেকে পাত্র ভরে উপরে তোলা হতো লোকরা তার উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়তো। একসময় রশি ছিড়ে গেল আর পাঁচ ছয়জন লোক রশির সাথে গভীর কূপে তলিয়ে গেল এবং পানি নিয়ে কাড়াকাড়ি করে বহু পিপাসার্ত লোক মারা গেল।

তৃষ্ণার্ত লোকদের এহেন অবস্থা দেখে হযরত বাদশাহ তার নিজের কূপ থেকে সমুদয় পানি তুলে জমা করলেন এবং যথারীতি লোকদের পানি পান করতে দিলেন। সবাই পানি পান করল এবং জোহরের নামাজের সময় কাফেলা আবার রওনা হলো। একদিন একরাত পথ অতিক্রম করার পর কাফেলা এক সরাই খানায় উপনীত হলো। এখানটায় একটা বিরাটাকার পুকুর পাওয়া গেল। উট এবং ঘোড়াগুলো পানিতে নেমে ইচ্ছামত তেষ্টা মিটিয়ে নিল এবং লোক-রাও পানি পান করে শান্ত হলো। কিছু লোক অতিরিক্ত পানি পান করতে যেয়ে মৃত্যুবরণ করল। এ সময় ঘোড়ার সংখ্যা তেমন বেশী ছিল না। তবে খচ্চর এবং উট ছিল প্রচুর সংখ্যক। এরপর অমরকোট অবধি প্রতিটি স্টেশনেই পানির কোন কষ্ট হয় নি। অমরকোট সুন্দর স্থান। এখানে বেশ ক'টি পুকুরও রয়েছে। অমরকোটের রানা আলা হযরতকে স্বাগত জানালেন এবং পরম সমাদরে দুর্গাভ্যন্তরে নিয়ে সসম্মানে থাকতে দিলেন। অবশ্য রাজকীয় সৈন্যদের সকলকে দুর্গের বাইরে থাকতে হলো।

এখানে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বেশ সস্তা ছিল। এক টাকায় চারটি ছাগল পাওয়া যেতো। রানা বহু ছাগল ছানা হযরতের খেদমতে উপঢৌকন পেশ করেন এবং এমন আতিথ্য প্রদর্শন করেন যে, তা বর্ণনা করার মতো ভাষা নেই।

কিছুকাল মহানন্দে কাটল এখানে। দেখা গেল, রাজকোষের অর্থ প্রায় শূন্য হয়ে এসেছে। তরদিবেগের কাছে এ সময় কিছু টাকা ছিল। আলা হযরত তার কাছে কিছু টাকা ধার চেয়ে নিলেন। বেগ আলা হযরতকে বিশ টাকা সুদে আশী হাজার আশরফী দিলেন। আলা হযরত এই অর্থ সৈন্যদের মাঝে বিতরণ করেন এবং রানা ও তার পুত্রকে কারুকার্য খচিত কোমরবন্দ এবং খঞ্জর আর শিরোপার খেলাত প্রদান করেন। আলা হযরত সৈন্যদের যে অর্থ প্রদান করেছিলেন তা দিয়ে কিছু সংখ্যক ঘোড়াও ক্রয় করা হলো।

যেহেতু মীর হোসাইন রানার পিতাকে হত্যা করেছিল, এর প্রতিশোধ গ্রহণের মানসে এবং অন্যান্য কারণের প্রেক্ষিতে রানা ২।৩ হাজার দক্ষ অশ্বারোহী সৈন্য তৈরী করেন এবং বাদশাহ হুমায়ুন সমভিব্যাহারে ভক্কর রওনা হন।

ভক্কর রওনা হবার সময় বাদশাহ হুমায়ুন তার নিজের আত্মীয়-পরিজন ও অন্যান্যদের অমরকোটে রেখে যান। খাজা মোয়াজ্জেম এদের দেখাশুনার ভার নিয়েছিলেন। এ সময় হামিদা বানু বেগম গর্ভাবস্থায় ছিলেন।

হযরত বাদশাহ ভক্কর রওয়ানা হয়ে গেছেন সবে তিনদিন অতিবাহিত হয়েছে। দিনটা ছিল ৯৪৯ হিজরীর রজব মাসের চতুর্থ দিন। এই দিন প্রত্যূষে জালালুদ্দিন মোহাম্মদ আকবর জন্ম গ্রহণ করেন। এ সময় চাঁদ এক বিশেষ কক্ষ পরিক্রমায় ছিল। জ্যোতিষ শাস্ত্রমতে সময়টি ছিল সিংহ রাশি সম্ভবা। এ সময় কারো জন্ম হলে তিনি সৌভাগ্যবান এবং দীর্ঘজীবী হয়ে থাকেন।

হযরত হুমায়ুন বাদশাহ সবে পনর মাইল পথ অতিক্রম করেছেন এরই মধ্যে তরদী মোহাম্মদ খান এ খবর নিয়ে এলো। হযরত খবর শুনে যারপর-নাই খুশী হলেন। এই খবর নিয়ে হাজির হয়েছে বলে তরদী মোহাম্মদ খানের পূর্বতন সকল অপরাধ ক্ষমা করে দেয়া হলো। তিনি লাহোরে যে স্বপ্ন দেখে-ছিলেন তারই পরিপ্রেক্ষিত এই নবজাত শাহজাদার নাম রাখা হলো জালালুদ্দিন মোহাম্মদ আকবর। সংবাদ প্রাপ্তির পর তিনি আবার ভক্করের দিকে রওনা হন।

রানার লোকলস্কর আর জুল হেরাফ, সুদমা এবং সেমিন্‌চা এলাকা থেকে সংগৃহীত লোকদের নিয়ে এ সময় হযরত বাদশার কাছে দশ হাজার সৈন্য সমাবেশ হয়েছিল।

জৌন নামক পরগনায় পৌঁছার পর জানা গেল শাহ হোসাইনের এক গোলাম ক'জন অশ্বারোহীসহ এখানে অপেক্ষা করছিল, আলা হযরতের আগমন

সংবাদ পেয়ে পালিয়েছে। এখানে বেশ বড় একটা আমের বাগান ছিল। আলা হযরত এখানে শিবির স্থাপন করে চারদিকের এলাকা নিজের লোকদের মাঝে বণ্টন করে দিলেন।

জৌন থেকে থাট্টা ছ'দিনের পথ ছিল। হযরত জৌনপুরে ছ'মাস অবস্থান করেন। কিছু লোকজন অমরকোটে পাঠিয়ে হেরেম ললনা, আমীর-ওমরাহ ও অন্যান্যদের আনিয়ে নিলেন। এ সময় জালালুদ্দিন মোহাম্মদ আকবরের বয়েস ছিল মাত্র ছ'মাস।

জুল হেরাফের হেরেম ললনা ও অন্যান্য যারা জৌনপুরে রওনা হয়েছিল, তাদের সকলেই সলিল সমাধি প্রাপ্ত হন। এদিকে অমরকোটের রানা ও তরদী মোহাম্মদ খানের মধ্যে কোন এক ব্যাপারে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয় এবং উভয়ের রেষারেষি চরমে পৌঁছে। এজন্যে হঠাৎ এক রাতে রানা রাজকীয় শিবির থেকে নিজশাসিত এলাকার উদ্দেশ্যে পালিয়ে যান। সুদমা এবং সেমিন্‌চার সৈন্যদল ও তার পদাংক অনুসরণ করে।

শেখ আলী বেগ একজন বীর পুরুষ ছিলেন। হযরত বাদশাহ মুজাফ্‌ফর বেগ তুর্কমান-এর সাথে তাকে জাজকা পরগনাতে প্রেরণ করেন। মির্জা শাহ হোসাইন বিপুল সংখ্যক সৈন্য তাদের মোকাবিলার জন্য নিয়োজিত করেন। প্রচণ্ড যুদ্ধের পর মুজাফ্‌ফর বেগ পরাজিত হন এবং শেখ আলী বেগ ও অন্যান্য সহকর্মী শহীদ হন।

এর কিছুকাল পর শাহাম খানের ভ্রাতৃদ্বয় খালেদ বেগ এবং লুশ বেগ-এর মাঝে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। অধিকাংশ লোকরা লুশ বেগ-এর সহযোগিতা করে। ফলে খালেদ বেগ নিজের সৈন্য-সামন্ত নিয়ে পালিয়ে যান এবং মির্জা শাহ হোসাইন-এর সাথে মিলিত হন। হযরত বাদশাহ তার মাতা কোকা সুলতানকে বন্দি করেন। এজন্যে গুলবুর্গ বেশ ক্ষুণ্ন হন। শেষাবধি তাকে ক্ষমা করে দেন এবং গুলবুর্গ বেগমের সাথে মক্কা শরীফ গমন করার সুযোগ দান করেন।

কিছুদিন পর লুশ বেগও পালিয়ে গেল। হযরত বাদশাহ তাকে অভি-সম্পাত দেন। বললেন, আমি তার স্বার্থে খালেদ বেগ-এর সাথে কঠোরতা করেছি। তা সত্ত্বেও সে নিমকহালালী রেখে নিমকহারামীর খাতায় নাম

লেখাল, ভর যৌবনেই যেন সে মৃত্যুবরণ করে। অবশেষে তাই হলো। পনের দিন পর নৌকাতে শুয়ে থাকা অবস্থায় তার ভৃত্য তাকে হত্যা করে। হযরত বাদশাহ এই সংবাদ শুনে দুঃখিত হন এবং চিন্তান্বিত হয়ে পড়েন।

শাহ হোসাইন তার নৌবহর নদীপথ ধরে আলা হযরতের ছাউনির কাছে এনে ভিড়ালো, তাছাড়া স্থলপথেও রাজকীয় সৈন্যের মোকাবিলায় সৈন্য মোতায়েন করে। উভয় দলের মাঝে প্রায়ই সংঘর্ষ লেগে থাকতো। উভয় পক্ষের লোকও মারা যেতে লাগল। নিহতদের অন্যতম ছিলেন মোল্লা তাজুদ্দিন। ইনি বড় বিজ্ঞজন ছিলেন। তরদী মোহাম্মদ খান ও মোনেম খানের মাঝেও বিবাদ বেঁধে গেল। মোনেম খানও পালিয়ে গেল একদিন। এখন শুধু তরদী মোহাম্মদ খান, মির্জা ইয়াদগার, মির্জা ইয়াবেন্দা মোহাম্মদ, মোহাম্মদ অলি, নাদিম কোকা, রওশন কোকা, খোজাঙ্গে ইশ্‌ক্ আগাচি ও অন্যান্য কিছু লোক হযরত বাদশাহর কাছে রয়ে গেছে।

খবর পৌঁছলো যে, বৈরাম খান গুজরাট থেকে জাজকা অবধি পৌঁছে গেছেন। আ'লা হযরত একথা শুনে খুব খুশী হলেন এবং খোজাঙ্গে ইশক্ আগাচিকে হুকুম দিলেন যেন লোক-লস্কর নিয়ে বৈরাম খানকে অভ্যর্থনা জানান।

এ সময় শাহ হোসাইনও জানতে পারল যে, বৈরাম খান এসে গেছে। তাকে আটক করার জন্যে কিছু লোক মোতায়েন করা হলো। বিশ্রাম শিবিরে বৈরাম খান অচেতন অবস্থায় ঘুমিয়ে ছিলেন, এমন সময় শাহ হোসাইনের লোকরা তার উপর চড়াও করে। খোজাঙ্গে ইশক্ আগাচি যুদ্ধ করতে যেয়ে নিহত হন। বৈরাম খান কিছু লোক-লস্কর নিয়ে জান বাঁচিয়ে কোনমতে হযরত বাদশাহ-এর খেদমতে হাজির হতে সক্ষম হন।

এ সময় বাদশাহ হুমায়ুনের স্বপক্ষে কেরাচা খানের পক্ষ থেকে মির্জা হিন্দাল কিছু চিঠিপত্র পান। এতে লেখা ছিল, আপনি বেশ কিছুকাল যাবত দূরাঞ্চলের এলাকাগুলোতে কাটাচ্ছেন। অথচ এ সময় শাহ হোসাইনের পক্ষ থেকে বন্ধুত্বের হাত সম্প্রসারণের বদলে শত্রুতা প্রকাশ পেয়েছে। দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে এখানে সকল ব্যাপার অনুকূলে রয়েছে। এখন যদি বাদশাহ স্বয়ং আসেন তো উত্তম, অন্যথায় আপনি (হিন্দাল) অবিশ্যি চলে আসুন। বাদশাহ

যাত্রা স্থগিত রেখে মির্জা হিন্দালকে পাঠিয়ে দিলেন। মির্জা হিন্দাল সেখানে পৌঁছলে কেরাচা খান তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানান এবং কান্দাহার তার কাছে সোপর্দ করেন।

এ সময় মির্জা আসকারী গজনীতে ছিলেন। মির্জা কামরান তাকে লিখলেন যে, কেরাচা খান মির্জা হিন্দালকে কান্দাহার দিয়ে ফেলেছে। অতএব কান্দাহার সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করা উচিত। মির্জা কামরান পরিকল্পনা নিয়েছিলেন যে, কান্দাহার মির্জা হিন্দালের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে হবে।

হযরত বাদশাহ একথা শুনে ব্যাপারটি সুরাহা করার জন্য তাঁর ফুফী খানজাদা বেগমের কাছে এলেন এবং পীড়াপীড়ি করে বললেন, আমার প্রতি একটু দয়া প্রদর্শন করে কান্দাহার চলে যান এবং মির্জা কামরান ও হিন্দালকে উপদেশ দিন। এখন উজবুক এবং তুর্কমান তাদের কাছাকাছি রয়েছে। এমন বিপদের সময় (আমাদের) নিজেদের মধ্যে একতা থাকা প্রয়োজন। আমি মির্জা কামরানকে যা কিছু লিখেছি তা যদি সে কিছুটা পালন করে তাহলে সে যা চাইবে, আমি তাকে তাই দিতে চেষ্টা করব।

হযরত বেগম (খানজাদা) কান্দাহার গিয়েছেন ৪ দিন আগে। মির্জা কামরানও কান্দাহার পেঁছেছেন। প্রতিদিন পীড়াপীড়ি করতেন যেন কান্দাহারের খোৎবা তার নামে পড়া হয়। মির্জা হিন্দাল বললেন, 'শুধু খোৎবাতে নাম বদল করে কি লাভ হবে। মহাত্মা বাবুর বাদশাহ তার জীবদ্দশায় রাজ্য পরিচালনার ভার বাদশা হুমায়ুনকে অর্পণ করে গেছেন এবং নিজের যোগ্য উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান। আমরা সবাই তা সর্বান্তকরণে মেনে নিয়েছি। তখন থেকেই এতদঞ্চলে সম্রাট হুমায়ুন-এর নামে খোৎবা পাঠ করা হয়। অতএব খোৎবা রদবদল করা অসমীচীন।

মির্জা কামরান হযরত দিলদার বেগমকে লিখলেন যে, আমি কাবুল থেকে আপনাকে স্মরণ করে আসছি, আশ্চর্য যে এতদিন হল আপনি আমাকে দেখতে এলেন না। আপনি যেমন মির্জা হিন্দালের মা, তেমনি আমারও মা; মা, আপনি ছেলের কাছে চলে আসুন।

শেষাবধি দিলদার বেগম মির্জা কামরানকে দেখার জন্য তার কাছে চলে গেলেন। পৌঁছার পর মির্জা কামরান তাকে বললেন যতক্ষণ না আপনি মির্জা

হিন্দালকে ডেকে পাঠাবেন ততক্ষণ আপনাকে যেতে দেব না। দিলদার বেগম জবাবে বললেন, খানজাদা বেগম তোমার মুরুব্বীজন এবং আমাদের সবাইর মাননীয়া, খোৎবা পাঠের ব্যাপারটি তাকে জিজ্ঞেস কর। পরে মির্জা কামরান এ ব্যাপারে খানজাদা বেগমের সাথে আলাপ করেছিলেন। হযরত খানজাদা বেগম বললেন, 'যদি আমাকে জিজ্ঞেস কর তা হলে বলব ব্যাপারটি মহাত্মা সম্রাট বাবর নিজেই মীমাংসা করে গেছেন এবং বাদশাহ হুমায়ুনকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করে গেছেন। তোমরা সবাই তার নামে খোৎবা পাঠ কর। তোমাদের সবাইর বয়োজ্যেষ্ঠ মনে করে তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করো।

মোটকথা, মির্জা কামরান চার মাস অবধি কান্দাহার অবরোধ করে রাখেন এবং তার নামে খোৎবা পাঠ করতে চাপ সৃষ্টি করেন। শেষাবধি সিদ্ধান্ত হলো যদ্দিন হযরত বাদশাহ দূরে দূরে থাকবেন তখন মির্জার নামে খোৎবা পাঠ করা হবে। আর যখন তিনি এদিকে এসে যাবেন তখন যথারীতি তার নামেই খোৎবা পাঠ করা হবে। যেহেতু বহুদিন ধরে অবরোধ চলছিল, লোকদের দুর্দশা অসহনীয় হয়ে পড়েছিল তখন বাধ্য হয়ে মির্জার নামেই খোৎবা পাঠ করতে লাগল সবাই।

কান্দাহার মির্জা আসকারীকে ন্যস্ত করা হলো আর গজনী মির্জা হিন্দালকে দেবার সিদ্ধান্ত হলো।

যখন তিনি গজনীতে এলেন মুযাফাজাত এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকা প্রথম দিকে মির্জা হিন্দালকে দিলেন। কিন্তু পরে ফিরিয়ে নিয়ে ওয়াদা ভঙ্গ করলেন। এজন্যে মির্জা হিন্দাল মনক্ষুণ্ণ হয়ে বদখশানের দিকে চলে গেলেন। সেখানে খোস্ত ও ইন্দেরাব এলাকায় বসবাস করতে থাকেন।

মির্জা কামরান দিলদার বেগমকে বললেন, 'আপনি গিয়ে মির্জা হিন্দালকে ফিরিয়ে নিয়ে আসুন।' হযরত দিলদার বেগম গেলেন। মির্জা (হিন্দাল) বললেন, 'আমি রাজ্যলিপ্সা ও যুদ্ধবিগ্রহ ত্যাগ করেছি এবং খোস্ত-এ নিরিবিলি জীবন যাপন করছি।' তিনি বললেন, 'সত্যি তুমি যদি বৈরাগ্য-ব্রত গ্রহণ করতে চাও তাহলে কাবুলও খারাপ জায়গা নয়, তুমি সেখানে চলো। আমাদের সকলের কাছাকাছি থাকো।' মোট কথা, হযরত দিলদার বেগম তাকে এক রকম জোরপূর্বক ফিরিয়ে নিয়ে এলেন।

ওদিকে ভক্করে মির্জা শাহ হোসাইন হযরত বাদশাহকে পয়গাম পাঠালেন, 'আপনার জন্যে এটাই সমীচীন হবে যে, অচিরেই আপনি এ স্থান ত্যাগ করে কান্দাহার চলে যাবেন।'

হযরত বাদশাহ এতে রাজী হলেন এবং জবাবে বললেন, 'ঠিক আছে আমি চলে যাচ্ছি। তবে আমার সৈন্যদের মাঝে প্রয়োজনীয় বাহন (ঘোড়া) এবং উট নেই। আপনি যদি কিছু সংখ্যক উট এবং ঘোড়া দিয়ে সাহায্য করেন তাহলে সত্বর কান্দাহার রওনা হয়ে যাব।'

শাহ হোসাইন এ প্রস্তাব মেনে নিয়ে বললেন, 'আপনি নদীর ওপারে পৌঁছেই দেখবেন এক হাজার উট রয়েছে। আমি এসব উট আপনাকে প্রদান করলাম।'

[ভক্কর অঞ্চলের সমুদয় তথ্য খাজা গাজীর জবানীতে বিবৃত এবং তার বন্ধু খাজা কিচক-এর লেখা থেকে সংগৃহীত]

অতঃপর হযরত বাদশাহ পরিবার-পরিজন, লোক-লস্কর ও সৈন্য-সামন্ত নিয়ে তিন দিনের প্রচেষ্টায় নদী পার হতে সমর্থ হন এবং এভাবে মির্জা শাহ হোসাইনের এলাকা ত্যাগ করে নওয়াস নামক এক গাঁয়ে উপনীত হন। এখানে পৌঁছে হযরত বাদশাহ সুলতান কুলী নামক এক মাহুতকে প্রেরণ করেন এবং মির্জা হোসাইন প্রদত্ত এক হাজার উট নিয়ে আসেন।

হযরত বাদশাহ এসব উট আমির-ওমরাহ ও সিপাহী-সৈন্যদের মাঝে বন্টন করে দেন। এই উটগুলো এমন আনাড়ী ধরনের ছিল যে, মনে হলো এগুলো সাত পুরুষেও কোনদিন লোকালয় দেখেনি এবং মানুষের সংস্পর্শও লাভ করেনি। যেহেতু কাফেলাতে ঘোড়ার সংখ্যা কম ছিল, বেশীর ভাগ এজন্যে উটগুলোকেই সকলে বাহন হিসাবে নিলো এবং বাকী উটগুলোর উপর মাল-সামান চাপিয়ে দেয়া হলো। পথিমধ্যে হলো কি, উটগুলো তাদের পিঠে সওয়ারী নিতে অস্বীকৃতি জানালো এবং পিঠ থেকে সকলকে ফেলে দিয়ে জংগলের দিকে পালিয়ে গেল। ওদিকে যেগুলোর পিঠে শুধু মাল-সামান চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল, সেগুলোও কাফেলার ঘোড়াগুলোর হাকডাক শুনে হকচকিয়ে গেল এবং মালপত্র ফেলে দিয়ে পালিয়ে গেল। যেগুলোর পিঠে মালামাল কষে বেঁধে দেয়া হয়েছিল, সেগুলো মাল সমেতই ভাগল। বলতে গেলে, এভাবে প্রায় দু'শো উট পালিয়ে গেল।

কান্দাহারের পথে হযরত বাদশাহ সেবীতে পৌছে জানলেন যে, মির্জা শাহ হোসাইনের কর্মচারী মাহমুদ সারবান এখানে রয়েছেন। হযরতের আগমন সংবাদ পেয়েই দুর্গ সুদৃঢ় করে অবরুদ্ধ হন।

সেবীতে পৌঁছিতে তখনো দু' ক্রোশ পথ অবশিষ্ট ছিল, এরই মধ্যে খবর এলো যে মীর আল্লা দোস্ত এবং বাবা জুবক কাবুল থেকে দু'দিন পূর্বে সেবীতে এসেছিলেন এবং মীর্জা হোসাইনের কাছে চলে গেছেন। তারা মির্জা কামরানের পক্ষ থেকে মির্জা হোসাইনের জন্য সম্মানিত শিরোপা, আসপান তিপুচাক ও বহু ফলমূল নিয়ে এসেছেন। মির্জা কামরান তাদের পাঠিয়ে আবেদন করেছেন যে, মির্জা হোসাইন যেন তার মেয়েকে তার কাছে বিয়ে দেন।

হযরত বাদশাহ খাজা গাজীকে বললেন, 'আল্লাহ্ দোস্ত এবং তোমার মাঝে পিতাপুত্রের সম্পর্ক। তুমি তাকে চিঠি লিখে জিজ্ঞেস করো আমি কাবুলে পৌঁছলে কামরান আমাকে কিভাবে গ্রহণ করবে অথবা কি রকম ব্যবহার আমি তার কাছ থেকে আশা করতে পারি।' হযরত বাদশাহ কিচককে বললেন যে, সে যেন সেবীতে গিয়ে মীর আল্লাহ দোস্তকে বলে, ফেরার পথে যদি সে আমার সাথে দেখা করতো তাহলে ভাল হতো। খাজা কিচক সেবীতে রওনা হয়ে গেল। হযরত বাদশাহ বললেন, তুমি ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি রওনা হব না।

খাজা সেবীতে পৌছলে মাহমুদ সারবান তাকে গ্রেফতার করে ফেলেন এবং বলেন, কি মতলবে এসেছে। জবাবে বলল, উট এবং ঘোড়া কেনার জন্য এসেছি। মাহমুদ সারবান হুকুম দিলেন, তার বগল এবং টুপি তল্লাশী করা হোক। আল্লাহ দোস্ত এবং বাবা জুবক-এর নামে হয়ত কোন চিঠি নিয়ে এসেছে।

তল্লাশীর পর তার বগল থেকে চিঠি আবিষ্কৃত হলো। চিঠি সুকৌশলে নষ্ট করে ফেলারও সময় পেল না সে। মাহমুদ সারবান চিঠিখানি মনযোগ সহকারে পড়লেন, তাকে ফিরিয়ে দিলেন না। আল্লাহ্ দোস্ত ও বাবা জুবককে দু'র্গের বাইরে, ডেকে আনা হলো এবং নানা ভাবে শাসানো হলো। তারা কসম করে বলল, আমরা ঘুর্ণাক্ষরেও তার আসার সংবাদ জানতাম না। সে সম্ভবতঃ আমার কাছে লেখাপড়া শিখেছে আর খাজা গাজী আমার আত্মীয়, কামরান মির্জার কাছে থাকতো। এজন্যে আমার কাছে পত্র লিখেছে।

মাহমুদ সিদ্ধান্ত নিলেন, তাদের দুজনকে খাজা কিচকের সাথে শাহ হোসাই-নের কাছে পাঠাবেন। মীর আল্লাহ্ দোস্ত আর বাবা জুবক রাতভর মাহমুদ সাবরানের কাছে থাকলেন এবং অনেক তোষামোদ করে নিজেকে তার কোপানল থেকে মুক্ত করলেন। মীর আল্লাহ্ দোস্ত তিনশ' আনার এবং একশ' বহি (ফল-বিশেষ) হযরত বাদশাহকে উপঢৌকন হিসাবে প্রেরণ করেন। অনুনয় করে কোন কিছু এজন্য লিখলেন না, পাছে কারো হাতে না পড়ে যায়। অবশ্য মৌখিকভাবে বলে পাঠালেন যে, যদি মির্জা আসকরী বা আমীরওমরাহদের পক্ষ থেকে যদি কোন চিঠি আসে তাহলে কাবুল যাওয়া যাবে। অন্যথায় আলা হযরত এটা ভালভাবেই জানেন যে, সেখানে গিয়ে কোন লাভ নেই। কেননা, এসময় আলা হযরতের কাছে স্বল্পসংখ্যক লোক রয়েছে, অতএব যেয়ে লাভ নেই।

কিচক ফিরে এলেন এবং এসব কথা ব্যক্ত করলেন। হযরত বাদশাহ শুনে খুবই বিব্রত বোধ করেন এবং ভেবে পাচ্ছিলেন না কি করবেন, কোথা যাবেন। পরামর্শ চাওয়া হলে তরদী মোহাম্মদ খান আর বৈরাম খান বললেন শাল-মস্তান এবং উত্তরাঞ্চল (কান্দাহারের সীমান্ত) ছাড়া অন্য কোথাও যাওয়া ঠিক হবে না।

শেষাবধি এ-কথাতেই সিদ্ধান্ত হলো এবং যথারীতি ফাতেহা পাঠ করে কান্দা হারের উদ্দেশ্যে রওনা হন। যখন শালমস্তান-এর নিকটবর্তী রলী নামক পরগণায় পৌছলেন তখন প্রবল বর্ষণ এবং শিলাবৃষ্টি হচ্ছিল। আলা হযরত সিদ্ধান্ত নিলেন যেভাবে হোক শালমস্তান পৌছতে হবে। যোহর নামাজের সময় একজন উজবেক খচ্চরের পিঠে চড়ে দৌড়াতে দৌড়াতে এসে বলল: 'আলা হুজুর তাড়া-তাড়ি কেটে পড়ুন। কারণ আমি আপনাকে পরে বলব। এখন কোন কিছু বলার সময় নেই।' আলা হযরত একথা শুনেই সওয়ার হলেন এবং রওনা দিলেন। দুই তীর সমপরিমাণ রাস্তা অতিক্রম করার পর হযরত বাদশাহ খাজা মোয়াজ্জেম এবং বৈরাম খাঁকে ফিরে পাঠালেন হামিদা বানু বেগমকে নিয়ে আসার জন্যে। তারা এসে তাড়াহুড়া করে বেগমকে সওয়ারীতে বসালেন কিন্তু এতটুকু সময় হলোনা যে, প্রিয়তম পুত্র জালাল উদ্দিন মোহাম্মদ আকবরকে সাথে নেবেন। বেগম সবে ছাউনি থেকে বেরিয়ে রওনা দিয়েছেন, এরই মধ্যে মির্জা আসকারী দু'হাজার সৈন্য নিয়ে হাজির হলেন। চারিদিকে হৈ হৈ রৈ রৈ ব্যাপার। মির্জা আসকারী এসেই জিজ্ঞেস করলেন, বাদশাহ কোথায়? লোকেরা বলল, বেশ

সময় হয়েছে শিকারে বেরিয়েছেন। আসকারী ব্যাপারটা আঁচ করে নিয়েছেন যে, তার সংবাদ পেয়ে কেটে পড়েছেন তিনি। সুযোগ বুঝেই আসকারী জালাল উদ্দিন মোহাম্মদ আকবরকে বন্দী করে সুলতানম বেগমের কাছে সোপর্দ করলেন এবং সৈন্যদের হুকুম দিলেন কান্দাহার অভিমুখে রওনা হবার। সুলতানম বেগম জালাল উদ্দিন আকবরকে অনেক আদরসোহাগ করে নিজের কাছে রাখলেন।

ওদিকে বাদশাহ পাহাড়ী এলাকার দিকে সবে চারক্রোশ পথ অতিক্রম করেছিলেন। এ-খবর শুনে আরো দ্রুত পথ চলতে শুরু করেন। এ-সময় নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ তাঁর সহযাত্রী ছিলেন:

বৈরাম খান, খাজা মোয়াজ্জেম, খাজা নিয়াজী, নাদিম কোকা, রওশন কোকা, হাজি মোহাম্মদ খান, বাবা দোস্ত বখশী, মির্জা কুলি বেগ চুলি, হায়দার মোহাম্মদ আফ্তা বেগী, শেখ ইউসুফ চুলি, ইব্রাহিম ইশক আগা, হাসান আলী ইশক আগা, ইয়াকুব কুরচী, আম্বর নাজের, মালিক মুখতার, সম্বল মীর হাজার, খাজা কিচক ও খাজা গাজী প্রমুখ।

এক বর্ণনায় হামিদা বানু বেগম বলেন যে, তার সাথে এ সময় সর্বমোট ৩০ জনের ছোটখাট এক বাহিনী ছিল। তার সাথে হাসান আলীর স্ত্রীও ছিলেন। এরা সবাই 'এশা' নামাজের সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর উক্ত লক্ষ্যস্থল পাহাড়ের পাদদেশে উপনীত হন। পাহাড়ের উপর থেকে তখন রাশি রাশি বরফ গড়িয়ে পড়ছিল। এমন কোন রাস্তাও ছিল না যে,, পাহাড়ের উপরের দিকে ওঠা যায়। ওদিকে বিশ্বাসঘাতক মির্জা আসকারীর হামলার সম্ভাবনাও ছিলো ষোল আনা, এমনি বিপদ।

অবশেষে অনেক খোঁজাখুজির পর পাহাড়ের ওপারে কোন এক নিরাপদ অবস্থানে উঠে যাওয়ার জন্য একটা সংকীর্ণ পথ পাওয়া গেল। কিন্তু তারপরও সারা রাত বরফের মধ্যে কাটাতে হলো। এমন কোন ব্যবস্থা ছিল না যা দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে ঠাণ্ডার সাথে লড়াই করা যায়, ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য এমন কোন দ্রব্যও ছিল না কারো সাথে। ক্ষুধায় বহুলোক বেহুশ হয়ে পড়ল। হযরত বললেন, কিছুই যখন মিলছেনা, একটা ঘোড়া জবাই করে ফেল। কিন্তু রন্ধনের কোন উপকরণ ছিল না, ছিল না একটা হাড়িও। অবশেষে কোনমতে আগুনের

বন্দোবস্ত করে মাটিতে গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে মাংস পাকানো হলো কিছুটা। বাকী মাংশ কাবাব করে নেয়া হলো, আলা হযরত নিজ হাতে কাবাব তৈরী করে নিজে খেলেন। খেতে খেতে বললেন, ঠাণ্ডায় আমার মস্তিষ্ক জমে যাচ্ছে।'

অনেক প্রতীক্ষার পর সকাল হলো। আলা হযরত দূরের একটি পাহাড়ের দিকে অংগুলি নির্দেশ করে বললেন, 'ওখানে জনবসতি আছে। সেখানে বেলুচ গোত্রের লোকরা বসবাস করতো। চলো, সেখানে যাওয়া যাক।'

অতএব সে পাহাড়ে রওনা হলো সবাই। দু'দিন পথ চলার পর এই কাফেলা সেই পাহাড়ে পৌঁছলো। পাহাড়ে কয়েক ঘর উপজাতীয় বেলুচদের বসতি। তাদের ভাষা আজব ধরনের। হযরত বাদশাহ পাহাড় পরিবেষ্টিত একটা জায়-গায় এসে যাত্রা স্থগিত করেন। এ সময় তাঁর সাথে মাত্র ৩০ জন লোক ছিল। বেলুচরা তাদের দেখতে পেয়ে কৌতূহলী হয়ে চারদিকে এসে ঘিরে দাঁড়াল। হযরত ছাউনির ভেতরে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। বেলুচরা দূর থেকে তাঁকে লক্ষ্য করলো এবং মনে মনে দুরভিসন্ধি আঁটলো যে, আমরা যদি কৌশলে তাকে বন্দি করে মির্জা আসকারীর কাছে নিয়ে যেতে পারি তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের অনেক পুরস্কার এবং ধন-সম্পদ দেবে।

হাসান আলীর স্ত্রী ছিলেন বেলুচ বংশোদ্ভূত। তিনি জানালেন, লোকগুলো বদ মতলব আঁটছে। পরদিন সকালে বাদশাহ এ স্থান ত্যাগ করার মনস্থির করলেন। বেলুচরা বলল, এ সময় আমাদের সর্দার অনুপস্থিত। সর্দার ফিরে না আসা পর্যন্ত আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে। তাছাড়া কোথাও রওনা হবার পক্ষে এটা ভাল সময় নয়। বাধ্য হয়ে সেখানে রাত কাটাতে লাগলেন। রাতের প্রথম প্রহর গত হলো। দ্বিতীয় প্রহরে বেলুচদের সর্দার এলো এবং হযরতের খেদমতে হাজির হয়ে বলল, "মির্জা কামরান এবং মির্জা আসকারী আমাকে ফরমান পাঠিয়েছেন যে, 'জানা গেল, বাদশাহ তোমাদের এলাকায় অবস্থান করছেন। যদি সত্যি ওখানে থেকে থাকে, তাকে কোথাও যেতে দেবে না, বরং তাকে বন্দী করে আমাদের কাছে পৌঁছে দাও। মালামাল, ঘোড়া ও অন্যান্য সব তোমরা নিয়ে নাও'।"

প্রথম দিকে আমি যখন আপনাকে দেখি নাই তখন আমার এক ধরনের বিরূপ ধারণা ছিল। কিন্তু এখন আপনাকে দেখার পর সে ধারণা পাল্টে গেছে। এখন আমার এবং আমার পরিবারবর্গের প্রাণ আপনার জন্যে উৎসর্গীকৃত।

আপনার প্রাণ এবং সবরকম নিরাপত্তার জন্য আমি জিম্মাদার। আপনি এখন যেখানে ইচ্ছা চলে যেতে পারেন, আল্লাহ্ আপনাকে নিরাপদে রাখুন। মির্জা আসকারী আমাদের প্রতিশোধ নিতে চায় তো তা আমরা দেখে নেব'খন।' আলা হযরত এক খণ্ড ল'মাল, মুর্দারিদ ও অন্যান্য উপঢৌকন প্রদান করলেন উপজাতীয় সর্দারকে। পরদিন সকালে হাজি বাবা দুর্গের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করেন।

হযরত দু'দিনের পথ অতিক্রম করার পর এই দুর্গে পৌঁছেন। নদী তীর-বর্তী এই দুর্গটি 'গরমসের' পরগণায় অবস্থিত। এখানে সাদাত-এর এক বাহিনী অবস্থান করছিল। সবাই হযরতের খেদমতে হাজির হন এবং আতিথ্য গ্রহণ করেন।

সেদিন সকালেই আলাউদ্দিন মাহমুদ মির্জা আসকরীয় দলত্যাগ করে আলা হযরতের কাছে এসে হাজির হন এবং আনুগত্য প্রকাশ করেন। আলাউদ্দিন মাহমুদ এক সারি উট, ঘোড়া এবং শামিয়ানা ইত্যাদি নিয়ে এসেছিলেন। এ সমুদয় আলা হযরতের পদপ্রান্তে রাখলেন এবং আলা হযরত অনেকটা দুশ্চিন্তামুক্ত হলেন। পরদিন হাজি মোহাম্মদ খান কোকীও ত্রিশ-চল্লিশ জন অশ্বারোহী এবং এক সারি উট হযরতের খেদমতে পেশ করেন।

হযরত বাদশাহ যেহেতু ক্রমাগত আপন ভাইদের অসহযোগিতা ও আমীর ওমরাহদের বিশ্বাসভঙ্গের কার্যকলাপে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন, এজন্যে সকল শক্তির উৎস খোদাতা'লার উপর ভরসা করে সোজা খোরাসানের উদ্দেশ্যে রওনা হন। বহু পথ-ঘাট, চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে অবশেষে হযরত বাদশাহ খোরা-সানের উপকণ্ঠে যেয়ে উপনীত হন।

হযরত বাবে হিলমন্দে পৌঁছলে শাহ তাহমাস্ এ খবর শুনে চরম বিস্মিত ও বিব্রত হন যে, অদৃষ্টের লিখন ও বিশ্বাসঘাতকদের চক্রান্তে পড়ে হুমায়ুন বাদশাহ-এর মতো মানুষ আজ সব পেছনে ফেলে রেখে এখানে এসে উপনীত হয়েছেন।

তিনি তাঁর সকল লোক-লস্কর, আমীর-ওমরাহ, গণ্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ ও পরিবার পরিজনদেরকে হযরত বাদশার অভ্যর্থনার জন্য প্রেরণ করেন। তাঁরা হিলমন্দ নদী তীরে যেয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। বাদশাহর ভ্রাতা বাহরাম মির্জা, আলকাস মির্জা এবং শাম মির্জা এই দলের সর্বাগ্রে ছিলেন এবং প্রথমেই

হযরত বাদশাহর কুশলাদি জিজ্ঞেস করেন এবং সসম্মানে তাকে নিয়ে আসেন। শহরের কাছাকাছি পৌছলে বাদশাহর ভ্রাতাগণ অগ্রগামী হয়ে বাদশাহকে খবর দিলে বাদশাহ (তাহমাস) অশ্বারোহণ করে এগিয়ে যান এবং পরমাগ্রহে হুমায়ুন বাদশাহকে স্বাগত জানান। দুই বাদশাহ চরম উত্তেজনা নিয়ে পরস্পরকে আলিঙ্গন করেন। দু'জনের প্রাণের মিল এতই গভীর পরিদৃষ্ট হলো, মনে হলো দু'জনে হরিহর আত্মা। হযরত বাদশাহ যতদিন এখানে অবস্থান করেছিলেন রোজ তাহমাস বাদশাহ তাঁর সান্নিধ্যে আসতেন। যেদিন তাহমাস আসতে পারতেন না সেদিন হুমায়ুন স্বয়ং তার দরবারে চলে যেতেন।

খোরাসানে অবস্থানের সময় বাদশাহ হুমায়ুন সুলতান হোসাইন মির্জার তৈরী প্রাসাদরাজী, পুষ্পকানন এবং প্রমোদস্থলসমূহ পরিভ্রমণ করেন। ইরাকে অবস্থানের সময় বাদশাহ তাহমাস প্রায় আটবার মৃগয়ায় গিয়েছিলেন, প্রতি-বারই মহামান্য হুমায়ুন বাদশাহ হামিদা বানু সহ সাহচর্য দিয়েছিলেন। হামিদা বানু বেগম হাতীর পৃষ্ঠে হাওদাতে অলক্ষ্যে বসে শিকার খেলা অবলোকন করতেন। তাহমাস বাদশার সহোদরা শাহজাদী সুলতানম এ-সময় ঘোড়ার পিঠে চড়ে বাদশাহর পদাংক অনুসরণ করতেন (হযরত বাদশাহ নিজেই বলতেন, শিকারের সময় অশ্বারোহী এক মহিলা পেছনে পেছনে ছায়ার মতো থাকতেন। তার ঘোড়ার লাগাম ধরে রাখতেন সাদা দাড়িসম্পন্ন একজন সৈনিক। লোকরা আমার কাছে বলেছে এই মেয়েটি (শাহজাদী সুলতানম) বাদশাহের বোন)।

মোটকথা, খোরাসানের বাদশাহ হুমায়ুন বাদশাহর প্রতি যথেষ্ট সৌজন্য ও বন্ধুত্ব প্রকাশ করেন এবং শাহজাদী সুলতানম বেগম ও মাতৃস্নিগ্ধসুলভ সহানুভূতি ও সৌজন্য প্রকাশ করেন। একদিন শাহজাদী সুলতানম বেগম হামিদা বানু বেগমের সৌজন্যে ভোজ সভার আয়োজন করেন। বাদশাহ তাঁর বোনকে বললেন, তুমি যদি আতিথ্য প্রদর্শন করতে চাও, তা হলে শহর থেকে দু' ক্রোশ দূরে বন্দোবস্ত করো। সে মতে শহরের উপকণ্ঠে এক পরিচ্ছন্ন প্রান্তরে শিবির, তোরণ ইত্যাদি চিত্রমণ্ডিত আভরণে সাজিয়ে তোলা হলো।

খোরাসান এবং অন্যান্য এসব উৎসবমণ্ডপে শুধুমাত্র সামনের দিকে পর্দা খাটানো হতো, পিছনের দিকে রাখা হতো খোলা। কিন্তু বাদশাহ হিন্দু-স্থানী প্রথা অনুযায়ী এই উৎসবস্থলের চারদিকে পর্দা খাটিয়ে দেন। শিবির

তোরণ ও পর্দা খাটানোর পর বাদশাহর লোকজনেরা নানা ধরনের রঙীন ঝালর লাগিয়ে দেন। বাদশাহর আত্মীয় মহিলা, ফুফীগণ, ভগ্নিগণ, বেগমগণ, হেরেম ললনাগণ এবং আমীরওমরাহদের হেরেম ললনাগণসহ প্রায় এক হাজার সুসজ্জিত মহিলা এই আনন্দমেলায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

উৎসবে কথায় কথায় শাহাজাদী সুলতানম হামিদা বানু বেগমকে বললেন, হিন্দুস্থানে কি এ-ধরনের চিত্র-কলামণ্ডিত শিবির ও তোরণ তৈরী সম্ভব? হামিদা বানু বললেন, 'প্রবাদে খোরাসানকে দ্বিপদ ও হিন্দুস্থানকে চতুষ্পদ বলা হয়ে থাকে। অতএব দ্বিপদে যাহা মেলে চতুষ্পদে তার দ্বিগুণ মিলবে এতো সোজা কথা।' বাদশাহর মেয়ে শাহ সুলতানম ফুফীর প্রশ্নের জবাবে হামিদা বানুর কথাকে সমর্থন করে বললেন, 'ফুফীজান আপনিও দেখছি আজব ধরনের প্রশ্ন করতে পারেন। কোথায় দ্বিপদ আর কোথায় চতুষ্পদ।'

সারাদিন এই আনন্দমেলা জমেছিল। খাবার সময় আমীরওমরাহদের স্ত্রীগণ দাঁড়িয়ে খাবার খেলেন। আর বাদশাহর বেগমগণ শাহজাদী সুলতানম-এর সামনে বিশেষ পদ্ধতিতে খাদ্য গ্রহণ করেন।

শাহজাদী সুলতানম জর্দৌসী কারুকার্য খচিত বিভিন্ন ধরনের পোশাক পরিচ্ছদে হামিদা বানু বেগমকে উপঢৌকন হিসাবে পেশ করেন।

সেদিন খোরাসানের বাদশাহ এশা নামাজের সময় হুমায়ুন বাদশাহর আস্তানায় চলে আসেন। যখন শুনতে পেলেন হামিদা বানু বেগম উৎসব থেকে ফিরে এসেছেন তখন তিনি [illegible] ফিরে আসেন।

এ-সময় রওশন কোকা এক [illegible] নিজের পূর্বেকার সকল সুকর্মের রেকর্ড থাকা সত্ত্বেও) এক [illegible] করে বসল। বাদশাহ হুমায়ুনের তাবিজের মধ্যে লুকানো পাঁচটি মূল্যবান লাল পাথর সে চুরি করে বসে। এই মূল্যবান পাথর সম্পর্কে শুধু হুমায়ুন বাদশাহ এবং হামিদা বানু বেগম জানতেন। বাদশাহ যদি কোন সময় এই তাবিজ রেখে কোথাও যেতেন তা হামিদা বানুর কাছে ন্যস্ত করে যেতেন। একদিন হামিদা বানু বেগম অবগাহন করার জন্যে গোসলখানায় (হামাম) যাবার সময় সে তাবিজটি একটা পুটলী বেঁধে বাদশাহর পালংকের উপর রেখে যান। এই সুযোগে রওশন কোকা এসে তাবিজ থেকে ৫টি লাল পাথর তুলে নেয় এবং খাজা গাজীর সাথে যোগসাজশ করে তার কাছে রেখে দেয়। উদ্দেশ্য, পরে তার কাছ থেকে নিয়ে খরচ করবে।

হামিদা বানু বেগম গোসলখানা থেকে ফিরে এলে বাদশাহ নিজে তাবিজটি তুলে তার হাতে দেন। হামিদা বানু বেগম তাবিজটি হাতে নিয়েই বললেন, 'তাবিজটা এত হালকা মনে হচ্ছে কেন'? হযরত বাদশাহ বললেন, 'তা কেন হবে? এ তাবিজের ভেতরের পাথরের খবর তুমি আর আমি ছাড়া আর তো কেউ জানেনা।' হামিদা বেগম ঘটনাটি নিজের ভাই খাজা মোয়াজ্জেমের কাছে ব্যক্ত করে বললেন, 'যদি ভাই হয়ে থাক, বোনের এই বিপদের দিনে সাহায্য করো। ঘুর্ণাক্ষরেও যেন কেউ কিছু জানতে না পারে। গোপনে গোপনে ব্যাপারটি তদন্ত করো। যদি এই পাথর উদ্ধার করা সম্ভব না হয়, তাহলে সারা জীবনের তরে বাদশার কাছে লজ্জিত থাকতে হবে।'

খাজা মোয়াজ্জেম বোনকে বললেন, 'একটা ব্যাপার আমার মাথায় এসেছে। আমি হযরত বাদশাহ এবং তোমাদের এত নিকটবর্তী, অথচ কোন দিন একটা টাট্টু কেনার ক্ষমতাও আমার হয়নি, অথচ খাজা গাজী এবং রওশন কোকা কেমন করে এক উন্নত ধরনের 'তিপুচাক' গোত্রীয় ঘোড়া ক্রয় করেছে। অবশ্য এই ঘোড়ার দাম এখনও পরিশোধ করা হয়নি। তবে কোন রকম আথিক ভরসা ছাড়া এ ঘোড়া কিনতে যাবে কেন?'

বেগম বললেন, 'ভাইয়া বোনের ইজ্জত রাখার এই একমাত্র সময়। তাদের এই কার্যকলাপের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখো।'

খাজা মোয়াজ্জেম বলল, 'চাঁদমুখো বড় বোন আমার। কারো কানে যেন এ ব্যাপারটি না যায়। খোদা করুন, যাদের হক মাল তাদের হাতেই পৌঁছে যাবে।'

একথা বলে সে বেরিয়ে পড়ল এবং ঘোড়াবিক্রেতার বাড়ীতে যেয়ে দ্বারে করাঘাত করল। ঘোড়া বিক্রেতাকে জিজ্ঞেস করা হলো সে কিসের বিনিময়ে খাজা গাজী ও রওশন কোকার কাছে ঘোড়া বিক্রি করেছে। সে জানাল যে, তারা মহামূল্য লাল পাথর (মুক্তা) দেবার কথা বলে ঘোড়া নিয়ে গেছে।

তারপর সেখান থেকে খাজা গাজীর ঘরে এলো। চাকরকে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞেস করল যে, খাজা মূল্যবান দ্রবাদি, উপঢৌকন, থলে, পোশাকআশাক ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় মালামাল কোথায় রাখে?

চাকর জানাল যে, তার মনিবের মূল্যবান দ্রব্যাদি বলতে কিছু নেই এবং এগুলো রাখার তেমন কোন বন্দোবস্তও ছিল না। তবে একটা লম্বা টুপি রয়েছে

তার, যা সর্বক্ষণ তার মাথায় থাকে। এই টুপিটি সে সতর্কতার সাথে রাখে এবং কেবলমাত্র শোয়ার সময় খুলে শিয়রে বা হাতের কাছে রাখে।

খাজা মোয়াজ্জেম এসব শুনে সব বুঝে নিলো এবং দৃঢ় বিশ্বাস জন্মালো যে, অপহৃত লাল পাথর খাজা গাজীর কাছেই রয়েছে এবং তা তার টুপির মধ্যে লুকানো থাকে।

সে ফিরে এসে আলা হযরতের সঙ্গে দেখা করে বলল, 'আমি সেই হারানো লাল পাথরের সন্ধান পেয়েছি। গাজীর উঁচু টুপির মধ্যে এই পাথর আমি দেখে ফেলেছি। যেভাবেই হোক আমি এই পাথর উদ্ধার করে এনে দেব। সে যদি আপনার কাছে কোন অভিযোগ নিয়ে আসে তাহলে আপনি আমাকে বকবেন না যেন।'

আলা হযরত একথা শুনে চুপসে গেলেন, অবশ্য পরে একটু মুচকি হাসলেন। এরপর খাজা মোয়াজ্জেম খাজা গাজীর কাছে এসে নানা টিটকারী ও ফাজলামী করতে লাগল। খাজা গাজী ক্ষুব্ধ হয়ে হযরত বাদশার কাছে এসে অভিযোগ করে বললেন, 'আমি নেহাত গোবেচারী মানুষ, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার কিছু নামকাম আছে। কিন্তু অল্প বয়েসী এই ছোকড়া আমার সাথে মস্করা করে। বিদেশে এসে এ-ধরনের মস্করা করার কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে?'

আলা হযরত বললেন, 'সে তো সকলের সাথেই ঠাট্টা মস্করা করে বেড়ায়। এখনো ছেলে বয়স—ছেলে-বয়েসে এ-ধরনের চরিত্র হয়েই থাকে। আপনি ওর কথায় কান দেবেন না। হাজার হলেও ছেলে মানুষ তো!'

দ্বিতীয় দিন খাজা গাজী যখন দিওয়ান খানায় বসেছিল, খাজা মোয়াজ্জেম এসে আবার ফাজলামো শুরু করে কৌশলে তার টুপিটা মাটিতে ফেলে দিল এবং এই সুযোগে হুমড়ি খেয়ে পড়ে টুপির ভেতর থেকে পাথরগুলো কুড়িয়ে নিল। তারপর হযরত বাদশাহ এবং হামিদা বানুর সামনে এনে পেশ করল। বাদশাহ মুচকি হাসলেন এবং যারপরনাই খুশী হয়ে মোয়াজ্জেমকে ধন্যবাদ জানালেন।

খাজা গাজী এবং রওশন কোকা এই ঘটনায় বেশ লজ্জিত হলো এবং লজ্জা ঢাকবার জন্যে উল্টা খোরাসানের বাদশাহর কাছে হুমায়ুন বাদশাহ ও তদীয় পত্নী সম্পর্কে কতগুলো বদনাম করল। ফলে, খোরাসানের বাদশাহ হুমায়ুন বাদশাহর প্রতি কিছুটা বিরূপ মনোভাবাপন্ন হলেন।

হুমায়ুন বাদশাহ ও খোরাসান বাদশাহর মধ্যেকার উঠাবসা ও মেলামেশা পূর্বের মতোই চলছিল, কিন্তু আগের মতো প্রাণচাঞ্চল্য ও আন্তরিকতা ছিল না। তা দেখে বাদশাহ হুমায়ুন তার সঞ্চিত সমুদয় মূল্যবান পাথরসমূহ খোরাসান বাদশাহকে উপঢৌকন দেন। বাদশাহ খোরাসান এই অমূল্য রত্ন পেয়ে খুশী হয়ে বললেন, 'রওশন কোকা ও খাজা গাজী আস্ত বাজে লোক। এরা আপনার সম্পর্কে নানাকথা বলে আমার মন খারাপ করতে চেয়েছে। প্রকৃতপক্ষে আমি আপনাকে আপন ভাই বলে মনে করি।'

এরপর দুই বাদশাহর মধ্যে আবার নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠল। আবার দু'জন দুই জান এক প্রাণের বন্ধনে পরিণত হলেন।

বাদশাহ হুমায়ুন এই দুই দুষ্কৃতিকারীকে নিজের দল থেকে বহিষ্কার করে খোরাসান বাদশাহর হাতে সোপর্দ করেন। খোরাসানের বাদশাহ তাদের জেলখানায় বন্দী করেন।

এভাবে ইরাকে আলা হযরতের দিনগুলো বেশ ভাল ভাবেই কাটছিল। খোরাসান বাদশাহ প্রতি কাজে, ব্যবহারে তার প্রতি অপরিসীম সম্মান ও আন্তরিকতা প্রদর্শন করতেন এবং প্রায়শঃ বহু মূল্যবান দ্রব্যাদি উপঢৌকন হিসাবে প্রদান করতেন। শেষাবধি খোরাসান বাদশাহ তার পুত্র খানান, সালাতীন ও অন্যান্য সভাসদদের নেতৃত্বে এক বিরাট সৈন্য বাহিনীসহ হযরত বাদশাহকে বিদায় সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। শামীয়ানা, রাজকীয় পরিচ্ছদ, নানা চিত্রকলামণ্ডিত কাপড়-চোপড়, তোষকখানা, খাজিনা খানা, বাবুর্চীখানা ও এ ধরনের সমুদয় রাজকীয় আসবাবপত্র দিয়ে তাঁকে বিদায় জানান এবং এভাবে এক শুভ মূহূর্তে দুই বাদশাহের পারস্পারিক বিদায় সূচিত হয়।

সেখান থেকে আলা হযরত কান্দাহার অভিমুখে রওনা হন। যাত্রার সময় হযরত বাদশাহ উক্ত দুই দুষ্কৃতিকারীকে ক্ষমা করে নিয়ে নিজের দলভুক্ত করেন।

মির্জা আসকরী যখন শুনলেন যে, হুমায়ুন বাদশাহ খোরাসান থেকে ফিরে কান্দাহার অভিমুখে আসছেন, তখন জালালুদ্দিন মোহাম্মদ আকবরকে মির্জা কামরানের কাছে কাবুলে পাঠিয়ে দিলেন। মির্জা কামরান আকবরকে আকা জানম এবং ফুফীজান খানজাদা বেগমের কাছে সোপর্দ করেন। এ সময় জালালুদ্দিন মোহাম্মদ আকবরের বয়স হয়েছিল মাত্র আড়াই বছর। ফুফীজান তার

হাত পা চুম্বন করে আদর করে বলতেন, আকবরের হাত পায়ের আঙ্গুল হুবহু আমার ভাই বাদশাহ বাবুরের মতো। তার চেহারা ও গায়ের রংও বাবুরের মতো ছিল।

আলা হযরত কান্দাহার পৌঁছলে মির্জা কামরান খানজাদা বেগমকে অনেক অনুনয় বিনয় করে বললেন যে, তিনি যেন কান্দাহার গিয়ে হুমায়ুম বাদশাহ এবং তার মধ্যে আপোষ-মীমাংসা করিয়ে দেন।

খানজাদা বেগম আকবর শাহজাদাকে মির্জা কামরানের হাতে সোপর্দ করেন। মির্জা কামরান শিশু আকবরকে স্ত্রী খানমের কাছে রাখেন আর ওদিকে খানজাদা বেগম বিলম্ব না করে কান্দাহার রওনা হয়ে যান।

হযরত বাদশাহ কান্দাহার পৌঁছে একাদিক্রমে চল্লিশ দিন কান্দাহার অবরোধ করে রাখেন। বৈরাম খানকে দূত হিসাবে মির্জা কামরানের কাছে প্রেরণ করেন। মির্জা আসকরী অবরুদ্ধ অবস্থায় থেকে বিনয়াবনত হয়ে অবশেষে ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য কান্দাহারের বাইরে চলে আসেন এবং হযরত বাদশাহর খেদমতে হাজির হন।

হযরত বাদশাহ কান্দাহার জয় করে খোরাসানের বাদশার ছেলেকে শাসনভার অর্পণ করেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই খোরাসানের শাহজাদা রোগাক্রান্ত হন এবং মৃত্যুবরণ করেন। বৈরাম খান ফিরে আসার পর অতঃপর তাকে কান্দাহারের শাসনভার দেয়া হয়। আলা হযরত হামিদা বানু বেগমকে এখানে রেখেই মির্জা কামরানের কুশলাদি জানার জন্য বেরিয়ে পড়েন।

এ সময় আকা জানম ও খানজাদা বেগম হুমায়ুন বাদশাহর সহযাত্রী ছিলেন। সবাই কাবল্‌হক নামক স্থানে পৌঁছার পর খানজাদা বেগম হঠাৎ জ্বরাক্রান্ত হন। তিন দিন ধরে জ্বর চলতে থাকে। প্রাণপণে চিকিৎসা করা সত্ত্বেও রোগের কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হলো না। অবশেষে ৯৫১ হিজরীতে জ্বরের চতুর্থ দিনে পরলোকগমন করেন। কাবল্‌হক নামক জায়গাতেই তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। তিন মাস পর আবার তার শবদেহ সেখান থেকে তুলে এনে কাবুলে আমার পিতা মহাত্মা বাবুরের পাশে দাফন করা হয়।

মির্জা কামরান যত বছর কাবুলে ছিলেন কোন দিনই আর রাজ্য জয়ের বাসনা করেন নি। কিন্তু হুমায়ুন বাদশাহর আগমন সংবাদ শুনে আবার তার রাজ্য

জয়ের সুপ্ত ইচ্ছা মাথা চাড়া দিয়ে উঠে এবং হাজারার দিকে অভিযান পরিচালনা করেন।

এসময় মির্জা হিন্দাল নিষ্ক্রিয় ও নিরিবিলি দিন যাপন করছিলেন। হযরত বাদশাহ ইরাক, খোরাসান ও কান্দাহার ইত্যাদি আয়ত্তাধীনে এনেছেন, সময়টাকে হিন্দাল মাহেন্দ্রক্ষণ মনে করলেন। ত্বরা মির্জা ইয়াদগার নাসেরকে তলব করে বললেন, বাদশাহ কান্দাহার এসেছেন এবং তা জয় করেছেন, মির্জা কামরান খানজাদা বেগমকে সন্ধি স্থাপনের জন্যে পাঠিয়েছেন, বাদশাহ সন্ধির আবেদন অগ্রাহ্য করেছেন এবং প্রতিউত্তরে বৈরাম খানকে দূত পাঠিয়েছেন। মির্জা কামরানও বৈরাম খানের প্রস্তাবে অসম্মতি জানিয়েছেন। বাদশাহ কান্দাহার বৈরাম খানের কাছে সোপর্দ করে কাবুলের দিকে এগিয়ে আসছেন।

এসময় তোমার আমার কর্তব্য হচ্ছে যে-কোন ছলনায় এখান থেকে বেরিয়ে বাদশাহর সাথে যেয়ে মিলিত হওয়া। মির্জা ইয়াদগার নাসের এই প্রস্তাবে সম্মত হয়ে মির্জা হিন্দালের সাথে আপোষে এক চুক্তি স্থাপন করেন। হিন্দাল মির্জা নাসেরকে বললেন, তুমি তাড়াতাড়ি এখান থেকে পালিয়ে যাও। মির্জা কামরান যখন ঘোষণা করবে যে, মির্জা ইয়াদগার নাসের পালিয়েছে, তখন অবশ্যই আমাকে' বলবে, তুমি মির্জা নাসেরের পিছু নাও এবং যেভাবে পার বুঝিয়ে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে এসো।

তুমি এখান থেকে বেরিয়ে আস্তে আস্তে হাঁটবে, ইতিমধ্যে আমি তোমার সাথে এসে মিলিত হব এবং তাড়াতাড়ি পথ অতিক্রম করে বাদশার কাছে যেয়ে পৌঁছব।

এই সিদ্ধান্তের পর মির্জা ইয়াদগার নাসের কাবুল থেকে পালিয়ে গেল। মির্জা কামরান বাইরে ছিলেন, এ-সংবাদ শুনেই কাবুলে ফিরে এলেন এবং মির্জা হিন্দালকে তলব করলেন এবং বললেন, সত্বর চলে যাও, যেভাবে পার মির্জা নাসেরকে বুঝিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে এসো। মির্জা হিন্দাল মুহূর্তে অশ্বারোহণ করেন। অত্যন্ত দ্রুততার সাথে মির্জা ইয়াদগার নাসেরের সাথে যেয়ে মিলিত হন এবং পূর্ব পরিকল্পনানুযায়ী অন্যপথে হযরত বাদশাহর খেদমতে যেয়ে হাজির হন। হযরত বাদশাহ তাদেরকে পেয়ে নির্দেশ দিলেন, তোমরা 'তাকিয়া হেমার' এর-রাস্তা ধরে এগিয়ে যাও।

৯৫১ হিজরীর রমজান মাসে আলা হযরত তাকিয়া হেমার নামক জায়গায় পৌঁছলেন। মির্জা কামরান এ খবর শুনে বিব্রত হয়ে পড়লেন। বিলম্ব না করে শিবির তুলে অবস্থান ত্যাগ করে আলা হযরতের পথ রোধ করে দাঁড়ালেন। হযরত বাদশাহ এগারই রমজান তারিখে জলগাতেপাতে অবতরণ করেন. মির্জা কামরান সেখানে সামনাসামনি হলেন। উদ্দেশ্য, যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া।

উভয়পক্ষের সৈন্য বাহিনী সামনাসামনি দাঁড়িয়ে। এরই মধ্যে মির্জা কামরা-নের সভাসদ, সৈন্যদল মির্জা কামরানের সঙ্গ ত্যাগ করে আলা হযরতের কাছে এসে হাজির হন এবং পরমদর্শন লাভ করেন। তা ছাড়া বাপুচ নামক মির্জা কামরানের একজন বিশেষ অনুচরও দল ত্যাগ করে সরাসরি আলা হযরতের কাছে আনুগত্য প্রকাশ করেন। এবারে মির্জা কামরান নিঃসঙ্গ একাকী। অবস্থা বেগতিক দেখে বাপুচ-এর বাড়ীর (নিকটেই অবস্থিত ছিল) দরজা জানালা ভেঙ্গে খিড়কির পথে নওরোজী ও গুরখানা গুলবর্গ অবধি যেয়ে পৌঁছেন। ইতিমধ্যে তিনি তাঁর বার হাজার সৈন্যকে বিদায় দেন এবং দিনের শেষে যখন অন্ধকার হয়ে এলো বাবা দস্তির পথে এক ছোট নালার কাছে পৌঁছেন। সেখান থেকে তিনি তুস্তি কোকা ও জুকি কোকাকে ফেরত পাঠিয়ে তাঁর বড় মেয়ে হাবিবা, ছেলে ইব্রাহিম সুলতান মির্জা, হাজারা বেগম (খিজির খান হাজারা ভাইর মেয়ে) মাহ্‌, বেগম (খুররমের বোন), হাজি বেগমের মাতা মাহ্ আফরোজ আর বাকী কোকাকে সাথে নিয়ে আসতে বললেন। এরপর মির্জা কামরানের এই দল থাট্টা এবং ভক্করের পথে রওনা হলো।

ভক্করের পথে খিজির খানের জায়গীর এলাকা অবস্থিত। এখানে এসে কিছুদিন অবস্থান করে আক্‌সুলতানের সাথে হাবিবা বেগমের বিবাহ সম্পন্ন করেন এবং মেয়ে জামাতাকে বিদায় জানিয়ে পুনরায় থাট্টা ও ভক্করের পথে রওনা হন।

বারই রমজান এই ঐতিহাসিক বিজয় সূচিত হয়। রাত পাঁচটার সেদিন আলা হ্যরত সদলবলে প্রাসাদ অভ্যন্তরে পদার্পণ করেন। মির্জা কামরানের যে-সব সৈন্য আলা হ্যরতের সৈন্যদলে ভর্তি হয়েছিল তারা ধুমধামের সাথে ঢাক ঢোল বাজিয়ে কাবুল নগরে প্রবেশ করে। এমাসের বার তারিখেই পরম পূজনীয়া

মাতা দিলদার বেগম, গুল চেহরা বেগম এবং এই অধম আলা হযরতের খেদমতে হাজির হই এবং যথারীতি অভিবাদন জ্ঞাপন করি।

প্রায় পাঁচ বছর গত হয়েছিল আমি আলা হযরতের পুণ্য সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত ছিলাম। এখন সেই দুরন্ত এবং আপনজন হারাবার গ্লানির থেকে মুক্ত হয়ে তার পুণ্য স্নেহ-ছায়াতলে স্থান লাভের সৌভাগ্য অর্জন করে যারপরনাই প্রীত হয়েছি। এক নজর বাদশাহ্‌কে দেখেই যেন আমার দৃষ্টির উজ্জ্বল্য ফিরে পেয়েছি। দর্শন সুখে আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে করুণাময় আল্লাহ্‌র দরবারে সেজদা করে শোকরিয়া জানালাম।

প্রায়ই তখন আসর জমজমাট হয়ে উঠতো। এক বসাতেই আমরা রাত কাটিয়ে দিতাম। যন্ত্র সঙ্গীত ও সঙ্গীত শিল্পীদের অপূর্ব সুরনিনাদে বিভোর হয়ে থাকতাম আমরা। প্রায়শঃ চিত্তবিনোদনের নিমিত্ত বিভিন্ন খেলাধুলার আয়োজন হতো। তন্মধ্যে একটি খেলা প্রায়শঃ খেলতাম আমরা। এখেলায় বার জন অংশ গ্রহণ করতো। প্রত্যেকের কাছে বিশটি পাতা এবং ৫ মেসকাল ওজনের বিশটি 'শাহরখী (বিশেষ মূল্যবান পাথর) থাকতো। খেলায় যে পরাজিত হতো প্রতিপক্ষকে ২০টি শাহরখী দিয়ে দিতে হতো।

চুসা এবং কনৌজের যুদ্ধে যে সব মহিলা বিধবা হয়েছেন, যেসব ছেলে এতিম হয়েছে অথবা যাদের স্বজন যুদ্ধে নিহত হয়েছেন আলা হযরত তাদের সকলের জন্য পেনশন, প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য, চাষাবাদের জন্য জমি এবং চাকর-নফর প্রদান করেন।

আলা হযরতের শাসনামলে প্রজাকুল অপরিসীম শান্তিতে বসবাস করতো। দেশময় প্রজাদের ধনসম্পদের প্রাচুর্য্য ছিল। হযরতের দীর্ঘ জীবন ও স্থিতিশীল শাসন তাদের জীবনের আশীর্বাদস্বরূপ ছিল।

কিছুদিন পর আলা হযরত হামিদা বানু বেগমকে কান্দাহার থেকে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন। হামিদা বানু ফিরে এসে শাহজাদা জালালুদ্দিন মোহাম্মদ আকবর এর 'খৎনা' সম্পন্ন করায় নিমিত্ত এক অনুপম উৎসবের আয়োজন করা হয়।

নওরোজের পর একাদিক্রমে সতের দিন উৎসব পালন করা হয়। লোকরা সকলে সবুজ পোশাক পরিধান করেন। ত্রিশ চল্লিশ জন মেয়েকে নির্দেশ দেয়া হলো তারা যেন আপাদমস্তক সবুজ পোশাকে আবৃত হয়ে পাহাড়ের উপর চলে

চলে আসে। নওরোজের প্রথম দিন বাদশাহ্ স্বয়ং ও অন্যান্যরা পাহাড়ের উৎসব মণ্ডপে চলে আসেন এবং বেশ আনন্দ উৎসবে দিন যাপন করেন।

জালালুদ্দিন মোহাম্মদ আকবরের বয়েস এ সময় পাঁচ বছর হয়েছিল। কাবুলের রাজকীয় দিওয়ানখানা কেলাঁতে এই খৎনা সম্পন্ন করা হয়। এ উপলক্ষে কাবুলের সকল বাজার সুসজ্জিত করা হয়। মির্জা হিন্দাল, ইয়াদগার নাসের ও অন্যান্য আমীর ওমারাহগণ নিজেদের বাসভবনও এ উপলক্ষে সজ্জিত করেন। ওদিকে বেগা বেগমের বাগানে অন্যান্য হেরেম ললনা ও মহিলাগণ নানা আনন্দ উৎসবের আয়োজন করেন।

সকল সুলতান ও আমীর ওমারাহগণ দিওয়ানখানাতে যথারীতি উপঢৌকনাদি নিয়ে আসেন। সকলের জন্যে সুস্বাদু খাবার তৈরী করা হয়েছিল। বিশেষ ব্যাক্তিবর্গদের সুশোভিত পোশাক, খেলাত ও পদক প্রদান করা হয়।

জনসাধারণের মধ্য থেকে এই উৎসবে আলেম, দরবেশ, সম্ভ্রান্ত স্থানীয় ও অন্যান্যরা অংশ গ্রহণ করে এবং দিনের সুখ এবং রাতের প্রশান্তি নিয়ে ফিরে চলে যায়।

এরপর আলা হযরত জাফর দুর্গ অভিমুখে যাত্রা করেন। এই দুর্গে মির্জা সোলায়মান থাকতো। যুদ্ধ করার জন্যে সোলায়মান সদলবলে দুর্গ থেকে বেরিয়ে এলেন। উভয় পক্ষ সামনাসামনি দাঁড়িয়ে। কিন্তু মির্জা সোলায়মান রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে গেলেন। হযরত বাদশাহ সগর্বে দুর্গে পদার্পণ করেন এবং 'কস্‌ম' ভবনে বসবাস শুরু করেন।

এ সময় বাদশাহ হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং একদিন একরাত অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকেন। পরদিন সকালে জ্ঞান ফিরে আসার পর তিনি মোনেম খানের ভাই ফাজেল বেগকে কাবুলে প্রেরণ করেন এবং বললেন, তাদেরকে যেয়ে সান্ত্বনা দিয়ে বলো, তারা যেন অস্থির না হয়, আরো বলো, বাদশাহ অসুস্থ ছিলেন কিন্তু এখন সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন। যদিও ব্যাপারটি বেশ আশংকাজনক ছিল, কিন্তু খোদার শোকর, এখন বিপদমুক্ত এবং দিব্যি সুস্থ।

ফাজিল বেগের রওনা হয়ে যাওয়ার এক দিন পর হযরত বাদশাহ কাবুলের দিকে চলে এলেন। কাবুল থেকে যেসব বানোয়াট খবরাদি ভক্করে মির্জা কামরানের কানে পৌছেছিল, তা শুনে কামরান মির্জা সত্বর ভক্কর ত্যাগ করে

কাবুলের দিকে রওনা দেন এবং গজনীতে পৌঁছে ওখানকার শাসনকর্তা জাহেদ বেগকে হত্যা করেন।

সময়টা ছিল সকাল বেলা। কাবুল নগরীর লোকেরা তখন ঘুমে বিভোর। নগরদ্বার এবং নগরবাসীদের দরজা ছিল উন্মুক্ত। শুধু ঝাড়ুদার এবং ভিস্তিদের আনাগোনা ছিল পথে। মির্জা কামরান এই সুযোগে সাধারণদের বেশে দুর্গে ঢুকে পড়েন। দুর্গে ঢুকতেই মোহাম্মদ আলী তায়ালাকে (হামামখানায় ছিল) তিনি হত্যা করেন এবং মোল্লা আবদুল খালেক মাদ্রাসায় ঢুকে পড়েন।

হযরত বাদশাহ যখন জাফর দুর্গের উদ্দেশ্যে রওনা হন 'নওকার'কে হেরেমের দ্বাররক্ষী মনোনীত করেন। মির্জা কামরান কোন একজনকে জিজ্ঞেস করলেন, 'দ্বাররক্ষী কে?' জবাব পেলেন, নওকার। নওকার এই শব্দ শুনেই মেয়েদের পোশাক পরিধান করে মহল থেকে বেরিয়ে গেল। মির্জা কামরানের লোকরা এই পাহারাদারকে পাকড়াও করে মির্জা কামরানের সামনে নিয়ে এলো। মির্জা তাকে বন্দি করার হুকুম দিলেন। এরপর মির্জার লোকরা প্রধান ফটক দিয়ে অভ্যন্তরে ঢুকে মূল্যবান দ্রব্যাদি এবং মহিলাদের মালামাল লুটপাট করে নিয়ে মির্জা কামরানের বাসভবনে পৌঁছে দেয়। মির্জা কামরান সম্মানীয় মহিলাদের মির্জা আসকরীর বাসভবনে স্থানান্তরিত করেন এবং মধ্যিখানে একটা দেয়াল তৈরী করে দেন। মহিলাদের জন্যে খাদ্য এবং পানি ইত্যাদি দেয়ালের ওপর থেকে সরবরাহ করা হতো।

আগে যেখানে মির্জা ইয়াদগার নাসের থাকতো সেখানে খাজা মোয়াজ্জেমকে থাকতে দেয়া হলো এবং নির্দেশ জারি করা হলো যে, তাঁর সকল হেরেম ললনাদের পূর্বে বাদশাহ যেখানে থাকতেন সেখানে থাকতে দেয়া হোক।

মির্জা কামরান তার দলত্যাগকারী সকল আমীরওমরাহ ও সেনাধ্যক্ষদের স্ত্রী-পরিজন ও অন্যান্যদের সাথে এ দারুণ অভদ্রজনোচিত ব্যবহার করেন এবং তাদের সব কিছু লুণ্ঠন করে নিয়ে আসেন এবং কারো হেফাজতে দিয়ে দেন।

আলা হযরত যখন খবর পেলেন যে, মির্জা কামরান ভক্কর থেকে ফিরে এসেছেন এবং এখানে এসে এসব কাণ্ডকারখানা করেছেন, সত্বর তিনি জাফর দুর্গ মির্জা সোলায়মানের হাতে ন্যস্ত করে দিয়ে জাফর থেকে ইন্দেরাব হয়ে ফিরে আসেন।

যখন তিনি কাবুল নগরীর উপকণ্ঠে পৌছেন, মির্জা কামরান হযরত মাতা ও আমাকে তাঁর বাসভবনে ডেকে পাঠালেন। হযরত মাতাকে হুকুম দিলেন তিনি যেন সত্বর বেগী বেগমের আস্তানায় চলে যান এবং আমাকে বললেন, তুমি এখানেই থাক, এটা তোমার নিজের জায়গা। আমি বললাম, আমি কেন এখানে থাকব, আমার মা যেখানে থাকবেন আমিও সেখানে থাকব। মির্জা আমাকে বললেন, তুমি স্বহস্তে খিজির খাজা খানকে একটা চিঠি লিখ সে যেন এখানে চলে আসে এবং আমার সাথে দেখা করে। মির্জা আসকরী এবং হিন্দাল যেমন আমার ভাই, সেও তেমনি আমার ভাই। এখন আমাকে সাহায্য করার সময় এসেছে তার। আমি বললাম, খিজির খাজা খানকে আমি কোনদিন পত্র লিখিনি, আর সে আমার হস্তাক্ষরও চেনে না। সে যখনই বাইরে কোথাও থাকে, আমাকে সে চিঠি লেখে তার ছেলেপিলেদের পক্ষ থেকে। তোমার যা ইচ্ছে, তাই তুমি লিখে দাও।

শেষাবধি মির্জা কামরান মেহদী সুলতান ওমর আলীকে খিজির খানকে নিয়ে আসার জন্য পাঠালেন।

আমি প্রথমেই খিজির খানকে লিখে দিয়েছিলাম, অবশ্যই মির্জা কামরানের সাথে তোমার ভ্রাতৃত্ব রয়েছে, সে কথায় ভুলে তুমি যেন আবার তার সাথে এসে মিলিত না হও। খোদার কাছে হাজার বার প্রার্থনা করি, তুমি কোন ক্রমেই হযরত বাদশাহর সঙ্গ যেন ত্যাগ না করো।

খোদার লাখো শোকরিয়া আমি খানকে যে কথা বলেছিলাম, সে তার থেকে এক বিন্দুও নড়েনি। হযরত বাদশাহ যখন শুনলেন যে, মেহদী ও শের আলীকে পাঠানো হয়েছে খিজির খানকে নিয়ে আসার জন্য, তখন এ খবর শু'নে আলা হযরতের পক্ষ থেকেও একজন দৌড়াল খিজির খানের কাছে।

এ সময় খিজির খান নিজের জায়গীর এলাকায় ছিলেন। লোকটি পৌছলে তিনি বললেন, 'তওবা, আমি কোনদিনই মির্জা কামরানের সঙ্গে যোগ দেব না, এটা নিশ্চিত জেনো।'

শেষাবধি খিজির খাজা খান বাদশাহর পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ পেতেই তার কাছে রওনা হয়ে আসেন এবং 'আকাবীনে' এসে তার খেদমতে হাজির হন।

বাদশাহ যখন কোহে মিনারের পাদদেশে পৌছেন, মির্জা কামরান পুনরায়

তার বাহিনী সুসজ্জিত করে শের আফগানের পিতা শেরুবার নেতৃত্বে প্রেরণ করে হুকুম দিলেন, তারা যেন যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

আমরা দুর্গের ছাদ থেকে দেখলাম যুদ্ধের কাড়া নাকাড়া বেজে চলেছে এবং উভয় বাহিনী চলেছে বাবা দস্তির পথে। আমরা মনে মনে বললাম, এমন কোন দিন যেন না আসে যেদিন সত্যি তুমি (কামরান) যুদ্ধ করবে এবং তোমার জন্য আমাদের কাঁদতে হবে।

মির্জা কামরান যখন 'দিয়ে আফগানান'-এর কাছে পৌঁছেন এবং উভয় দলের অগ্রবর্তী বাহিনী সামনা-সামনি অবস্থায়, তখন রাজকীয় বাহিনীর অগ্রগামী বাহিনী (কারা দেলানে শাহী) কামরানের বাহিনীকে পরাজিত করে। অনেক সৈন্যকে বন্দী করে আলা হযরতের সামনে নিয়ে আসা হলে, তিনি তাদেরকে টুকরা করে হত্যা করার নির্দেশ দেন।

মির্জা কামরানের বাদবাকী সৈন্যদেরকে রাজকীয় বাহিনী বন্দী করে। আলা হযরত তাদের কিছু সংখ্যক সৈন্যকে হত্যার নির্দেশ দেন এবং বাকীদের কয়েদখানায় প্রেরণ করেন। এদের মধ্যে মির্জা কামরানের সভাসদ মিয়া জুকি খানও ছিলেন। এরপর হযরত বাদশাহ মির্জা হিন্দাল সমভিব্যহারে বিজয়ের আনন্দে ঢাকঢোল বাজিয়ে মহা ধুমধামের সাথে নগরের 'আকাবীনে' প্রবেশ করেন এবং নিজেদের জন্য প্রয়োজনীয় শিবির, দরবার ও অন্যান্য আয়োজনের সুবনোবস্ত করেন। 'জমতান' নামক পুলের দায়িত্ব অর্পণ করা হয় মির্জা হিন্দালের ওপর এবং তাকে সেখানেই অবস্থান করতে দিয়ে অন্যান্য আমীরওমরাহদের দায়িত্বে বিভিন্ন স্থান বণ্টন করা হয়।

আলা হযরত এরপর দীর্ঘ সাত মাস কাবুল নগর অবরোধ করে রাখেন। দুর্ভাগ্য বলতে হবে যে, একদিন মির্জা কামরান হাবিলী পেরিয়ে দালানে ঢুকে পড়েন। এমতাবস্থায় একজন পেছন দিক থেকে তার উপর গুলি বর্ষণ করে। আওয়াজ শুনে তিনি একদিকে সরে পড়েন। সামনে দাঁড়ানো আকবর বাদশাহকে বলা হলো, গুলি লাগবে, আপনি সামনের দিকে এগিয়ে যান এবং চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখুন।

হযরত বাদশাহ এ খবর শুনে বললেন, আর যেন গুলি বর্ষণ না করা হয়। এরপর থেকে হুমায়ুন বাদশাহর সৈন্যরা আর কোন সময় প্রাসাদের শীর্ষদেশ

(টিলে কোঠা) থেকে গুলিবর্ষণ করতো না। কিন্তু কামরান মির্জার লোকরা কাবুল শহরের পশ্চাদভাগ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি বর্ষণ করতো।

বাদশাহর লোকরা মির্জা আসকরীকে সবসময় সামনে রাখতো। মির্জা কামরানের সৈন্যরা দুর্গের বাইরের প্রাঙ্গণে এসে যুদ্ধ করতো। এই যুদ্ধে উভয় পক্ষের কত লোকই না মারা গেল। কিন্তু এসব যুদ্ধে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই হযরত বাদশাহর লোকদের জয় হতো। যুদ্ধে এই সাফল্য সত্ত্বেও দুর্গে অবরুদ্ধ সৈন্যদের সাহস হতো না দুর্গের বাইরে এসে যুদ্ধ করার।

হযরত বাদশাহ দুর্গে অবস্থানকারী ছোট ছেলেপিলে, মহিলা, হেরেম ললনা ও অন্যান্যদের জন্যে দুর্গে তোপ-কামান বর্ষণ করতেন না এবং বাহির থেকে অভ্যন্তরে প্রবহমান পানির সরবরাহ চালু রাখেন।

যেহেতু দীর্ঘদিন যাবত এই অবরোধ কার্যকরী হয়েছিল, এজন্য খাজা দোস্তকে (মাদারিচার স্বামী) দুর্গের লোকরা হযরত বাদশাহর কাছে প্রতিনিধি হিসাবে প্রেরণ করে আবেদন জানায় যে, মির্জা কামরান যা কিছু চায়, তাকে তা প্রদান করুন এবং খোদার সৃষ্ট এই নিরীহ লোকদের এই অসহনীয় কষ্ট থেকে মুক্তি দান করুন।

হযরত বাদশাহ বাহির থেকে এই বিপন্ন লোকদের জন্য ৯০টি বকরী, সাত বোতল গোলাব, এক বোতল লেবুর রস, সাত জোড়া নতুন পরিচ্ছদ এবং কিছু জ্যাকেট প্রেরণ করেন এবং লিখে জানান, আমি তোমাদের কষ্টের কথা স্মরণ করে দুর্গের অবরোধ শিথিল করছি, কোন দুশমন যেন তোমাদের সাথে এ ধারা দুর্ব্যবহার না করে।

অবরোধের দিনগুলোতে দুই বছর বয়স্কা সুলতানা বেগম মৃত্যুবরণ করে। বাদশাহ লিখে জানালেন, 'আমি যদি দুর্গের অবরোধ কঠোর করি, আমার আশংকা হচ্ছে পাছে মির্জা মোহাম্মদ আকবরকে না অপহরণ করা হয়।'

মোটকথা, দুর্গের ছাদে লোকরা সব সময় মাগরিব নামাজের সময় থেকে ভোর অবধি বসে থাকতো এবং হৈ-হল্লা করতো। কিন্তু যে রাতে মির্জা কামরান পালিয়ে গেল, সন্ধ্যার নামাজের পর এশা নামাজের সময়ও অতিক্রান্ত হয়েছে, সে রাতে ছাদ থেকে আর কোন হৈ চৈ শোনা গেল না। দুর্গশীর্ষ থেকে নীচের দিকে একটি সিড়ি ছিল, লোকরা সে সিড়ি দিয়ে ওঠানামা করতো।

রাতের বেলা যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, হঠাৎ জররা বক্তর জুশনু এবং অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্র নিনাদ করে উঠলো। আমরা পরস্পরে বলাবলি করছিলাম, নিশ্চয়ই কোন নতুন আক্রমণ শুরু হয়েছে। 'জলুখানার' সামনে প্রায় এক হাজার লোক জমায়েত হয়েছিল এবং আমরা না জানি কোন চিন্তায় ছিলাম এরই মধ্যে সবাই চোখের পলকে গায়েব হয়ে গেল এবং কেরাচা খানের পুত্র বাহাদুর খান খবর নিয়ে এলো যে, মির্জা কামরান পালিয়ে গেছে আর খাজা মোয়াজ্জেমকে দেয়ালের সাথে লটকানো রশি দ্বারা উপরে তুলে নেয়া হয়েছে।

অবশেষে আমাদের লোকরা, বেগমের (হামিদা বানু) লোকরা এবং অন্যান্যরা মিলে সেই বন্ধদরজা ভেঙ্গে ফেলল, যে দরজার আড়ালে আমরা বন্দী ছিলাম। বেগা বেগম পীড়াপীড়ি করছিল আর মুহূর্ত কাল বিলম্ব না করে সবাই যেন নিজের আস্তানায় ফিরে চলে। আমি তাকে বললাম, একটু অপেক্ষা করো, আমাদেরকে গলিপথে যেতে হবে আর হয়তবা এরি মধ্যে বাদশাহর পক্ষ থেকে কোন লোকজন এসে যাবে।

এরি মধ্যে 'আম্বর নাজের' এসে পৌঁছুল এবং বলল, হযরত বলেছেন যতক্ষণ না তিনি আসবেন ততক্ষণ কেউ যেন ঘর থেকে বের না হন। কিছুক্ষণ আরো গত হলো এবং হযরত বাদশাহ এসে হাজির হলেন। আমাকে এবং হযরত দিলদার বেগমকে বুকে জড়িয়ে আলিঙ্গন করলেন। এরপর হামিদা বানু ও বেগা বেগমের পালা এলো। আলিঙ্গন শেষে বললেন, 'তাড়াতাড়ি এখান থেকে বের হওয়া যাক, খোদা প্রিয়জনদের এ ঘর থেকে যেন দুরে রাখেন এবং শত্রুদের যেন এ ঘরে জায়গা করেন।' আম্বর নাজেরকে হুকুম দিলেন ; 'একদিকে তুমি দাঁড়িয়ে যাও এবং অন্য দিকে তরদী বেগ খান, এরি মাঝখান দিয়ে মহিলাদের যেতে দাও।' এক এক করে মহিলারা বের হয়ে গেল। সে রাতে সকলে হযরত বাদশাহর সান্নিধ্যে অবস্থান করেন। দেখতে না দেখতে সকাল হয়ে গেল। মাহ্ চুচক, খানেশ আগা এবং বাদশাহর অন্যান্য হেরেম নলনারা এলে আমি তাদেরকে বুকে জড়িয়ে আলিঙ্গন করলাম।

আলা হযরত যখন বদখশান রওনা হয়ে যান চুচক বেগমের গর্ভে এক কন্যা সন্তান জন্মলাভ করে। সে রাতে হযরত বাদশাহ স্বপ্ন দেখেছিলেন যে, আমার মা ফখরুন্নেসা এবং দৌলৎ বখ্‌ত্‌ দরজার ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন এবং কি যেন নিয়ে এসে তাঁর সামনে রেখে দিলেন। খুব ভেবে চিন্তে দেখলেন এ স্বপ্নের

ব্যাখ্যা কি হতে পারে? শেষে যখন জানতে পারলেন যে, মেয়ে জন্ম নিয়েছে, তখন এ দু'জনের নামের অর্ধাংশ জুড়ে নাম রাখলেন বখ্‌তে নেছা বেগম। মাহ্‌ চুচক্‌-এর গর্ভে সর্বমোট ৪ মেয়ে ২ ছেলে জন্মলাভ করে, এদের নাম যথাক্রমে বখ্‌তে নেছা বেগম, সকিনাবানু বেগম, আমেনা বানু বেগম, মোহাম্মদ কলিম মির্জা এবং ফররুখ খান মির্জা।

যে সময় হযরত বাদশাহ হিন্দুস্থান অভিমুখে যাত্রা করেন সে সময় মাহ চুচক সন্তান-সম্ভবা ছিলেন এবং কাবুলে ছেলে সন্তানের জন্ম হয়, যার নাম ফররুখ খান মির্জা। এর কিছুকাল পর খানেশ আগার গর্ভেও এক ছেলে সন্তান জন্ম নেয়, যার নাম ছিল ইব্রাহিম সুলতান মির্জা।

আলা হযরত দেড় বছর কাবুলে পরমানন্দে দিন কাটান। মির্জা কামরান পালিয়ে যাবার পর তিনি এরপর বদখ্‌শানে চলে যান। তিনি তখন তালে-কানে অবস্থান করছিলেন। এক সুরম্য বাগানের অভ্যন্তরের এক শিবিরে তিনি সবে ফজরের নামাজ সেরে উঠেছেন এমন সময় খবর পেলেন, হযরত বাদশাহ্‌র অধিকাংশ আমীরওমরাহ হঠাৎ মির্জা কামরানের দলে ভিড়ে পালিয়ে গেছে। এই পলাতক আমীরওমরাহদের মধ্যে কেরাচাখান, মোসাহেব খান, মোবারেজ খান ও বাপুচ-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই উদ্দেশ্যহীন কর্মচারীরা রাতের বেলাতেই শিবির ছেড়ে পালিয়ে বদখশানে মির্জা কামরানের দলে মিলিত হয়েছে।

আলা হযরত এক শুভক্ষণে বদখশানে রওনা হন এবং তালেকানে পৌঁছে মির্জা কামরানের বাহিনীকে অবরোধ করেন।

কিছুক্ষণ পর মির্জা কামরান রণেভঙ্গ দিয়ে আনুগত্য প্রকাশ করেন এবং সবি-নয়ে আলা হযরতের খেদমতে হাজির হয়েছেন। হযরত অতঃপর তাকে (কামরান) 'কোলাব' অঞ্চল, মির্জা সোলায়মানকে জাফর দুর্গ, মির্জা হিন্দালকে কান্দাহার এবং মির্জা আসকরীকে তালেকানের শাসনাধিকার প্রদান করেন।

একদিনের ঘটনা। কসম্‌ অভ্যন্তরে শিবির স্থাপন করা হয়েছে। সকল ভাইয়ের একত্রিত অবস্থান ছিল সেদিন। অর্থাৎ হযরত হুমায়ুন বাদশাহ, মির্জা কামরান, মির্জা আসকরী, মির্জা হিন্দাল ও মির্জা সোলায়মান একই শিবিরে ছিলেন। হযরত বাদশাহ চেঙ্গিস খানের রীতি অনুসরণ করে বললেন, আফতাপ ও চিলুমচী এদিকে দিয়ে এসো, এখানেই একত্রে হাত ধুয়ে আমরা সবাই

খাবার খাব (পুনর্মিলনের প্রতীক হিসাবে)। প্রথম হযরত বাদশাহ এবং মির্জা কামরান হাত ধুলেন। যেহেতু মির্জা সোলায়মান মির্জা আসকরীও হিন্দাল থেকে এক বছরের বড় ছিলেন এজন্যে বয়ক্রমের সম্মান রক্ষার জন্য উভয় ভ্রাতা চিলুমচি মির্জা সোলায়মানের সামনে পেশ করেন। হাত ধোবার পর মির্জা সোলায়মান চিলুমচিতে নাক ঝেড়ে এক অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেন। এতে বিরক্ত হয়ে মির্জা আসকরী ও হিন্দাল তাকে তীরস্কার করেন এবং বলেন, আপনি এসব কি বাজে অভ্যাস প্রদর্শন করলেন? প্রথমতঃ হযরত বাদশাহ্‌র সামনে আমাদের হাত ধোয়া তো এক পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার। তিনি যখন আমাদের হুকুম দিলেন যে, এসো একত্রে বসে খাই, তখন কার সাধ্য আছে তা অমান্য করে? কিন্তু আপনি কেন এমন সুন্দর পরিবেশকে নষ্ট করলেন নাক ঝেড়ে। একথা বলে মির্জা আসকরী ও হিন্দাল বাইরে চলে গেলেন এবং সেখান থেকে হাত ধুয়ে ভেতরে এলেন, এতে মির্জা সোলায়মান বেশ লজ্জিত হলেন।

এভাবে সকল ভাইরা একত্রিত হয়ে একই দস্তরখানে বসে খাবার খেলেন। হযরত বাদশাহ এই অনুষ্ঠানে এই অধমকেও স্মরণ করেন। কথায় কথায় ভাইদের বললেন, একবার লাহোরে গুলবদন বলেছিল, তার একটা অদম্য ইচ্ছা, সে যদি কোনদিন সকল ভাইকে একত্রে একই স্থানে দেখতে পারতো। সকাল থেকে আমরা সকলে একত্রে বসে আছি। এ সময় আমার গুলবদনের সে ইচ্ছার কথাই বারবার মনে পড়ছিল। আল্লাহ্ আমাদের ভাইদের এই ঐক্য-যেন অনুমোদন করেন। তিনি জানেন, আমাদের মনে কোনদিনই কোন মুসলমানের ক্ষতি সাধনের চিন্তা নেই। আর নিজের ভাইদের কথা তো আলাদা। খোদা তা'লা যেন আমাদের সে শক্তি দান করেন, যাতে আমরা চিরদিন মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে পারি।

এই ঐক্য ও মিলনের ভিত্তিতে চারদিকে আনন্দের বন্যা বয়ে যেতে লাগল। এই উপলক্ষে বহু আমীরওমরাহ ও কর্মচারীদের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুদের মাঝে পুনরায় পরস্পরে মিলনের সুযোগ ঘটে। এতদিন কর্তা ব্যাক্তিদের মাঝে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও অনৈক্য বিদ্যমান থাকায় তাদের মাঝেও অনৈক্য ও বৈরীভাব ছিল, একে অপরের রক্তপাতের নেশায় মেতে উঠেছিল। কিন্তু আজ সকলের অনৈক্য ঘুচে গেছে, আজ পরম মৈত্রী ও খুশীর দিন।

বাদশাহ বদখশান থেকে ফিরে এসে কাবুলে দেড় বছর অতিবাহিত করেন। এরপর বলখ্ অভিযানের প্রস্তুতি হিসাবে কাবুলের উপকণ্ঠে 'বাগে দিলকুশা'তে আস্তানা তৈরী করেন। আলা হযরতের বাসভবন উক্ত বাগের নিম্নভাগে অবস্থিত ছিল। এবং যেহেতু কুলি বেগের বাসভবনও ছিল তার পাশাপাশি, এজন্য মহিলা ও হেরেম ললনাদের সেই ভবনে থাকতে দেয়া হলো।

হযরত বাদশাহ্‌কে কয়েকবার অনুরোধ করা হয়েছিল, চলুন বাগানের প্রস্ফুটিত 'রেওয়াজ' (এক ধরনের ফুলের গাছ) ফুলের সমারোহ দেখা যাক। হযরত তার জবাবে বললেন, লোকলস্কর নিয়ে যখন ভ্রমণে বের হবো এবং পাহাড়ী এলাকা দিয়ে চলব তখন তোমরা চোখ জুড়িয়ে 'রেওয়াজ' ফুল দেখে নিও।

আছরের নামাজের সময় ছিল তখন। হযরত বাদশাহ সওয়ার হয়ে দিলকুশা বাগে এলেন। কুলি বেগের ভবন কাছেই ছিল যেখানে পুরনারীগণ অবস্থান করছিল। হযরত ঘোড়ায় চড়ে পাশে দিয়ে যাচ্ছিলেন, আলতোভাবে মহলের দিকে তাকাতেই সকল মহিলাদের সাথে তার দৃষ্টি বিনিময় হলো এবং সম্মান প্রদর্শনের জন্যে সালাম আদাব সহ উঠে দাঁড়ালো। ফখরুন্নেসা এবং আফগানী আগাচা আগে আগে চলতে লাগলেন। পাহাড়ের পাদদেশে এক প্রবহমান ঝরণার কাছে এসে ফখরুন্নেসা ঝরণাটি পার হতে পারছিলেন না, ওদিকে আফ-গানী আগাচাও পার হতে গিয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে গেলেন। এভাবে হযরত বাদশার কাছে যেয়ে পৌঁছতে আমাদের এক ঘণ্টা বিলম্ব হলো। তাছাড়া মাহ চুচক বেগমের ঘোড়া পায় পায় পাহাড়ের একটা উচু টিলার উপর যেয়ে উঠেছিল। আলা হযরত এজন্য বেশ বিরক্ত এবং ঝামেলা বোধ করেন।

উক্ত ফুলের গাছ বেশ উচুতে ছিল। চারদিকে কোন পাচিলও তৈরী হয়নি তখনো। ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে আলা হযরতকে একটু ক্লান্ত মনে হলো। তিনি বললেন, তোমরা এগিয়ে যাও, আমি ইতিমধ্যে একটু আফিম খেয়ে চাঙ্গা হয়ে আসি। তোমরা চলতে থাক, আমি একটু পরে আসছি। একথা বলে তিনি শিবিরে ফিরে গেলেন। আমরা পাহাড়ী দৃশ্য ও ফুলের সমারোহ দেখার জন্য পায় পায় এগিয়ে যাচ্ছিলাম। কিছু দুর যেতে না যেতেই দেখলাম হযরত বাদশাহ ফিরে এসেছেন। এবারে তার চেহারায় কোন ক্লান্তি ছিল না, বেশ উৎফুল্ল মনে হচ্ছিল।

সে রাত ছিল চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত একটি রাত। আমরা একে অপরকে গল্প শুনালাম এবং পাহাড়ী পথে এগিয়ে চললাম পায় পায়। খানেশ আগা, জরিফ গোয়েন্দা, সেরুসেমী ও সাহাম আগা আস্তে আস্তে গুন গুন করে গান ধরল। গাইতে গাইতে আমরা 'লোগমান' অবধি এসে পৌঁছলাম। তখনো শিবির, খিলান, তোরণ ইত্যাদি অনেক দূরে ছিল। প্রথমেই চাদরে মেহের (বাদশাহ্‌র বিশেষ শিবির)-এর সামনে পৌঁছলাম আমরা। আলা হযরত, হামিদা বানু আর আমরা রাতের ছু'তিন প্রহর অবধি বসে থাকলাম সেই 'চাদরে মেহেরে'। শেষাবধি সেখানেই শুয়ে পড়লাম আমরা সবাই। ভোর হলে বাদশাহ ইচ্ছা প্রকাশ করলেন আবার 'রেওয়াজ' বৃক্ষের ফুল দেখার। যেহেতু মহিলাদের ঘোড়ার আস্তাবল ছিল দূরের গ্রামে। ঘোড়া নিয়ে আসতে প্রাতঃ ভ্রমণের সময় শেষ হয়ে যাবে—এজন্যে বাদশাহ হুকুম দিলেন, সামনে যে ঘোড়া পাও তা-ই নিয়ে এসো। ঘোড়া এলো, বাদশাহ বললেন, এক এক করে ওঠো ঘোড়াতে।

বেগা বেগম এবং মাহ্‌চুচক তখনো কাপড় পরছিলেন। আমি আলা হযরতকে অনুরোধ করলাম. যদি অনুমতি দেন তাহলে আমি ওদের ছু'জনকে নিয়ে আসি। বললেন, জলদি যাও, ওদের নিয়ে এসো। আমি হেরেম অভ্যন্তরে ঢুকে বললাম, হযরতের গোলামীতে রয়েছি। তোমাদের খবর দিতে এসেছি, বলি এতো দেরী কেন করছ? অতঃপর আমি তাদের নিয়ে চলে এলাম।

হযরত আমার সামনে এসে বললেন, 'গুলবদন এখন তো আর ভ্রমণের সময় নেই। এখন গেলে গরম বাতাস লাগবে গায়। তার চে বরং জোহর নামাজের পরে চলা যাক।

আলা হযরত হামিদা বানুর আস্তানায় চলে গেলেন। জোহর নামাজের পরে ঘোড়া আসতে আসতে আছর নামাজের কাছাকাছি হলো। এ সময় হযরত বাদশাহ বেরিয়ে এলেন।

পাহাড়ের বাঁকে বাঁকে রেওয়াজ ফুলের বৃক্ষরাজির নতুন পত্রপল্লব আর মুকুল ধরেছিল। আমরা তা দেখে ঘুরে ফিরে সময় অতিবাহিত করলাম এবং এক সময় সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। সেখানেই শিবির রচনা করা হলো এবং আমরা পরমানন্দে হযরত বাদশার সান্নিধ্যে সেখানে রাত কাটালাম।

আলা হযরত সকালের নামাজ পড়ে একটু পায়চারী করতে বের হলেন এবং সেখান থেকে বেগা বেগম, হামিদা বানু বেগম, মাহ্‌চুচক বেগম, আমাকে অন্যান্য

বেগমদের আলাদা আলাদা চিঠি লিখে বললেন, আপনারা আমাকে যে কষ্ট দিয়েছেন সে জন্য স্বেচ্ছায় আপনাদের ক্ষমা চেয়ে নেওয়া উচিত। ইনশাল্লাহ ফরজা অথবা এস্তালিপে যেয়ে আমি তোমাদের বিদায় জানিয়ে কাফেলার সাথে যেয়ে মিলিত হব। অন্যথায় (যদি ক্ষমা না চাও) আমি এখান থেকেই তোমাদের বিদায় জানাচ্ছি।

প্রত্যেকেই ক্ষমা চেয়ে আলাদা চিঠি লিখে মহামান্য বাদশাহ্‌র কাছে প্রেরণ করলো। শেষাবধি আলা হযরত সকল বেগম ও মহিলাদের নিয়ে সওয়ার হন এবং লগমান থেকে হাজারীতে পৌছেন। প্রত্যেকে নিজের নিজের শিবিরে রাত কাটায়, ভোরে উঠে খাবার খেয়ে জোহর নামাজ অবধি ফরজা পৌছেন।

হামিদা বানু বেগম আমাদের জন্য ন' ন'টি বকরী প্রেরণ করেন। কিছুদিন পূর্বে দৌলত বখ্‌ত বিবি ফরজা এসে উঠেছিলেন। তিনি বেশ কিছু সুস্বাদু খাবার তৈরী করেছিলেন। দুধ, দৈ, ফিরনী পায়েশ ইত্যাদিও ছিল। সে রাত আমাদের বেশ আনন্দেই কেটেছিল। সকালে ফরজার চারদিকে ভ্রমণে বের হলো সকলে। ফরজার ঝরণার পানি বেশ চমৎকার ছিল। সেখান থেকে অতঃপর এস্তালিপ পৌছলেন। এস্তালিপে তিনদিন অতিবাহিত করার পর সেখান থেকে রওনা দিয়ে ৯৫৮ হিজরীতে বলখ অভিমুখে রওনা হন।

আলা হযরত কোতেল অতিক্রম করে মির্জা কামরান, মির্জা সোলায়মান ও মির্জা আসকরীকে ফরমান জারি করে তলব করলেন এবং বললেন, আমি এবার উজবেকদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হচ্ছি, এ সময় আমাদের সকল ভাইয়ের মাঝে একতা রক্ষার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করে একতার প্রশ্নে সকলে সত্বর আমার সাথে এসে মিলিত হও।

এই ফরমান প্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই মির্জা সোলায়মান এবং আসকরী এসে পৌছেন এবং দলে দলে বলখ পৌছেন।

এ সময়ে পীর মোহাম্মদ খান বলখে ছিলেন। প্রথম দিনেই পীর মোহাম্মদ খানের বাহিনী মোকাবিলায় অবতীর্ণ হয়ে সুশৃংখলভাবে যুদ্ধ করে। এই যুদ্ধে রাজকীয় বাহিনী জয়লাভ করে। পীর মোহাম্মদের সৈন্যদল পরাজিত হয়ে শহরের অভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করে।

পরদিন সকালে পীর মোহাম্মদ মনস্থ করলেন, যেহেতু চুঘতাইদের ক্ষমতা এখন তুঙ্গে, এদের সাথে মোকাবিলা করে কোন সুবিধা হবে না। অতএব শহর ছেড়ে পালিয়ে যাওয়াই শ্রেয়।

এদিকে রাজকীয় বাহিনীর একজন পদস্থ আমীর এসে আলা হযরতের কাছে নিবেদন করে বললেন, যেখানে এখন সৈন্য সমাবেশ করা হয়েছে, জায়গাটা ভাল নয়। বরং একটা প্রশস্ত ঢালু জায়গা দেখে সেখানে ছাউনি ফেলা হোক। হযরত বাদশাহ হুকুম দিলেন তাই করা হোক। সেমতে মালামাল স্থানান্তরিত করা হচ্ছিল, কিন্তু এরই মধ্যে হঠাৎ গুজব ছড়িয়ে পড়লো যে, আমরা প্রতিপক্ষের সাথে এঁটে উঠবো না।

হয়ত খোদারও তাই ইচ্ছা ছিল এজন্যে রাজকীয় সৈন্য কোনরূপ যুদ্ধ না করেই সেখান থেকে অন্যত্র চলে গেল।

উজবেক খবর পেল যে, হুমায়ুনের সৈন্যরা চলে গেছে। তারা বেশ খুশী হলো এতে। সৈন্যদের পথ রোধ করার জন্য বাদশাহ্র লোকরা অনেক চেষ্টা করল। কিন্তু কোনমতেই তাদেরকে ঠেকিয়ে রাখা গেল না। আলা হযরত কিছুকাল যাত্রা স্থগিত রাখেন। শেষাবধি দেখা গল, সবাই তাঁকে ছেড়ে চলে গেছে এবং উজবেকরাও এসে পড়ল বলে। উপায়ান্তর না দেখে পরে তিনি কনৌজের দিকে চলে যান।

হযরত বাদশাহ কিছুদুর পথ চলে এক জায়গায় থেমে বললেন, আমার ভাইরা তো এখনো এলো না, আমি কি করে সামনে এগিয়ে যাব। তিনি আমীর ওমরাহ-দের বললেন যে, তারা যেন অতি শীঘ্র শাহজাদাদের খোঁজখবর নিয়ে আসেন। একথা শুনে তারা কোন প্রত্যুত্তরও করল না, তাদের খোঁজে কেউ বের হয়েও গেল না, পরে কন্দুজ থেকে শাহজাদাদের সম্পর্কে খবর এলো যে, তারা এই পরা-জয়ের খবর শুনে ফেলেছেন, তবে তারা এখন কোথায় আছেন কেউ বলতে পারে না। এখবর সম্বলিত চিঠি পেয়েই হযরত বাদশাহ ভীষণ রকম চিন্তিত ও অস্থির হয়ে পড়েন। খিজির খাজা বলল, 'আপনি যদি হুকুম করেন তাহলে আমি তাদের খবর নিয়ে আসার জন্য রওনা দিতে পারি।' হযরত বললেন, 'আপনার উপর আল্লার রহমত বর্ষিত হোক, মনে হচ্ছে তারা কন্দুজে রয়েছে।'

দু'দিন পর খাজা কন্দুজ থেকে ফিরে এলো এবং জানাল যে, মির্জা হিন্দাল কন্দুজে বেশ কুশলে আছেন। এখবর শুনে আলা হযরত যারপরনাই খুশী হন এবং মির্জা সোলায়মানকে জাফর দুর্গে প্রেরণ করে তিনি কাবুলে রওনা হন।

এসময় মির্জা কামরান কোলাবে ছিলেন। এখানে তিনি তরখান বেগা নাম্নী জনৈকা ডাইনী মেয়ের খপ্পরে আক্রান্ত হন। এই মেয়েটি মির্জা কামরানকে পরামর্শ দিল যে, তিনি যেন হেরেম বেগমের (মির্জা সোলায়মানের স্ত্রী ও মির্জা কামরানের শ্যালিকা) কাছে প্রেম নিবেদন করেন এবং তাতেই তার মনোবাঞ্ছা পূরণ হবে।

মির্জা কামরান এই মেয়েটির পরামর্শক্রমে একটি চিঠি (প্রেমপত্র) ও রূপক উপঢৌকন সহ বেগী আগাকে হেরেম বেগমের কাছে প্রেরণ করেন। এই মহিলা চিঠি এবং উপঢৌকন নিয়ে হেরেম বেগমের কাছে এসে জানাল মির্জা কামরান আপনার দর্শনপ্রার্থী। হেরেম বেগম বলল, 'এই চিঠি' এবং উপঢৌকন তোমার কাছে রেখে দাও এখন, মির্জাগণ যখন ফিরে আসবে তখন এগুলো পেশ করবে। বেগী বেগম অনেক অনুনয় বিনয় করে কান্নাকাটি করে বলল, মির্জা কামরান এগুলো শুধুমাত্র তোমার জন্য পাঠিয়েছে। তিনি অনেকদিন থেকে তোমাকে ভালবাসেন, আর তুমি কিনা তার ব্যাপারে এ ধারা ব্যবহার করছ। হেরেম বেগম একথা শুনে তাকে খুব করে বকল এবং তক্ষুণি মির্জা সোলায়মান ও মির্জা ইব্রাহিমকে ডেকে বলল, 'মির্জা কামরান তোমাদের মুরদ কতটুকু তা জেনে ফেলেছে, তা নাহলে সে আমাকে এ ধরনের চিঠি লিখবে কেন? সে আমাকে এতই নীচ মনে করল? মির্জা কামরান তোমার (মির্জা সোলায়মান) বড় ভাই, আর আমি তার মেয়ের সমান, তা সত্ত্বেও সে কেন এ ধারা পত্র লিখল? নাও, এ চিঠি নিয়ে নাও এবং এই পত্র-বাহিকা মেয়েটিকে টুকরা টুকরা করে ফেল, যাতে ভবিষ্যতে কোনদিন কেউ নিজেদের বউঝিদের উপর বদনজর না ফেলে।

কোন মায়ের ছেলেদের এটা কেমন করে শোভা পায় যে, এধরনের প্রস্তাব নিয়ে আসে। আমার এবং আমার ছেলেদের একটু ভয়ও তার প্রাণে ছিল না।

পর মুহূর্তেই বেগী আগার শিরচ্ছেদ করা হলো এবং তার মৃত দেহকে টুকরা টুকরা করা হলো।

মির্জা সোলায়মান এবং মির্জা ইব্রাহিম এ ঘটনার পর মির্জা কামরানের উপর বিরূপ হন এবং হযরত বাদশাহকে পত্রে জানান, মির্জা কামরানের বিরুদ্ধ মনোভাব রয়েছে। এই বিরুদ্ধ মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটলো হযরত আলার বলখ রওনা হবার সময়। কামরান তাঁর সাথে গেলেন না।

এরপর কোলাবে মির্জা কামরানের বেঁচে থাকার অনন্য উপায় হলো একমাত্র দরবেশ হয়ে নিঃসঙ্গ জীবন বেছে নেয়া। তিনি তাঁর ছেলে আবুল কাশেম ইব্রাহিমকে মির্জা আসকরীর কাছে পাঠিয়ে দিলেন এবং তিনি নিজে কন্যা আয়েশা সুলতানকে নিয়ে 'তালেকান' চলে যান। মির্জা কামরানের স্ত্রীর নাম ছিল্ খানম বেগম। তাকে বললেন, তুমি এবং তোমার মেয়েকে নিয়ে তুমি পরে এসো। আমি যেখানেই একটু অবলম্ববন খুঁজে পাব, তোমাদের ডেকে পাঠাব। ততদিন তোমরা খোস্ত এবং ইন্দেরাবে গিয়ে থাকো।

উক্ত খানম উজবেক খানদের আত্মীয়া ছিলেন। উজবেকদের মধ্যে যারা খানমের আত্মীয়-স্বজন ছিল তাদের মধ্যে এসব খবর জানা হয়ে গেল। তারা অন্যান্য উজবেকদের বুঝাল যদি ধনসম্পদ আহরণ (মালে গনিমত), গোলাম ও দাসীদের পেতে চাও, তাহলে অধিকার করে নাও এবং মহিলাদের নির্বিঘ্নে যেতে দাও। যদি খানমের ভাইরা জানতে পারে যে, তোমরা মেয়েদের সাথে বাড়াবাড়ি করেছ তাহলে তোমাদের উপর অসন্তুষ্ট হবে।

অনেক ছল-চাতুরী ও কলা-কৌশল আর হয়রানী ও রিক্ততার জ্বালা সয়ে খানম অবশেষে উজবেকদের হাত থেকে মুক্তি পায় এবং অবস্থানের নিমিত্ত খোস্ত এবং ইন্দেরাবে চলে আসে।

মির্জা কামরান বলখের পরাজয়-সংবাদ জেনে মনে করলেন, এখন আর বাদশাহ তার প্রতি খুব বেশী মনযোগী হবে না। অতএব কোলাব থেকে বের হয়ে চার দিকে ভবঘুরের মত চলতে লাগলেন।

এ সময় হযরত বাদশাহ কাবুল থেকে বের হলেন এবং কাপ্‌চাক্ এলাকায় আসেন। এখানে তিনি চুপচাপ এসেছিলেন, মির্জা কামরান কোন এক উঁচু জায়গা থেকে তাকে দেখে ফেলেন এবং লোকলস্কর নিয়ে তার উপর হামলা করে বসেন।

যেহেতু খোদার ইচ্ছা এই ছিল যে, একই মায়ের পেঠের ভাই, নিষ্ঠুর হতভাগা ও সন্ত্রাসবাদীটা এভাবে হযরত বাদশার উপর হামলা করে বসবে। এতে তাঁর মাথায় আঘাত লেখে জখম হয়। কপাল, মুখাবয়ব ও চোখ তাজা রক্তে ভরে গেল। মহাত্মা বাবুর বাদশাহ মোগলদের সাথে যুদ্ধ করতে যেয়ে যেভাবে আঘাত প্রাপ্ত হয়েছিলেন, ঠিক তেমন আঘাত পেলেম তিনি। এক মোগলের আঘাতে বাবুর বাদশাহর পাগড়ী ও টুপি অক্ষত ছিল, শুধু মাথাটায় চোট লেগে

জখম হয়। হযরত বাদশাহ বিস্মিত হন যে, তারও অনুরূপভাবে পাগড়ী ও টুপি অক্ষত থেকে শুধু মাত্র মাথাটা ফেটে যায়।

হযরত দস্তে কাপ্‌চাকের পরাজয়ের পর বদখশান চলে যান। মির্জা হিন্দাল, মির্জা সোলায়মান ও মির্জা ইব্রাহিম হযরত বাদশা সকাশে এসে হাজির হন। হযরত বাদশাহ তাদের নিয়ে কাবুল অভিমুখে রওনা হন। এই ভ্রাতৃচতুষ্টয় এমন সময় ঐক্যবদ্ধ হন যখন মির্জা কামরান পুনঃ আক্রমণের পায়তারায় ছিলেন। হযরত বাদশাহ হেরেম বেগমের কাছে পয়গাম পাঠিয়ে বললেন, বদখশানে অবস্থানরত সকল সৈন্য যত শীঘ্র সম্ভব আমার কাছে পাঠাও।

কয়েক দিনের মধ্যেই হেরেম বেগম কয়েক হাজার অশ্বারোহী সৈন্য তৈয়ার করে স্বীয় নেতৃত্বে সকল টেনিং এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে 'দোররা' পর্যন্ত পৌঁছে তিনি তাদের বিদায় জনান। সৈন্যরা চলে গেল কিন্তু তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে তাদের অপস্যয়মান দৃশ্য দেখতে লাগলেন। এই সৈন্যদল অতঃপর হযরত বাদশাহ্‌র কাছে এসে মিলিত হয়। চারকারান এবং ইয়াকরা বাগে মির্জা কামরান ও হুমায়ুন বাদশাহ্‌র যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে হুমায়ুন জয়ী হন এবং কামরান পরাজিত হন। মির্জা কামরান পরাজিত হয়ে রিক্ত হস্ত ও নেহাত বিপন্ন অবস্থায় যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করেন।

মির্জা কামরানের জামাতা আক সুলতান প্রায়ই তাকে বলতো, 'তুমি সব সময় হুমায়ুন বাদশাহ্‌র সাথে যুদ্ধ করে কি স্বাদ পাও, এতে তোমার উদ্দেশ্যই বা কি? তোমার আর যুদ্ধ করে লাভ নেই। হয় তুমি তার বশ্যতা স্বীকার করো, নতুবা আমাকে বিদায় দাও, যাতে করে লোকরা তোমার এবং আমার মাঝের পার্থক্য সম্পর্কে ধারণা নিতে পারে।'

মির্জা কামরান আক সুলতানের সাথে দুর্ব্যবহার করেন এবং বলেন, 'আমি এমন পর্যায়ে গেছি, আজ তুমিও আমাকে পরামর্শ দিতে শুরু করেছ।' আক সুলতান মির্জা কামরানের এ ধরনের কথার তীব্র প্রতিবাদ করে এবং বলে, 'আমি যদি তোমার সঙ্গ ত্যাগ না করি তাহলে আমার সকল হালাল বস্তু হারামে পরিণত হবে।'

আক সুলতান তখনই মির্জা কামরানের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে ভক্করের দিকে চলে যায়। যাবার সময় সে তার স্ত্রীকে সাথে নিয়ে যায়। মির্জা কামরান শাহ

হোসাইনকে এক ফরমান জারি করে বললেন, আক সুলতান ক্ষেপে গিয়ে এখান থেকে চলে গেছে। যদি সেখানে পৌঁছে থাকে তাকে যেতে দেবে না। তার সাথে তার স্ত্রীও রয়েছে। তার স্ত্রীকে সুকৌশলে আলাদা করে তারপর তাকে জানিয়ে দাও যে, এবার সে যেখানে ইচ্ছা চলে যেতে পারে।

এই চিঠি পেয়ে শাহ হোসাইন মির্জা আক সুলতানের কাছ থেকে হাবিবা বেগমকে কেড়ে নেন এবং তাকে মক্কা শরীফের দিকে চলে যেতে দেন।

চারকারানে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল তাতে কেরাচী খান এবং মির্জা কাম-রানের অন্যান্য খ্যাতিমান আমীরওমরাহগণ নিহত হন।

আয়েশা সুলতান বেগম এবং দৌলত বখ্‌ত আগাকান্দাহারের দিকে পালিয়ে যায়। দোররা তাকিয়া হেমার এলাকা থেকে বাদশাহের লোকরা তাদেরকে আটক করে। মির্জা কামরান অতঃপর আফগানদের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে তাদের সাথে বসবাস করতে থাকেন।

আলা হযরত প্রায়শঃ 'বাগে নারঞ্জী'তে ভ্রমণে যেতেন। সেবারও প্রতি বছরের মতো 'বাগে নারঞ্জ' দেখার জন্য 'তঙ্গীহা' গমন করেন। এসময় মির্জা হিন্দাল তাঁর সাথে ছিলেন। বেগমদের মধ্য থেকে বেগা বেগম, হামিদা বানু, মাহচুচক ও অন্যান্যরাও তাঁর সাথে ছিল। আমার ছেলে সা'দাত ইয়ার অসুস্থ ছিল, এজন্য আমি সাথে যেতে পারিনি।

একদিন আলা হযরত মির্জা হিন্দালকে সাথে নিয়ে 'তঙ্গীহা'র নিম্নাঞ্চলে শিকারে যান। বেশ শিকার মিলেছিল। মির্জা হিন্দাল যেদিকটায় শিকারে মত্ত ছিলেন, তিনি পায় পায় সেদিকে এগোলেন। মির্জা হিন্দাল অনেক জন্তু জানোয়ার মেরে স্তূপীকৃত করে রেখেছেন। হযরতকে দেখেই চেঙ্গিস খানের রীতি অনুযায়ী সব কিছু বড় ভাইয়ের সামনে পেশ করেন। চেঙ্গিস খানের রীতি ছিল প্রাপ্ত বা লব্ধ জিনিস ভাইদের মধ্যে যিনি বড় তার কাছে পেশ করা। মোটকথা, সকল শিকার বড় ভাইয়ের সামনে হাজির করার পর মির্জা হিন্দালের খেয়াল হলো, আমাদের তো হলো, কিছু শিকার তো বোনদের জন্যেও করা দরকার, বোনদের যাতে কোন অভিযোগ না থাকে। ঘন বনাঞ্চলের দিকে শিকার করে যাচ্ছিলেন তিনি এমন সময় মির্জা কামরানের এক লোক এসে পথ রোধ করে দাঁড়াল। মির্জা হিন্দাল এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ছিলেন। কোন রকম সতর্ক হওয়ার পূর্বেই লোকটি তীর নিক্ষেপ করে মির্জা হিন্দালের বাহু ভেদ করে ফেলে।

স্ত্রী পরিজন ও বোনরা দুর্ঘটনার এ খবর শুনে পাছে চিন্তাগ্রস্থ হয় এই ভেবে মির্জা হিন্দাল ঘটনার অব্যবহিত পরই এক চিঠি লিখে পাঠালেন। বললেন, বিপদ একটা সত্যি এসেছিল, কিন্তু কোন মতে কেটে গেছে। তোমরা এ ব্যাপারে মোটেই চিন্তা করোনা, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ আছি।

এদিকে গরমের কাল এসে পড়েছিল। আলা হযরত সদলবলে কাবুলে ফিরে, আসেন। এক বছর পর মির্জা হিন্দালের এই জখম আরোগ্য লাভ করে।

এক বছর পর আবার খবর পৌছল যে, মির্জা কামরান পুনরায় সৈন্য সমাবেশ করে চলেছে এবং যুদ্ধ করার মতো শক্তি সে সঞ্চয় করেছে। আলা হযরতও যুদ্ধের প্রস্তুতি নিলেন। ক্রমশঃ তিনি 'তঙ্গীহা'র দিকে এগিয়ে গেলেন। মির্জা হিন্দাল এসময় তাঁর সাথে ছিলেন। রাজকীয় গোয়েন্দাগণ প্রতি মুহূর্তে খবর নিয়ে আসতো যে, মির্জা কামরান যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত এবং এই রাতেই হামলা করার ষোল আনা সম্ভাবনা রয়েছে।

মির্জা হিন্দাল বাদশাহ্‌র খেদমতে এসে বসলেন এবং পরামর্শ দিলেন—আপনি এই উঁচু বেদিতে বসুন, জালালুদ্দিন মোহাম্মদ আকবরও আপনার পাশে থাকবে। এরাতে খুবই সতর্কতার সাথে পাহারা দিতে হবে। এরপর মির্জা তার নিজের লোকজনদের ডেকে খুব অনুপ্রাণিত করলেন এবং বললেন, তোমাদের পূর্বেকার সকল সেবা ও অবদান তুলাদণ্ডের এক পাল্লায় রাখা হবে। এবং শুধু আজকের কৃতকর্ম অপর পাল্লায় রাখা হবে। ইনশাআল্লা, তোমরা যা চাইবে তাই তোমাদেরা দেওয়া হবে। এই বলেই তিনি প্রতিটি লোককে দায়িত্ব বণ্টন করে বিভিন্ন ঘাটিতে ছড়িয়ে দেন এবং নিজে জররা বখ্‌তর, ফৌজি উরদি ইত্যাদি পরিধান করে তৈরী হতে লাগলেন।

সমরাস্ত্রের বাক্সপেটরা সবে তোলা হচ্ছিল এমন সময় কে একজন চীৎকার করে উঠল। শেক্‌চি বাক্স রেখে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল। দেরী দেখে মির্জা লোক পাঠিয়ে তাগিদ করলেন তাড়াতাড়ি যেন এগুলো নিয়ে আসা হয়। নিয়ে আসার পর বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করায় শেক্‌চি জানাল, সবে বাক্সপেটরা তুলছিলাম এমন সময় কে একজন চীৎকার করে উঠেছিল, এজন্য আমি তা রেখে দিয়ে কিছু সময় বিলম্ব করলাম, তাই এত দেরী হলো।

মির্জা হিন্দাল বললেন, 'এসব মিছেমিছি বলছ, তোমরা আসলে পিঠটান দিতে চেষ্টা করছ, বরং বলো, ইনশাআল্লা যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করার সৌভাগ্য

করব। দ্বিতীয় বার বললেন, বন্ধুরা তোমরা সাক্ষী থেকো, আমি সকল হারাম বস্তু গ্রহণ ও অনভিপ্রেত কাজ থেকে তওবা করে নিয়েছি। উপস্থিত সৈন্যরা ফাতেহা পাঠ করলেন এবং তাকে মোবারকবাদ জ্ঞাপন করলেন। বললেন, নিমচা জামা (যুদ্ধের পরিচ্ছদ) এবং জররাবখ্‌তর নিয়ে এসো। এসব পরিধান করে পরিখার কাছে চলে গেলেন এবং সৈন্যদের মনে নানা কথায় উদ্দীপনার সঞ্চার করলে। এসময় হঠাৎ মির্জার তবক্‌চী অন্ধকার থেকে ফরিয়াদ করে জানাল যে, ওরা আমার উপর হামলা করে বসেছে। মির্জা এ কথা শুনতেই ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়লেন এবং সকলকে ডেকে বললেন, আমার তবক্‌চী তলোয়ারের মুখে আক্রান্ত হয়েছে, এখন আর আমরা বসে থাকতে পারি না। তার সাহায্যে আমাদের এগিয়ে যাওয়া উচিত। একথা বলে তিনি নিজেই পরিখায় নেবে পড়লেন। সৈন্যদের কেউই তার সাথে নামলো না। এরি মধ্যে সৈন্যরা তার উপর আক্রমণ করে বসল এবং মুহূর্তের মধ্যে তিনি শাহদত বরণ করলেন।

আমি জানতাম না যে, মির্জা হিন্দালের মতো একজন সজ্জন নবীন যুবা পুরুষের উপর অস্ত্র চালিয়েছে সেই নিষ্ঠুর নর পিশাচটি কে? হায়, তার বদলে যদি আমার নয়নের মণি প্রাণপ্রিয় পুত্র সা'দাত ইয়ার খান অথবা খিজির খাজা খান শাহদত বরণ করতো তাহলেও এত দুঃখ হতো না। হায়, তলোয়ারের আঘাতে এমন নির্মমভাবে সে প্রাণ দিল, সেই শোক কোন দিন ভুলব না। কোন দিন ভুলবার নয়। সেদিন কেমন করে ভুলব, যেদিন আমার আলোর উদ্ভাসিত এই সূর্য মেঘের আড়ালের অন্ধকারে হারিয়ে গেল চিরতরে।

মোটকথা, মির্জা হিন্দাল হযরত বাদশাহ্‌র জন্যে এভাবে নিঃশেষে প্রাণ বিলীন করলেন, অসীম ত্যাগ প্রদর্শন করলেন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মানসম্ভ্রম সুদৃঢ় রাখার জন্যে। মীর বাবা দোস্ত তাঁর প্রাণহীন দেহ তুলে মির্জা হিন্দালের নিজস্ব আস্তানায় এনে তোলেন। ঘুর্ণাক্ষরে কাউকে জানতে দেয়া হলো না এই খবর। সিপাই ডেকে দরজায় দাঁড় করিয়ে দেয়া হলো এবং বলা হলো যে, যদি কেউ দেখা করতে আসে তাকে বলে দেবে, মির্জার দেহে প্রচণ্ড আঘাত লেগেছে। মারাত্মক জখম হয়েছে। মির্জা বলেছেন—এমতাবস্থায় কেউ যেন দেখা না করেন।

আলা হযরতের কাছেও কেউ গিয়ে খবর জানাল যে, মির্জা হিন্দাল মারাত্মকভাবে আহত হয়েছেন। আলা হযরত তক্ষুণি তাকে দেখার জন্যে ঘোড়া তলব করলেন। মীর আবদুল হাই সবিনয়ে জানাল, মির্জা এত বেশী আহত হয়েছেন

যে, তাকে যেয়ে দেখা সমীচীন নয়। তার কথা শুনে ব্যাপারটা আঁচ করে ফেললেন এবং কোনমতে নিজেকে সামলে নিতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু শেষাবধি আর সামলে নিতে পারলেন না, ভ্রাতৃশোকে মুহ্যমান বাদশাহ এক সময় সংজ্ঞা-হীন হয়ে পড়লেন।

খিজির খাজা খান তার জায়গীর জুশাহীতে অবস্থান করছিলেন, তাকে খবর দিয়ে বলা হলো, মির্জার শবদেহ যেন জুশাহীতে নিয়ে গিয়ে আমানত হিসাবে দাফন করে দেয়া হয়।

খিজির খান উটের রশি ধরে এগিয়ে যাচ্ছিলেন এবং শোকে দুঃখে সজোরে মাতম করছিলেন। এই খবর শুনে বাদশাহ তাকে বলে পাঠালেন, ধৈর্য ধারণ কর। আমি তো তোমার চাইতে বেশী মুহ্যমান। শোকানলে আমার প্রাণ দাউ দাউ করে জ্বলছে। কিন্তু দুশমনদের কথা চিন্তা করে আমি প্রকাশ্যে সব চেপে যাচ্ছি। কেননা, শত্রুরা খুবই কাছাকাছি রয়েছে। এমতাবস্থায় ধৈর্য প্রদর্শন ছাড়া কোন উপায় নেই।

এরপর খান নিজেকে সামলে নিয়ে সকল শোক ও দুঃখ চাপা দিয়ে যথারীতি মির্জা হিন্দালের লাশ আমানতস্বরূপ জুশাহীতে নিয়ে দাফন করেন এবং পরে তিনি হযরত বাদশাহুর কাছে চলে আসেন।

ভ্রাতৃহন্তা, হৃদয়হীন ও নর-পিশাচ মির্জা কামরান যদি সে রাতে না আসতো তাহলে এত বড় মারাত্মক ঘটনা ঘটতো না। সে ছিল ঘরের ইঁদুর, নিজেদের দুশমন।

হযরত বাদশাহ এ ঘটনা সম্পর্কে কাবুলে পত্রাদি লেখেন। পত্র পেয়ে মির্জা হিন্দালের বোনরা এমন মাতম শুরু করেন যে, সারা কাবুল নগরী সে শোকে মুহ্য-মান হয়ে পড়ে। প্রতিটি দেয়ালের ইট পর্যন্ত যেন কান্না জুড়ে দিয়েছিল সেদিন।

গোলচেহারা বেগম কেরাচা খানের বাসভবনে গিয়েছিলেন। খবর নিয়ে তিনি ফিরে আসার পর এক প্রলয়ংকরী কাণ্ড বেঁধে গেল। জড়াজড়ি গলাগলি করে বোনরা কাঁদতে লাগল। কাঁদতে কাঁদতে কেউ কেউ বিছানা নিল, অসুস্থ্য হয়ে গেল অনেকে।

নরপিশাচ, নিষ্ঠুর মির্জা কামরানের দুর্ভাগ্য বলতে হবে যে, তার হাতে তার ভাই হিন্দাল নিহত হয়েছেন। এই ঘটনার পর এমন কোন খবর পাওয়া যায়নি, যাতে করে মির্জা কামরানের কর্মকাণ্ডে কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছে। বরং

দিন দিন তার অবনতি ঘনিয়ে আসে এবং অবস্থা ক্রমান্বয়ে খারাপ হতে থাকে।

ক্রমশঃ সে তার দৃষ্টিকে ধ্বংস এবং অকল্যাণের দিকে নিবদ্ধ করে। ফলে, সৌভাগ্য এবং ধন যশ তাকে বিমুখতা প্রদর্শন করে। মনে হচ্ছে, মির্জা হিন্দাল তার সকল সুখ ও উদ্যম হরণ করে নিয়ে গেছে। এই ঘটনার পর মির্জা কামরান অতঃপর পালিয়ে সরাসরি সেলিম শাহ্ (শের শাহের পুত্র)-এর কাছে পৌঁছেন। তিনি মির্জা কামরানকে এক হাজার টাকা দান করেন এবং এর বিনিময়ে মির্জা কামরান তার সমুদয় অতীত কথা সেলিম শাহকে শোনায় এবং 'কোমক' (জায়গীর বিশেষ) লাভের প্রার্থনা করে। কিন্তু সেলিম শাহ তার এই আর্জির প্রকাশ্য কোন জবাব দিলেন না। বরং গোপনে তিনি তার নিজের লোকদের বললেন, 'যে নিজের ভাই মির্জা হিন্দালকে হত্যা করতে পারে, সে কোন সহায়তা পাবার যোগ্য নয়। বরং এ ধরনের লোককে দুনিয়া থেকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া উচিত।'

সেলিম শাহের এই কথোপকথন মির্জা কামরান গোপনে শুনে ফেলে। শুনেই সে নিজের লোকদের সাথে কোন কথা না বলে রাত্রিবেলা পালিয়ে যায়। মির্জা কামরানের পশ্চাৎবর্তী কাফেলার লোকরাও একথা জানতে পারলো না যে, মির্জা এভাবে পালিয়ে গেছে।

সেলিম শাহ যখন জানতে পারলেন যে মির্জা কামরান পালিয়ে গেছে, তিনি মির্জার অধিকাংশ লোকজনদের বন্দী করার হুকুম দেন।

মির্জা কামরান সেখান থেকে পালিয়ে 'ভেরা' এবং খোশাবে পৌঁছে। সেখানেই আদম গখ্খর নানা কৌশল ও ছলচাতুরী করে তাকে বন্দী করে শেষে হযরত বাদশাহ্র সামনে এনে হাজির করে।

অতঃপর সকল মোগল-ললনা, প্রদেশ শাসকগণ, আমীর ওমরাহ, ছোট বড় প্রজাকুল ও সৈন্যরা (মির্জা কামরানের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত) হযরত বাদশাহ্কে পরামর্শ দিলেন রাজ্যশাসনের প্রশ্নে ভ্রাতৃত্ব গৌণ। যদি ভাইয়ের প্রতি মমত্ববোধ প্রদর্শন করতে হয় তাহলে রাজত্ব পরিত্যাগ করুন। আর যদি রাজত্ব ও রাজ্যশাসন মুখ্য হয়ে থাকে তাহলে ভ্রাতৃত্ব পরিহার করুন। এই কামরান মির্জাই আপনাকে দস্তে কাবচাকে আপনার মাথায় আঘাত হেনেছিল এবং মিথ্যা প্রলোভন ও ছলাকলার মাধ্যমে আফগানদের নিজের দলভুক্ত করে এবং শেষাবধি মির্জা হিন্দালকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। পরন্তু এই মির্জা কামরানের বদৌলতে আজ চুঘতাই

সম্প্রদায়ের লোক নিশ্চিহ্ন প্রায়। কতলোক তার চক্রান্তে আজ স্ত্রী পরিজনসহ বন্দী জীবন যাপন করছে এবং নানাভাবে বেইজ্জতী হয়েছে। অতএব এটা আর কোন ক্রমেই সম্ভব নয় যে, ভবিষ্যতে আমরা আর তার নির্যাতন ও সন্ত্রাসের শিকার হব। জাহান্নামের ভয় এবং এই নৃশংসতা নিজের চোখে দেখে আমরা আলা হযরতকে বলতে চাই যে, আমাদের জানমাল, পুত্র-পরিজন আপনার জন্যে উৎসর্গীকৃত। এই কুলাঙ্গার মির্জা কামরান আপনার ভাই নয়, বরং প্রধান শত্রু।

মোদ্দা কথা, উপস্থিত সকলে সম্মিলিতভাবে দাবী তুলল যে, খুনী চক্রান্তকারী মির্জা কামরানের শিরোচ্ছেদ করা হোক।

হযরত বাদশাহ জবাবে বললেন, আমি আপনাদের আবেগের সাথে সম্পূর্ণ একাত্ম। কিন্তু এ ব্যাপারে আমি মন থেকে সায় দিতে পারি না।

উপস্থিত সকলে হৈ চৈ করে উঠল এবং জোর দাবী তুলল যে, দাবীর ইচ্ছা মতো কাজ করা হোক। শেষাবধি বাদশাহ বললেন, এই যদি তোমাদের শেষ সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে এবং এটাই যদি ভাল মনে করো তাহলে একটা কাগজে তোমাদের মতামতটা লিখে দাও।

মুহূর্তে ডানে বাঁয়ে চারদিকে যেসব আমীর-ওমরাহ ছিলেন একটা কাগজ কুড়িয়ে নিয়ে তাতে লিখলেন,

"খুনী এবং সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী এই মির্জার শিরোচ্ছেদ করা হোক"।

আলা হযরত বাধ্য হয়ে এ কাজ করতে সম্মত হলেন। রাহতাসের উপকণ্ঠে পৌঁছার পর সৈয়দ মোহাম্মদকে নির্দেশ দিলেন, মির্জা কামরানের দুই চোখের পর্দা সেলাই করে দেয়া হোক সৈয়দ মোহাম্মদ তখনই গিয়ে মির্জা কামরানের দু'চোখের পল্লব সেলাই করে দিলেন। আলা হযরত মির্জা কামরানের দু'চোখ সেলাই করে দেয়ার পর...

এখানে এসেই পাণ্ডুলিপি শেষ হয়।

গুলবদন বেগম ও তাঁর পরিবার সম্পর্কে কিছু তথ্য

হুমায়ুন নামার রচয়িতা গুলবদন বেগম সম্পর্কে এই গ্রন্থের মূল ফারসী পাণ্ডুলিপির সংকলক, সম্পাদক ও ইংরেজী অনুবাদক মিসেস এনিটা বিউরেজ এম. এস. আর. এস. বলেন: শাহজাদী গুলবদন বেগম হযরত বাদশাহ জহিরুদ্দিন মোহাম্মদ বাবুর-এর পুত্র কন্যা ছিলেন। বাবুর সম্রাট তৈমুরের পুত্র মিরান শাহ এবং চেঙ্গিস খান-এর চুঘতাই খান-এর পুত্রের বংশোদ্ভূত ছিলেন। জহিরুদ্দিন বাবুর ১৪৮৩ খ্রীস্টাব্দের ১৪ ফেব্রুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন এবং বার বছর বয়সে পিতার উত্তরাধিকারী হিসাবে ফরগনা রাজ্যের সিংহাসনে বসেন।

তিনি তাঁর শাসনের প্রথম দশ বছরে বিরুদ্ধ শক্তিগুলোর আক্রমণ থেকে রাজ্যকে বাঁচানোর জন্যে প্রচুর সংগ্রাম করেন। কিন্তু এ সংগ্রাম ব্যর্থ হওয়ায় তিনি ১৫০৪ খ্রীস্টাব্দে আফগানিস্তানে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। এখানে পৌঁছে তিনি কাবুলের সন্ত্রাসবাদী 'আরগাউন' শাসকদের কাছ থেকে কাবুল কেড়ে নেন।

হুমায়ুন নামার রচয়িতা গুলবদন বেগম ১৫৩২ সালের কোন এক সময়ে জন্ম গ্রহণ করেন। এ সময়ে পিতা কাবুল বিজয়ী সম্রাট বাবুরের বয়েস ছিল উনিশ বছর। এ সময় তিনি (আরো) কন্দুজ, বদখশান, বিজোর এবং সোয়াত অধিকার করেন এবং এক বছর কালের মধ্যে কান্দাহারেরও শাসন লাভ করেন।

মাত্র দশ বছর অতিক্রান্ত হবার পরই তিনি নিজেকে তৈমুর রাজন্যবর্গের ন্যায্য উত্তরাধিকারী একজন স্বাধীন নরপতি বলে মনে করেন (পরিগণিত হন)। এটা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ যে, গুলবদন বেগম একজন পরাক্রমশালী শক্তিবান নরপতির কন্যা হিসাবে জন্মলাভ করেন।

হযরত বাদশাহ বাবুর তাঁর স্বরচিত আত্মচরিতে বলেছিলেন: ভারত সাম্রাজ্য অধিকার করার স্বপ্ন ছিল তার উনিশ বছর ধরে (উনিশ বছর বয়স থেকে কিনা তা সুস্পষ্ট নয়)। যখন গুলবদন জন্মলাভ করেন তখন তিনি হিন্দুস্তান অধিকার করার জন্য সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন। হিন্দুস্তান বিজয়ের স্বপ্ন তাঁর পুরোপুরি সফল হয়েছিল যখন গুলবদন বেগম আড়াই বছরে উত্তীর্ণ হন। হিন্দুস্থানে সম্রাট বাবুর তুর্কী নরপতিদের প্রথম শাসনকর্তা এবং ভুল আখ্যায়িত মোগল সাম্রাজ্যের (ইংরেজী সংস্করণের ভূমিকা দ্রষ্টব্য) প্রবর্তক।

শাহজাদী গুলবদনের শৈশবকাল তার পিতার সাহচর্যে কাবুল এবং হিন্দুস্থানে অতিবাহিত হয়। তিনি শৈশবে, বিবাহিত জীবনে সম্রাট হুমায়ুনের উত্থান ও নির্বাসনের সকল ঘটনার দ্রষ্টা এবং পরবর্তী জীবন ও বার্ধক্যকাল তিনি সম্রাট আকবরের তত্ত্বাবধানে অতিবাহিত করেন।

গুলবদনের মাতার নাম ছিল দিলদার বেগম। এই মহিলার বংশ পরিচয় সম্পর্কে না সম্রাট বাবুর কোথাও কিছু বলেছেন, না গুলবদন কিছু বলেছেন। দিলদার বেগমের বংশ পরিচয় সম্পর্কে যে ধারা নির্লিপ্ততার আশ্রয় নেয়া হয়েছে তেমনি সম্রাট বাবুরের দ্বিতীয় স্ত্রী এবং সিংহাসনের উত্তরাধীকারীর (সম্রাট হুমায়ুন) মাতা মহম বেগম এবং মির্জা কামরান ও মির্জা আসকরীর মাতা গুলরুখ বেগমের বেলায়ও কোথাও কিছু বলা হয়নি।

এই তিন মহিলা সম্পর্কে গুলবদন বেগম একেবারে যে নির্লিপ্ত ছিলেন তা নয়, তবে যেহেতু এই তিন মহিলার গর্ভেই ইতিহাসের অন্যতম নায়ক মোগল শাহজাদাগণ জন্মলাভ করেছেন, তাদের বংশ পরিচয় ও অন্যান্য তথ্য বিশেষভাবে বর্ণনার দাবী রাখে বৈকি।

সম্রাট বাবুর তাঁর আত্মজীবনীতে প্রায়শঃ মহম বেগমের কথা উল্লেখ করেছেন। দরবারী রীতি মোতাবেক তাকে বেগম ডাকতেন। দিলদার বেগমের নাম 'তুজুকে বাবুরী'র তুর্কী সংস্করণে রয়েছে কিন্তু ফারসী সংস্করণে নেই। তুর্কী সংস্করণে তাকে 'আগাচা' বলা হয়েছে, কিন্তু বেগম বলা হয় নাই। স্বভাবতঃই মনে হয়, পারিবারিক ঐতিহ্যগতভাবে তিনি 'বেগম' খেতাব পাবার যোগ্য ছিলেন না।

অনুরূপভাবে সম্রাট বাবুর গুলরুখের নামও কোথাও উল্লেখ করেননি। তার মানে এই নয় যে, তিনি নিম্নবংশোদ্ভূত মহিলা ছিলেন।

অতএব, এই তিন মহিলা সম্পর্কে গুলবদন বেগম বা সম্রাট বাবুরের কোন স্বীকৃতি না থাকায় প্রতীয়মান হয় যে, এরা শাহজাদী ছিলেন না, তবে উচ্চ বংশোদ্ভূত ছিলেন।

তিনজন তৈমুর শাহজাদী সম্রাট বাবুরের শৈশব ও যৌবনে তার স্ত্রী ছিলেন। তন্মধ্যে আয়েশা নাম্নী শাহজাদী ১৫০৪ খ্রীস্টাব্দের পূর্বেই বাবুরের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেন। আয়েশার সাথে বাবুরের বৈবাহিক সম্পর্ক হয়েছিল বাবুরের পাঁচ

বছর বয়সে। দ্বিতীয় শাহজাদী জয়নব ১৫০৬ অথবা ১৫০৭ সালে মারা যান। তৃতীয় শাহজাদীর নাম ছিল মাসুমা। ১৫০৭ সালে বাবুরের সাথে তাঁর বিয়ে হয়েছিল এবং প্রথম সন্তানের জন্ম লগ্নে তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

সম্রাট হুমায়ুনের মাতা মহম বেগম-এর সাথে ১৫০৬ সালে খোরাসানে বাবুরের পরিণয় হয়। সম্ভবতঃ দিলদার বেগম ও গুলরুখ বেগমকে এর পরে বিয়ে করেন।

সম্রাট বাবুর আরো একটি বিবাহ করেছিলেন বলে ইতিহাসে উল্লেখ আছে, এবং তা হয়েছিল ১৫০৯ সালে। ইউসুফ জাই বাদশাহ বাবুরের কাছে আনুগত্য প্রকাশের নিমিত্ত তার এই কন্যাকে উৎসর্গ করেছিলেন।

এ সমুদয় বৃত্তান্ত মিসেস এনিটা বিউরেজ-এর। বাবুর নিজেও তার 'তুজুকে' একথা স্বীকার করেছেন যে, তিনি (ইউসুফ জাই) নিজেই এই অভিপ্রায় (বিয়ের) ব্যক্ত করেন। তবে এই ইউসুফ জাই বাদশাহ ছিলেন না, যিনি 'দুলহানকে' নিয়ে এসেছিলেন, তিনি ছিলেন তার ভাই। বাবুরের এই স্ত্রী 'আগাচা বিবি' মোবারেকার গর্ভে কোন সন্তানের জন্ম হয়নি। তবু রাজ পরিবারের সকলের কাছে তিনি ছিলেন সম্মানীয়া। ঐতিহাসিকরা একথা স্বীকার করেছেন।

গুলবদন বেগমের মায়ের গর্ভে পাঁচ সন্তানের জন্ম হয়েছিল। তন্মধ্যে দু'জন পুত্র ও তিনজন কন্যাসন্তান। প্রথমা কন্যার জন্ম হয়েছিল ১৫১১ থেকে ১৫১৫ সালের মাঝে। এ সময় বাবুর কাবুলের বাইরে 'খোস্ত' এলাকায় ছিলেন। প্রথমা কন্যার নাম ফুলের নামের সাথে সামঞ্জস্য রেখে গুলরং (ফুলের রং) নামকরণ করা হয়েছিল। এরপর জন্মলাভ করেন গুল চেহারা। গুল চেহারার পর আবু নসর হিন্দাল (১৫১৯ সালে) ও পরে গুলবদন বেগম জন্মলাভ করেন। সর্বশেষে দিলদার বেগমের গর্ভে জন্মলাভ করেছিলেন 'আলোয়ার'। এই শাহজাদা ১৫২৯ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

সম্রাট বাবুরের হিন্দুস্থান আক্রমণের দু'বছর পূর্বে গুলবদন বেগমের জন্ম হয়। ১৫২৫ সালে বাবুর ভারতের উদ্দেশ্যে সৈন্যসামন্ত নিয়ে রওনা হন এবং দের ইয়াকুবে এসে শিবির স্থাপন করেন।

গুলবদন এই শিশু বয়েসেই তাঁর মহান পিতার ভারত যাত্রার দৃশ্য অবলোকন করেছিলেন। হাজার হাজার সৈন্য সমভিব্যবহারে তাঁর সদৃপ্ত যাত্রার স্মৃতি তাঁর

মনে আঁকা হয়েছিল, আর 'হুমায়ুন নামার' রচনাকালে তিনি তার এই অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছেন সুনিপুণভাবে।

কাবুল ত্যাগের সময় সম্রাট বাবুর বিপুল সংখ্যক সৈন্য কাবুলে রেখে এসেছিলেন। অবশ্য মহিলা এবং শিশুদের এক বিরাট বাহিনী রাজপ্রাসাদকে সুশোভিত করে রেখেছিল। কাবুলের অবশিষ্ট এই সৈন্যদের কর্তৃত্ব প্রদান করা হয়েছিল মির্জা কামরানকে, শুধু তাই নয়, কাবুলের শাসনভারও ন্যস্ত করা হয়েছিল তার হাতে। অবশ্য কামরান এসময় অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছিলেন। এসময় মির্জা কামরানের বয়েস কত ছিল সঠিকভাবে বলা মুশকিল। কেননা, সম্রাট বাবুর তাঁর আত্মজীবনীতে তার বয়েসের কোন উল্লেখ করেননি। হয়ত এই আত্মজীবনীতে তার বয়েস সম্পর্কে কোন কিছু উল্লেখ ছিল, কিন্তু সে সব পৃষ্ঠা নষ্ট হয়ে গেছে এবং পরবর্তীকালে তা আর উদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই।

যা হোক, ১৭ই নভেম্বর সম্রাট বাবুর শেষ বারের মতো হিন্দুস্থান আক্রমণের জন্য শহর থেকে বের হন, তিনি বাগে অফাতে অবস্থান করছিলেন। এদিকে হুমায়ুন মির্জা ৩রা ডিসেম্বর সৈন্যসামন্ত নিয়ে পিতার সাথে মিলিত হয়েছিলেন। বাবুর তার আগমন প্রতীক্ষায় ছিলেন বহুদিন। তার আসতে এত দেরী হয়েছিল বলে বাবুর তাকে ভর্ৎসনা করেছিলেন। হুমায়ুন মির্জার বয়েস এ সময় মাত্র সতর বছর ছিল এবং তিনি ১৫২০ সাল থেকে বদখশানের গভর্নর ছিলেন।

এই বিপুল সংখ্যক সৈন্যবাহিনী নিয়ে সম্রাট বাবুর রওনা হয়ে সবে কাবুলের পূর্ব উপকণ্ঠের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন, এরই মধ্যে নানা দুঃসংবাদ কাবুলে পৌঁছতে শুরু করল। কেননা বাবুর এই যাত্রাতে তিন বার অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। অতিরিক্ত মদ্যপান এবং আফিম সেবনের দরুন তিনি এভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তিনি তাঁর এই অসুস্থতাকে খোদার পক্ষ থেকে একটা হুশিয়ারী মনে করলেন এবং তওবা করলেন। কিন্তু বাবুরের এই তওবা বহুবারই ভঙ্গ হয়েছে এবং প্রতিবারই তিনি খোদার কাছে ক্ষমা চেয়েছেন।

মিসেস এনিটা ঠিকই বলেছেন, বাবুরের এই অভ্যাস (অপরাধ এবং ক্ষমা প্রার্থনা) সত্যিকারভাবে সকলের কাছে তাকে পূজনীয় করে তুলেছে।

১৫২৬ সালের জানুয়ারীতে বাবুরের পক্ষ থেকে কাবুলবাসীদের উদ্দেশ্যে একটি সুসংবাদ এলো, আর তা হলো 'মালুত' দুর্গে বহু মূল্যবান গ্রন্থাবলী তার হস্তগত

হয়েছে। প্রাপ্ত এই গ্রন্থাবলীর কিছু তিনি মির্জা কামরানের জন্য প্রেরণ করেন আর বাদবাকী গ্রন্থসম্ভার জ্যেষ্ঠ পুত্র হুমায়ুনকে দান করেন। এসব গ্রন্থাবলী বেশ মূল্যবান ছিল বলে বাবুর তার মর্যাদা বুঝতে পেরেছিলেন। এই গ্রন্থাবলীর বেশীর ভাগ ছিল ধর্ম-বিষয়ক। তখনকার দিনে গ্রন্থাবলীর মূল্য যেমন বেশী ছিল, তেমনি ছিল দুষ্প্রাপ্যতা। এজন্যে সম্রাট বাবুর গুরুত্ব সহকারে এগুলো হস্তগত করেন।

২৬ শে ফেব্রুয়ারী মির্জা হুমায়ুন এমন এক মহান কর্ম সম্পাদন করলেন যা তাঁর মাতা মহম বেগম ও পিতা সম্রাট বাবুরকে যারপরনাই আনন্দিত করে। তাঁর জীবনে এই ছিল সর্বপ্রথম কীর্তি আর তা হলো 'হেসার ফিরোজা' বিজয়। সম্রাট বাবুর খুশী হয়ে 'হেসার ফিরোজা' ও তার উপকণ্ঠের সকল এলাকা মির্জা হুমায়ুনকে দান করেন এবং প্রচুর নগদ অর্থও প্রদান করেন।

এই সুসংবাদ সবে শাহ আবাদ থেকে কাবুলে প্রেরণ করা হয়েছে এবং সম্রাট বাবুর এই বিজয়ের পুরো রোয়েদাদ তাঁর আত্মজীবনীতে লিপিবদ্ধ করছিলেন, এ সময় আরো একটি ঘটনার সূত্রপাত হলো। তা হলো ঠিক তখনই মির্জা হুমায়ুন সাবালকতত্ব প্রাপ্ত হন এবং প্রথম বারের মতো তিনি দাড়ি কাটেন (অথবা ছাটেন)। বাবুর তার আত্মজীবনীতে এই ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, '১৫০৪ খ্রীস্টাব্দে পুত্র হুমায়ুন প্রথম বারের মতো দাড়ি কর্তন করে।'

প্রথম দাড়ি কর্তনের সময় তুর্কী সম্প্রদায়ের মাঝে উৎসব উদযাপনের প্রচলন রয়েছে। সম্রাট বাবুরের প্রথম দাড়ি কর্তনের ঘটনা মির্জা হুমায়ুন পিতার আত্ম-জীবনীতে ১৫৫৩-৫৪ সালে নিজের পক্ষ থেকে সন্নিবেশ করেন।

মির্জা হুমায়ুন যে ছোটখাট বিজয় লাভ করেছিলেন ১৫২৬ সালের ১১ই এপ্রিলের পানিপথের যুদ্ধে সৈন্যদের বীরত্বের কাছে তা ম্লান হয়ে গেল। এই যুদ্ধ আফগান বাদশাহ ইব্রাহিম লোদির সাথে সংঘটিত হয়েছিল।

এই বিরাট বিজয়ের খবর থলেতে ভর্তি করে দ্রুতগামী কাসেদ কাবুলের দিকে রওনা হল। বিজয়ের এক মাসের মধ্যে এই খবর কাবুলের শাহী মহলে পৌঁছল এবং মহলে অবস্থানরতা গুলবদন বেগম ও অন্যান্য শাহীমহিলাগণ প্রভূত আনন্দ লাভ করেন।

১১ই মে তারিখে সম্রাট বাবুর পাঁচ জন বাদশাহর সঞ্চিত ধনাগার একত্রিত

করে তিনি উদার হস্তে কৃতি সৈন্যদের, আমিরওমরাহ ও শাহজাদাদের মাঝে বণ্টন করেন। এই অর্থ বিতরণের সময়ে জ্ঞাতসারে কোন স্বজনকে বঞ্চিত করা হয় নাই। যারা কাছে ছিলেন না তাদের জন্যেও নানা উপঢৌকন প্রেরণ করা হয়েছিল। এমনকি, মক্কামদিনা কারবালা মোয়াল্লা এবং ইমাম রেজার মাজারকেও বাদ দেয়া হয়নি। কাবুলে যে নজরানা প্রেরণ করা হয়েছিল, তার কিছু না কিছু অংশ প্রতিটি শহরবাসী লাভ করেছিলেন।

এই গ্রন্থের রচয়িতা গুলবদন বেগম শুধু শাহী পরিবারের জন্য প্রেরিত উপঢৌকনের উল্লেখ করেছেন। গুলবদন বেগম সর্বাগ্রে বিশিষ্ট বেগমকুল ও মহিলাদের উল্লেখ করেছেন যাদের প্রসঙ্গ এই গ্রন্থে স্বাভাবিকভাবেই এসেছে।

সে মুহূর্ত ছিল বিশেষ চমকপ্রদ যখন হিন্দুস্থানের নানা উপঢৌকন ও নিদর্শনাদি বেগমদের খেদমতে পেশ করা হয়েছিল। এই নিদর্শনাদি যিনি (আমীর) কাবুলে নিয়ে এসেছিলেন তাকে বেশ অভ্যর্থনা জানানো হয়। তিনি ছিলেন সম্রাট বাবুরের বিশিষ্ট বন্ধু খাজা কাঁলা। তিনি বাবুরের কাছে এই অজুহাত পেশ করে কাবুল চলে এসেছিলেন যে, হিন্দুস্থানের আবহাওয়া তার স্বাস্থ্যের জন্যে অনুকূল নহে। এখানে এসে তার অনেক স্বাস্থ্যহানি হয়েছে।

এসময় প্রচলিত রীতি অনুযায়ী খাজা কাঁলা বেগমদের কাছে এই মহান বিজয়ের বিস্তারিত ঘটনা এমনভাবে রসিয়ে রসিয়ে ব্যক্ত করেন যে, বলতে বলতে দিন শেষে রাত হয়ে এলো। মনে হয়, এ সময় তুর্কী ললনাদের মাঝে তেমন পর্দা-প্রথা বিদ্যমান ছিল না। অবশ্য পরে হিন্দুস্থানে এসে তারা পর্দা-রীতি পালন করেন। অবশ্য তারা 'নেকাব' পরেছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু মিসেস এনিটা বলেন, নেকাব পরিহিত অবস্থায় বেগমগণ দর্শনার্থীদের স্বাগত জানাতেন এবং তাদের সাথে খোলাখুলি কথাবার্তা বলতেন।

গুলবদনের বর্ণনা মতে, পিতা বাবুর বাদশাহ যখন এই উপঢৌকন প্রেরণ করেন সঙ্গে একটি তালিকাও দিয়েছিলেন, যাতে করে তালিকা দৃষ্টে সকলের মাঝে উপঢৌকন বণ্টন করা যায়। প্রত্যেকে যা কিছু পেয়েছিলেন তা বাবুর বাদশাহ্র পক্ষ থেকেই নির্ধারণ করা ছিল।

গুলবদন বেগম বলেন, বাদশাহ হীরাজহরত গহনা উপঢৌকনের (বণ্টনের) বেলায়ও এই বৈশিষ্ট্য বজায় রাখেন। নৃত্যপটিয়সী প্রেরণের বেলায়ও তার বণ্টন নির্ধারণ করেন। নৃত্যশিল্পী মেয়েদেরকে শুধুমাত্র বিশিষ্ট বেগমদের

দান করা হয়। যদিও এরা হিন্দুস্থানের দক্ষ নৃত্যশিল্পী এবং এই দেশের সংস্কৃতির নিদর্শন হিসাবে পরিগণিত কিন্তু গুলবদন একথা উল্লেখ করেননি যে, এই নৃত্য পটিয়সীদেরকে বেগমদের খেদমতে পেশ করার পর তারা তাদের নৃত্যকলা প্রদর্শন করেছিলো কি না।

অবিশ্যি গুলবদন বেগম তাদের নাচতে দেখেছিলেন এবং তিনি তা উপভোগ করেছিলেন, যেমন বাবুর আগ্রাতে একবার তার পুরনো ভৃত্য 'আসিস'-এর সাথে (উপভোগ) করেছিলেন।

এখানে এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বাবুর বাদশাহ এই উপঢৌকন প্রেরণের সময় বেগমকুল ও অন্যান্য সম্মানিতা মহিলাদের প্রতি এই শর্ত আরোপ করেছিলেন যে, তারা যেন সকলে (উপঢৌকন গ্রহণের পূর্বে) দরবার হলের বাগানে একত্রিত হন এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত সম্রাট বাবুরের এই বিজয়ের জন্য যেন শোকরানা নামাজ সম্পন্ন করেন। তাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল তারা যেন মিছিল করে এই বাগানে গমন করেন এবং সেখানে কিছুকাল অবস্থানও করেন।

মিসেস এনিটা বলেন, এই নির্দেশ দেয়ার সময় বাবুর সম্ভবতঃ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলেন। কেননা (সকলকে নিয়ে) কোথাও সফর করার বেজায় শখ তাঁর। কিন্তু তিনি এযাত্রা এদের সাথে অংশ গ্রহণ করতে পারলেন না।

মিছিল করে এই বাগানে গমনের সময় নিঃসন্দেহে গুলবদন বেগমও তাদের সাথে ছিলেন এবং তিনিও ছোট শিশু হিসাবে সকলের সাথে শোকরানা নামাজে অংশ গ্রহণ করেন। আর সম্রাট বাবুর সুদূর ভারতে বসে তার মানস চক্ষু দিয়ে অবলোকন করেছিলেন শিশু গুলবদন-এর শিশু সুলভ সেজদা পর্ব।

সম্রাট বাবুরের এই উক্তি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ যে. প্রকৃতপক্ষে স্বদেশে ফিরে আসার জন্য তাঁর মন সদা আনচান করছিল। কিন্তু তিনি এ ব্যাপারে ধৈর্য প্রদর্শন করেন এবং যুদ্ধ পরিচালনা অব্যাহত রাখেন। হিন্দুস্থানের আবহাওয়া বাবুরের স্বাস্থ্যের পক্ষে মোটেই অনুকূল ছিল না। দলের অন্যান্যরাও এই অজুহাতে ভারত ত্যাগের ফিকিরে ছিল। ইতিপূর্বে বাবুরের বিশিষ্ট বন্ধু খাজা কালা এ দেশ ত্যাগ করেছেন। এমনকি মির্জা হুমায়ুন ও অন্যান্য

ঘনিষ্ঠ লোকজনও খাজা কাঁলার পদাংক অনুসরণের চিন্তা করছিলেন। কিন্তু বাবুর সবরকম দুঃখ কষ্টকে উপেক্ষা করে সেখানে টিকে থাকার চেষ্টা করেন। নিজের দেশের প্রতি তাঁর টান এত বেড়ে গিয়েছিল যে, কাবুল থেকে যখন তাঁর জন্যে ফল পাঠানো হলো তা দেখে তিনি কেঁদে ফেলেছিলেন।

কাজের অদম্য নেশা এবং বড় হওয়ার একাগ্র আকাঙ্ক্ষা তাকে তার নির্দিষ্ট কাজে সদা সক্রিয় রেখেছিল এটা বাবুরের এক বিশেষ উচ্চাভিলাষ ছিল যা হাজার হাজার বছরের ইতিহাসকে পাল্টে দিয়েছিল এবং পত্তন করেছিল এক বিরাট নতুন সাম্রাজ্য।

সম্রাট বাবুর ভারত অভিযানে রওনা হবার সময় গুলবদন বেগমের বয়েস ছিল দু' বছর। রওনা হবার পুর্বেই মির্জা হুমায়ুনের মাতা মহম বেগম দিলদার বেগমের কাছ থেকে গুলবদনকে নিয়ে নিজের মেয়ে হিসাবে প্রতিপালন করতে থাকেন এবং শিক্ষাদীক্ষা দিতে থাকেন।

মহম বেগম শাহী পরিবারের সবচাইতে বড় (সম্মানিতা) মহিলা ছিলেন। সম্রাট বাবুরের উত্তরাধিকারীর (হুমায়ুন) মাতা হবার সুবাদে বাবুরের ছোট সন্তানদের চরিত্র গঠন ও প্রতিপালনের সম্পূর্ণ অধিকার ছিল তাঁর। এই অধিকারের সুবাদে প্রথমতঃ তিনি হিন্দালকে নিজের সন্তান বলে গ্রহণ করে-ছিলেন। এরপর গ্রহণ করলেন গুলবদন বেগমকে। এর কারণ হয়ত এই যে, হুমায়ুন মির্জার জন্মের পর মহম বেগমের গর্ভে আরো চারটি সন্তানের জন্ম হয়েছিল, কিন্তু ১৫১৯ সালের মধ্যে এই নবজাত শিশুরা মৃত্যবরণ করে। এদের মধ্যে তিনজন মেয়ে ও একজন পুত্র সন্তান ছিল। এঁরা জন্মের কিছুদিন পর পরই মারা যান।

মিসেস এনিটার মতে, পর পর বেশ ক'জন সন্তানের অকাল মৃত্যুতে মহম বেগমের সন্তানের মমতা ও বাৎসল্য বিকশিত হয় চরমভাবে। তাছাড়া মহম বেগম ও বাবুরের পারস্পরিক মধ্যকার ভালবাসার সম্পর্ক ছিল খুবই গভীর। এজন্যে বাবুরের ঔরসজাত (অন্য স্ত্রীদের গর্ভজাত) অন্যান্য সন্তানদের প্রতিপালন করে বাবুরের প্রতি অনাবিল ভালবাসার প্রকাশই ছিল এই রীতির প্রধান লক্ষ্য।

বাদশাহ বাবুর তাঁর আত্মজীবনীতে এ ধরনের একাধিক উদাহরণ পেশ করেছেন যে, কোন বড় নিঃসন্তান মহিলা সন্তানপ্রেম নিবৃত্তির জন্য গোলাম অথবা বাঁদীকে

নিজের সন্তান হিসাবে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু মহম বেগমের অন্য সন্তানপ্রীতি অবশ্য পুরোপুরি এ ধরনের নয়।

১৫১৯ সালে হিন্দালকে যখন তিনি নিজের পুত্র হিসাবে গ্রহণ করলেন তখন বাবুর কাবুলে ছিলেন না। তিনি তখন সোয়াত এবং বিজুর অভিযানে রওনা হয়েছিলেন এবং যখন বিবি মোবারেকা ইউসুফজাই হেরেমে পরিচিত হন।

পঁচিশে জানুয়ারী বাবুরের কাছে মহম বেগম চিঠি লেখেন। তাতে নিবেদন করে বলা হয়েছিল যে যে কথা পূর্বে মৌখিকভাবে সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, আসন্ন প্রসবা দিলদার বেগমের গর্ভে যে সন্তান হবে তা যেন তাকে দিয়ে দেয়া হয় এবং তার পূর্বে তিনি (বাবুর) যেন 'ফালনামা' প্রক্রিয়ায় জানার চেষ্টা করেন যে, এই সন্তান ছেলে হবে, না মেয়ে।

এটা অবিশ্যি জানা যায়নি যে, বাদশাহ বাবুর নিজেই 'ফাল' অনুশীলন করেছিলেন, না কোন শিবিরের কোন মহিলা তা করেছিলেন। যাহোক বাবুর 'ফাল' অনুশীলন সম্পর্কে বলেন যে, যথা সময়ে 'ফাল' প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যটি মহম বেগমকে জানিয়ে দেয়া হলো যে, দিলদার বেগমের গর্ভে পুত্র সন্তান জন্মলাভ করবে।

'ফাল' প্রক্রিয়ার পদ্ধতি অনেকটা এ ধরনের। বেশ সোজা। কাগজের দুটি টুকরা করে একটাতে ছেলে এবং অপরটাতে মেয়ে লেখা হয়। অতঃপর তা পানিতে ছেড়ে দেয়া হয়, প্রথম যে কাগজটি পানিতে আগে সাতার কাটতে শুরু করে সেটাকেই সঠিক বলে ধরে নেয়া হয়।

ছাব্বিশ তারিখে বাবুর 'ফালের' বিবরণ মহম বেগমকে লিখে জানান এবং ঘোষণা করেন যে, এই সন্তান মহম বেগমকে দেয়া হবে।

মার্চের চার তারিখে দিলদার বেগমের গর্ভে পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে এবং নাম রাখা হয় আবু নসর। কিন্তু পরে হিন্দাল নামে পরিচিত হন এবং ইতি-হাসেও এই নামে চিহ্নিত হন।

সম্রাট বাবুর তাঁর আত্মজীবনীতে হিন্দাল নামকরণের পটভূমিকা ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, বাবুর যখন সফরে (যুদ্ধাভিযানে) ছিলেন তখন হিন্দালের জন্ম হয়। যেহেতু তখন তিনি হিন্দুস্থান আক্রমণের অভিপ্রায়ে রওনা হয়েছিলেন এজন্যে 'হিন্দাল' নামকরণ করেছেন। এই নামটি বাবুর 'ফাল'-এর মাধ্যমে গ্রহণ করেন।

হিন্দালের জন্মের তিনদিন পর দিলদার বেগম ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, স্বীয় সন্তানকে সপত্নী মহম বেগমের কাছে ন্যস্ত করেন।

মিসেস এনিটা বলেন, এটাতো সুস্পষ্ট যে, দিলদার বেগম তার সন্তান দিতে রাজী হননি। যদিও গর্ভজাত সন্তানের সাথে এটা তার পুরোপরি বিচ্ছেদ ছিল না। কেননা, মহম বেগম এবং দিলদার বেগম একই মহলের বাসিন্দা। প্রকৃত মা এবং পালক মায়ের পরিবেশ ছিল একই। তা সত্ত্বেও নিজের সন্তানকে সপত্নীর হাতে তুলে দেয়া তার পক্ষে কষ্টকর ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে দিলদার বেগমের কাছে হিন্দাল ছাড়াও দুটি বড় মেয়ে ছিল।

এর চার বছর অবধি দিলদার বেগমের আর কোন সন্তান হয়নি। পঞ্চম বছরে জন্ম লাভ করলেন গুলবদন বেগম। তিনি দু'বছর নিজের মায়ের কাছেই থাকলেন। দু'বছর পর তাঁর গর্ভে যখন 'আলোয়ার মির্জা' জন্মলাভ করে তখন গুলবদন বেগমকে মহম বেগমের কাছে ন্যস্ত করা হয়।

বাবুর কাবুল থেকে হিন্দুস্থান আসার পর প্রায় তিন বছর স্ত্রী-পরিজনদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন।

১৫২৬ সালের ২রা আগস্ট মহম বেগম-এর গর্ভে এক পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। তার নাম রাখা হয়েছিল ফারুক। কিন্তু শৈশবেই এ শিশু মায়ের কোল খালি করে চলে যায়। বাবুর এই ছেলেকে দেখতে পারেননি। কেননা তিনি তখন আগ্রাতে ছিলেন।

এই ছেলের জন্মের কিছুকাল পরই বাবুর বাদশাহকে ইব্রাহিম লোদির মাতা বিষ খাইয়ে দেন। এই খবর কাবুলে দারুণ উত্তেজনা ও শোকের খবর হিসাবে পৌঁছে।

বাবুর তাঁর এই দুঃসংবাদ কাবুলে এমন সময় প্রেরণ করেন যখন তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছেন। বাবুর যেহেতু এই ঘটনার আনুপূর্বিক সকল বৃত্তান্ত তাঁর চিঠিতে ব্যক্ত করেছিলেন, এজন্যে গুলবদন বেগমও তার লেখায় পুরো ঘটনা লিপিবদ্ধ করতে সমর্থ হয়েছেন।

এই মহিলা ছিল দুর্ভাগা। তার এই বিষ প্রয়োগের পরিকল্পনা যখন ব্যর্থ হলো, বাবুর তার সমুদয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন। দুজন পরিষদ পাঠিয়ে তিনি তার সব কিছুর তল্লাসী নিলেন এবং কিছু সৈন্যকে নির্দেশ দিলেন তাকে কাবুল পৌঁছে দেয়ার জন্য।

এই কুখ্যাত মহিলা নিজের পরিণাম সম্পর্কে এতখানি ভীত হয়ে পড়েছিল যে, তাকে নিয়ে একটি কাফেলা যখন সিন্ধু নদ অতিক্রম করছিল, হঠাৎ সে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে যায়।

এই দুর্ঘটনার তিনমাস পর কাবুলের সম্রাট পরিবারে আরো একটি বিজয়ের সুসংবাদ পৌঁছে। এই বিজয় সূচিত হয়েছিল 'রানা সঙ্গ'-এর বিরুদ্ধে। রানা সঙ্গের পতাকাতলে ১৫২৭ সালের ১৩ই মার্চ হিন্দুস্থানের সকল রাজপুত সম্প্রদায় একত্রিত হয়েছিল। এই যুদ্ধ মুসলমানদের সাথে সংঘটিত ভারতীয়দের একটি অন্যতম প্রচণ্ড যুদ্ধ বলে পরিগণিত।

তুজুকে বাবুরী এবং হুমায়ুন নামায় এই বিবরণ পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তবে এটা বলা প্রয়োজন যে, এই যুদ্ধে সারিবন্দী অগণিত রাজপুত বাহিনী দেখে বাবুরের দলের অনেকে ঘাবড়ে গিয়েছিল এবং তারা যে এই যুদ্ধে জয়ী হবে তা দুরাশা ছিল। বাবুর মদ, জুয়া ইত্যাদি পরিত্যাগ করেন এবং তওবা করেন। তাঁর পদাংক অনুসরণ করেন অন্যান্য আমীর-ওমরাহগণ। মদের যত মটকা ছিল তা ভেঙ্গে ফেলা হলো এবং মদের স্রোত বয়ে গেল পথে ঘাটে।

বাবুর বাদশাহ শুধু যে মদের মটকা ভেঙ্গে ফেলেছেন তা নয়, মদ রাখার স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত সোরাহী, পানপাত্র (জাম) ভেঙ্গেচুড়ে ফকির ও অভাবগ্রস্তদের মাঝে বণ্টন করে দেন এবং খোদার কাছে আজানু নত হয়ে সকল অতীত পাপাচারের ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এই ক্ষমা প্রার্থনার প্রতিক্রিয়া তার মনে যে আত্ম-প্রত্যয়ের জন্ম দেয়, তার বলেই তিনি রাজপুতদের শোচনীয়-ভাবে পরাজিত করতে সমর্থ হন।

মিসেস এনিটা বলেন, এই বিজয়ের পর সম্রাট বাবুরের সৈন্যবাহিনীর মাঝে অসন্তোষ দেখা দেয়। তারা দেশে ফিরে যাবার জন্যে ইচ্ছা পোষণ করছিল। হিন্দুস্থানের আবহাওয়া তাদের মোটেই সহ্য হচ্ছিল না। বিশেষতঃ হুমায়ুনের সাথে সম্পৃক্ত যেসব বদখশানী সৈন্যরা একাধিক্রমে এক দু'মাস রণাঙ্গণে যুদ্ধ করতে পারে এবং যারা প্রায় ষোল মাস হলো কাবুল থেকে এসেছে, কাবুলে ফিরে যাবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠল। বাদশাহ বাবুর যুদ্ধ শেষে তাদের ছুটি দেবেন এই অঙ্গীকার করেও তাদের আটকে রেখেছেন।

বলা হয়েছিল, যুদ্ধের পর সৈন্যদের আর আটকে রাখা হবে না। যারা যেতে চাইবে তাদের স্বচ্ছন্দে যেতে দেয়া হবে।

কতিপয় আমীর-ওমরাহও হিন্দুস্থানে থাকার ব্যাপারে সম্পূর্ণ ভিন্ন মনোভাব পোষণ করতো। তারা এক দণ্ডও আর এখানে থাকতে চাইতো না। আর এ ব্যাপারে সৈন্যরা তো আরো এক পদ অগ্রসর ছিল।

পূর্বে বলা হয়েছে, বাবুরের বিশেষ বন্ধু খাজা কাঁলা হিন্দুস্থানে থাকার ব্যাপারে বাবুরের কোন প্রস্তাবই গ্রহণ করেননি। এ ব্যাপারে বাবুর একটা পরামর্শ সভা বসিয়েছিলেন। বাবুর আত্মজীবনীতে বলেন, 'আমি পরামর্শ-সভার উপস্থিত লোকজনদের বলেছিলাম, যেমন সমরাস্ত্র এবং সৈন্য সামন্ত ছাড়া যুদ্ধ জয় করা সম্ভব হয় না, তেমনি রাজত্ব এবং কর্তৃত্বের নিশ্চয়তা অধিকৃত রাজ্যসমূহের লোকদের পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাস ছাড়া সম্ভব নয়। আমি কয়েক বছরের শ্রম, সীমাহীন সংগ্রাম, দুর্গম পথ অতিক্রম, বিভিন্ন খণ্ডযুদ্ধ করে এবং আমার সৈন্যদের চরম দুর্বিপাকে নিপতিত করে এক চরম রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর আল্লাহ্‌র অশেষ মেহেরবানীতে আমার শত্রু ইব্রাহিম লোদিকে নস্যাত করে হিন্দুস্থানের বিভিন্ন রাজ্য জয় করেছি। এখন এটা কেমন ধরনের বিপদ এলো যে, এতো সংগ্রাম-সাধনার পর গন্তব্যে পৌঁছে আমরা আমাদের বিজিত এলাকা ছেড়ে অকৃতকার্য লোকদের মতো সোজা নিজের দেশে চলে যাব। পরাজিতদের মতো আমরা কেন এধারা মনোবৃত্তি রাখব। অতএব আমার মতে, আজ থেকে যিনি আমার হিতাকাঙ্ক্ষী এবং বন্ধু হবেন তিনি এ ধরনের কোন প্রস্তাব আর উত্থাপন করবেন না। তবে আপনাদের মধ্যে যিনি একেবারেই এখানে থাকতে অসম্মত তিনি আমাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারেন।'

এতদ্‌সত্ত্বেও বাদশাহ বাবুর এবং তাঁর আমীর-ওমরাহগণ এব্যাপারে সৈন্যদের নিশ্চয়তা দানের চেষ্টা করেন যে, রানা সঙ্গের যুদ্ধের পর যিনি দেশে ফিরে যেতে চাইবেন তাকে আর কোনক্রমেই বাধা দেয়া হবে না। রানা সঙ্গের যুদ্ধের সমাপ্তির পর সৈন্যদেরকে পূর্বপ্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দেশে ফিরে যাবার অনুমতি দানের সময় এসে গেল।

কিন্তু বাদশাহ বাবুর তাঁর আত্মজীবনীতে একথা বিস্তারিতভাবে বলেন নি যে এরপর কারা দেশে (কাবুল) চলে গিয়েছিল। তবে এতটুকু বলা হয়েছে

যে, হুমায়ুন তার বদখশানী সৈন্য সমভিব্যহারে কাবুলে রওনা হয়ে যান। খানজাদার স্বামী মেহদী খাজাও অনুমতি পেয়েছিলেন বলে উল্লেখ আছে।

মির্জা হুমায়ুন ১৫২৭ সালের ১৩ই এপ্রিল পিতার কাছ থেকে বিদায় নেন। তিনি প্রথমে দিল্লী আসেন এবং কোষাগারের দ্বার ভেঙ্গে যত ইচ্ছা ধনরত্ন তুলে নেন।

যদি তার সত্যি কোন অর্থাভাব হতো, বা সৈন্যদের বেতনাদি বাকী থাকতো তাহলে সহজভাবেই টাকা পয়সা পেতে পারতেন। কিন্তু তার এই তৎপরতা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। তা অনেকটা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু সম্প্রতি বাদশাহ বাবুর তাকে প্রচুর টাকা পয়সা দিয়েছিলেন। তাছাড়া গোয়ালিয়রের রাণী তার ইজ্জতসম্ভ্রম বাঁচানোর জন্যে তাকে মহামূল্য একটি হিরকখণ্ড দিয়েছেন। সম্ভবতঃ তা ছিল 'কোহিনুর'।

সম্রাট বাবুর এই দুর্ঘটনার খবর পেয়ে তাঁকে চরম ভাষায় ভৎ´সনা করেন এবং বকাঝকা করেন।

যাহোক, এরপর মির্জা হুমায়ুন বদখশানের দিকে রওনা হন। তারপর তাঁর সম্পকে খবর পাওয়া যায় ১৫২৮ সালের শীত ঋতুতে। এ সময় হুমায়ুন তার প্রথম পুত্র 'আল আমান'-এর নাম ঘোষণা করেন। 'আল আমান' তার স্ত্রী বেগা (হাজী) বেগমের গর্ভজাত সন্তান। চুসার যুদ্ধের সময় হুমায়ুন তাকে (বেগা) পেছনে ফেলে এসেছিলেন এবং শেরশাহ সুরী তাকে বন্দী করেছিলেন।

আল আমানের জন্মের সাথে সাথে' কাবুলের শাহীমহল থেকে আরো একটি সুসংবাদ ছড়িয়ে পড়ল, আর তা হলো কামরান মির্জার বিবাহ। সুলতান আলী বেগচকের কন্যার সাথে কামরানের বিবাহ সম্পন্ন হয়।

বাবুর এ খবর শুনে শাহজাদাকে মোবারকবাদ জানিয়ে কিছু উপঢৌকন প্রেরণ করেন। হুমায়ুনকে বন্ধ খামে একটা চিঠিও প্রেরণ করেন। তাতে তিনি প্রিয়তম পুত্রের পূর্ব অপরাধসমূহের উল্লেখ করেন এবং পিতৃসুলভ শুভাশীষও জ্ঞাপন করেন। বাবুর এ পত্রে হুমায়ুনের পুত্রের নামকরণ সম্পর্কে আপত্তি তোলেন এবং অন্যান্য দোষত্রুটির পুনরুল্লেখ করেন। তিনি তাঁর (হুমায়ুন) অসুন্দর হস্তাক্ষর এবং বানানের ত্রুটি উল্লেখ করে বলেন, 'তুমি

মোটেই ভাল লিখিয়ে নও। তুমি তোমার কাজে অধিকন্তু অকৃতকার্য হও এজন্যে যে, তুমি খুব বেশী মুনাফালোভী এবং প্রয়োজনাতিরিক্ত উচ্চাভিলাষী। ভবিষ্যতে ভাবনা চিন্তা করে চলাফিরা করো। যা কিছু লিখো পরিষ্কার এবং সহজ করে লিখো। সহজ এবং স্পষ্ট করে লেখা যে লেখে তার জন্যে যেমন সহজ কাজ, তেমনি যে পড়ে তার জন্যেও বেশ সহজপাঠ্য হয়।'

সম্রাট বাবুর পুত্র মির্জা কামরানের ব্যাপারেও বিশেষ আন্তরিকতা প্রদর্শন করেন। তবে খুবই নিস্তেজ ভাষায় তাকে একজন আদর্শ এবং যোগ্য শাহজাদা বলে উল্লেখ করেন। বাবুর কোনদিনই আশংকা করেননি যে, এমন দিনও আসবে যেদিন হুমায়ুন মির্জা কামরানের মুখাপেক্ষী হবেন।

বাবুর মির্জা হুমায়ুনকে যে সব উপদেশ দান করেছিলেন তন্মধ্যে খাজা কাঁলা ও কোলাবের মুসলমান বক্তাকে (ধর্মীয় প্রবক্তা) সুনজরে দেখার আদেশও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু হুমায়ুন মির্জা এই উপদেশ ভুলে যান এবং খাজা কাঁলার প্রতি কোন সুদৃষ্টি রাখেন নি। এজন্যে বাবুর-এর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই খাজা কাঁলা মির্জা কামরানের সাথে এসে যোগ দেন। অবশ্য সুলতানে ওয়ায়েজ কাবচাক মোগলের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখেন এবং মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তার কন্যা খুররমের কাছে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ থাকেন।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে তৃতীয় শাহজাদা মির্জা আসকারী সম্পর্কেও কিছু আলোকপাত করা যাক। মির্জা আসকারী মির্জা কামরানের সহোদর ভাই ছিলেন।

সম্রাট বাবুর তাঁর আত্মজীবনীতে মির্জা কামরান বা আসকারীর জন্মবৃত্তান্ত কিছুই বলেন নি। সম্ভবতঃ 'তুজুকে বাবুরীর' যে সব পৃষ্ঠা বিনষ্ট হয়ে গেছে, সেগুলোতে এ ব্যাপারে উল্লেখ ছিল।

মির্জা আসকারী ১৫১৬ খ্রীস্টাব্দে (৯২২ হিজরী) জন্মলাভ করেন। তার জন্মের সময় ঝড়ের তাণ্ডব ছিল। শিবিরে দিনযাপন করছিল সকলে।

বর্তমান 'তুজুকে' মির্জা আসকারীর প্রসঙ্গ এসেছে কাবুলে প্রেরিত বাদশাহ বাবুরের উপঢৌকন বিতরণের সময়। প্রেরিত উপঢৌকনের জন্য যে তালিকা প্রণয়ন করা হয় তাতে মির্জা হিন্দালের পরই মির্জা আসকারীর নাম লেখা হয়েছিল। এদের দুজনের বয়েস ছিল তখন যথাক্রমে নয় বছর এবং সাত

বছর। বাবুর প্রেরিত এই উপঢৌকনে মির্জা আসকারীর জন্যে শুধু নানা দ্রব্যাদি ছিল, কোন টাকাকড়ি বা ধনরত্ন ছিল না; তবে অন্যান্য জ্যেষ্ঠ শাহজাদাদের টাকা কড়ি বা অর্থ দেয়া হয়েছিল এই উপঢৌকনের সাথে।

১৫২৮ সালে মির্জা আসকারী মুলতানে ছিলেন। কিন্তু মুলতানে তার অবস্থানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে 'তুজুকে' বিস্তারিত কিছু বলা হয়নি। তবে বিনষ্ট-প্রাপ্ত তুজুকের অংশে সম্ভবতঃ এ সম্পর্কে বিস্তারিত বলা হয়েছিল।

পরবর্তী সময়ে শাহী পরিবারের রীতি অনুযায়ী সম্রাট বাবুর তাকে একাকী তাঁর সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্যদান করেন। আসকারী তাঁর পিতার সাথে ২রা ডিসেম্বর পর্যন্ত অবস্থান করেন, অতঃপর তাকে যুদ্ধ প্রশিক্ষণ ও সমরাস্ত্রসহ পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলোর রণাঙ্গণে প্রেরণ করা হয়। তার সহগামী আমীর-ওমরাহদের এই মর্মে নির্দেশ দেয়া হয় যে, সমস্যাবলী নিরসনের ব্যাপারে তার সাথে যেন শলাপরামর্শ করা হয়। বলা বাহুল্য, এ সময় আসকারীর বয়েস ছিল সবে বার বছর।

এ সময় যুদ্ধ পরিচালনার জন্য খুব বেশী বয়েসের প্রয়োজন হতো না। উদাহরণস্বরূপ, হুমায়য়ুনকে যখন বদখশানে প্রেরণ করা হয় তখন তার বয়েস ছিল মাত্র এগার বছর। স্বয়ং বাবুর যখন ক্ষমতাশীন হন এবং সৈন্য পরিচালনা করেন তখন তাঁরও বয়েস ছিল মাত্র বার বছর।

১২ই ডিসেম্বর বালক মির্জা আসকারীকে আরো কিছু উপঢৌকন ও দ্রব্যাদি প্রদান করা হয়। তন্মধ্যে একটি কারুকার্য খচিত খন্দর, একটি নকশা করা কোমরবন্দ, একটি রাজকীয় খেলাত, নাকাড়া সমেত একটি আলম, সুসজ্জিত ঘোড়া, দশটি হাতী, খচ্চর, উঠ এবং শাহী শিবির পত্তনের সমুদয় উপকরণ ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া বাদশাহ্দের মতো দরবার অনুষ্ঠানের এবং রাজ্যের দরবার হলে ক্ষমতাসীন হিসাবে সাধারণ সভা পত্তনের অনুমতিও প্রদান করা হয়েছিল।

মিসেস এনিটা বলেন, এক বালক শাহজাদার জন্য ঘোড়া তো মানান বটে, তবে হাতীর সারির পাশ দিয়ে যখন সে পর্যবেক্ষণ করে হেটে যাচ্ছিল, নিশ্চয়ই একটা বেমানান দৃশ্যের সৃষ্টি হয়েছিল বৈকি।

মির্জা আসকারী ২১ শে ডিসেম্বর যখন পিতার কাছ থেকে বিদায় নেন বাবুর

তখন হামামখানায় ছিলেন। তুজুকে বাবুরীতে এছাড়া আসকারী সম্পর্কে আর কিছু তথ্য পাওয়া যায় না।

এর পরবর্তীকালে মির্জা আসকারী তার নিজের ভাইয়ের পদাংক অনুসরণ করে চলেন এবং নিজের সহোদর ভাইয়ের সাথে পুরোপুরি বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করেন।

তাঁর এই প্রবণতা তাকে উত্তরোত্তর তৈমুর বংশের বৈরী করে তোলে। নিজের জন্য সে কোন পথ খুঁজে বের করতে পারলো না। তিনি এই স্বভাবসিদ্ধ পথেই চলতে লাগলেন—যা কিনা ছিল মির্জা কামরানের লক্ষ্যের সাথে সাদৃশ্য পূর্ণ। মির্জা আসকারী সম্পর্কে অন্যান্য তথ্য আরো পরে পেশ করা হবে। এখানে এতটুকু বুঝে নিন যে, মির্জা হিন্দালকেও সম্রাট বাবুর নিজের আগ্রহের কেন্দ্র-বিন্দু বানিয়ে নিয়েছিলেন। উদাহরণস্বরূপ ১৫২৮ সালে সম্রাট বাবুর আগ্রা থেকে যেসব উপঢৌকন পাঠিয়েছিলেন তন্মধ্যে (হিন্দালের জন্য) ছিল সুবর্ণ কলম, মোতির কারুকার্য সম্পন্ন একটি তেপায়া। প্রেরিত উপঢৌকনের মাঝে সবচাইতে দামী বস্তু ছিল বাবুরের নিজস্ব ব্যবহৃত একটি 'আবা' (পরিচ্ছদ বিশেষ)। কিন্তু এটি হিন্দালের গায়ে খাটো হলো। এ সময় হিন্দালের বয়েস ছিল দশ বছর এবং মহম বেগমের পরম আদরের সন্তান বলে চিহ্নিত।

এ বছরেই বাদশাহ্ বাবুরের এক ফরমান কাবুলে পৌঁছল। শাহী পরিবারের সকল বেগম, শাহজাদা, শাহজাদীকে নির্দেশ দেয়া হলো সকলে যেন কাবুল থেকে আগ্রা চলে আসে।

তাঁর এই নির্দেশ কার্যকরী হতে বেশ দেরী হলো। যেহেতু মহিলাদের সংখ্যা ছিল অনেক এবং যাবার ব্যাপারে নানা সমস্যাদি ছিল। কিছু সংখ্যক মহিলা ছিলেন যারা দেশত্যাগের মোটেই পক্ষপাতী ছিলেন না। তাদের মতে, কাবুলে অবস্থান তাদের খানদানী উদ্দেশ্যের জন্যে বিশেষ সহায়ক।

বাদশাহ বাবুর তাদেরকে চলে আসার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন এজন্যে যে, বাবুরের প্রতি তাদের ভালবাসা ছিল অপরিসীম, তাঁর নির্দেশ তারা অমান্য করতে পারবে না। দ্বিতীয়তঃ, কিছুটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও ছিল এর পেছনে। কেননা, এসময় কাবুল নগরী তৈমুরী শাহজাদীদের দ্বারাই পূর্ণ ছিল। এই শাহজাদীদের আশাআকাঙ্ক্ষা ও দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ভিন্নতর। তাছাড়া, কামরান মির্জা এবং তার শাসনচক্রের দাপটে তারা হাকিয়ে উঠেছিল। কেননা, কামরান

মির্জা যে মায়ের পেটে জন্মগ্রহণ করেছেন তিনি এসব বনেদী মহিলাদের সমকক্ষ ছিলেন না।

কাবুলের এই পরিস্থিতি সম্পর্কে খাজা কালা এক পত্রে বাবুরকে (৬ই ফেব্রুয়ারীতে) আদ্যপান্ত অবহিত করেন।

যে ব্যক্তি এই পত্র নিয়ে বাবুরের কাছে পৌঁছেন, মৌখিকভাবেও তিনি এখানকার পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেন। এই পত্রের জবাবে বাদশাহ বাবুর ১১ই ফেব্রুয়ারী এক গুরুত্বপূর্ণ পত্র লেখেন। এই পত্র কিছুটা সামগ্রিক এবং রাজনৈতিক সমস্যাবলী নিয়ে লিখিত। চিঠিতে তিনি বলেন,

"কাবুলের গোলেমেলে সমস্যাবলী নিরসনের ব্যাপারে বিশেষ মনযোগ দাও। আমি এ ব্যাপারে প্রচুর চিন্তাভাবনা করেছি এবং স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, যেখানে ৭।৮ জন লোকই কর্তৃত্ব করার জন্যে আসন জাঁকিয়ে বসেছেন। সেখানকার নিয়ম-শৃংখলার আশা দুরাশা মাত্র। এজন্যে আমি আমার বোনদের এবং পরিবারের সকল মহিলাদের হিন্দুস্থানে তলব করেছি। এবং আমি এও সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি যে, কাবুল এবং এর পার্শ্ববর্তী রাজ্যসমূহকে সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করে নেব। আমি এ বিষয়ে হুমায়ুন ও কামরানকে বিস্তারিতভাবে লিখে জানিয়েছি।

"তুমি (খাজা কাঁলা) যখনই আমার এ পত্র পাবে, আমার বোনদেরকে এবং পরিবারের অন্যান্য মহিলাদেরকে সিন্ধুনদের তীরে পৌঁছে দেবে। তুমিও তাদের সাহচর্য লাভের গৌরব অর্জন কর। পরিস্থিতি যেমনই হোক, তাদেরকে এক সপ্তাহের ভেতর নিয়ে বেড়িয়ে পড়ো। কেননা, তাদেরকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে হিন্দুস্থান থেকে একটি সৈন্যদল সিন্ধুনদের তীরে পৌঁছে গেছে এবং তাদের অপেক্ষা করছে। তারা যত দেরীতে রওনা হবে ততই দেশের এবং সাম্রাজ্যের ক্ষতি সাধিত হবে।"

মিসেস এনিটা বলেন (ইংরেজী ভূমিকা দ্রষ্টব্য), কাবুলের এই সাত আটজন সর্দার কারা? নিঃসন্দেহে এরা পুরুষ নন। কেননা সকল পুরুষই হিন্দুস্থানে ছিল। এমনকি এই পত্র প্রাপ্তির পূর্বেই মেহদী খাজাও সৈন্যদলে যোগ দিয়েছিল।

বাবুর তাঁর চিঠিতে বোনদের ব্যাপারে খুব গুরুত্ব আরোপ করেন। এতে প্রতীয়মান হয়, বোনদের জন্যই কাবুলের রাজনৈতিক অবস্থা সংগীন হয়ে

উঠেছিল। তাছাড়া এটাও লক্ষণীয় যে, মহিলাদের ছাড়াও পুরুষদের কিছু ক্রিয়াকর্মের প্রভাব এ ব্যাপারে সক্রিয় ছিল হিন্দুস্থানে।

বাদশাহ বাবুরের বোনদের মধ্যে খানজাদা বেগমের গুরুত্ব ছিল সর্বাধিক। তার অধীনে ছিল এক বিরাট অঞ্চলের জায়গীর। শাহী খান্দানের একজন বড় প্রভাবশালী মহিলা এবং ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও বুদ্ধিমত্তার নিরিখে তিনি ছিলেন এক অনন্য-সাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্না। খানজাদা বেগম বাবুরের সেই বোন যিনি বাবুরের নিরাপত্তার জন্যে নিজের প্রাণ বিসর্জন দেবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। না চাইতেই তিনি উজবেক খানের স্ত্রী হতে সম্মত হন। তাসখন্দ থেকে পালিয়ে আসার সময় তিনি যদি উজবেক খানের স্ত্রী হতে রাজী না হতেন তাহলে বাবুর কোনদিন পালিয়ে আসতে পারতেন না। উজবেক খান অবশ্যই তার পশ্চাদানুসরণ করতো। খানজাদা বেগম সে সময় মেহদীখাজা বেগম ছিলেন। তার সম্পর্কে 'তাবকাতে' বর্ণিত তথ্যসমূহ যদি সামান্যও সত্য হয়, তাহলে খলিফার মতো লোকের উক্তি অনুযায়ী তিনি বাবুরের উত্তরাধিকারী হবার যোগ্য ছিলেন।

এই সুযোগ্যা মহিলাদের তালিকায় খানজাদা বেগমের সৎ বোন এবং খলিফার ভাই জুনায়েদ বরলাসের স্ত্রীও ছিলেন। এক সন্তানের জননী ছিলেন তিনি। বাবুরের বোনদের মাঝে ইয়াদগার বেগম নাম্নী এক মহিলাও এসময় কাবুলে ছিলেন। বাবুরের এই ভগ্নিত্রয় ছাড়াও আরো কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মহিলা ছিলেন সেখানে। তন্মধ্যে শাহজাদা সোলায়মানের মাতাও ছিলেন। তিনি কামনা করতেন শাহজাদা সোলায়মানকে যেভাবেই হোক বদখশানের ক্ষমতা লাভ করতে হবে।

তাছাড়া সুলতান হোসেন মির্জা বায়াক্রার তিন পৌত্রের স্ত্রীগণ কাবুলে ছিলেন। অবশ্য তিন পৌত্র ছিলেন হিন্দুস্থানে। এই তিন শাহজাদা অনেক উচ্চাভিলাষী ছিলেন। তন্মধ্যে একজনের নাম ছিল মোহাম্মদ সুলতান মির্জা। অপর দুজনের নাম ছিল কাশেম হোসাইন এবং মোহাম্মদ জমান মির্জা। এছাড়া কাবুলে বাদশাহ বাবুরের সৎভাই নাসের মির্জার পুত্র ইয়াদগার নাসেরের স্ত্রীও ছিলেন।

বাদশাহ বাবুরের দুই ফুফী ফখ্‌রে জাহাঁ ও খোদেজা বেগম এসময় হিন্দুস্থানে ছিলেন। তাঁরা ১৫২৭ সালের নভেম্বরে হিন্দুস্থানে পৌছেন। কিন্তু তারা কার

সাথে এখানে আসেন তা জানা যায়নি। তবে এতটুকু জানা যায়, প্রথমোক্ত মহিলা একজন তিরমিজি প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির স্ত্রী ছিলেন। এই ব্যক্তি এক বিরাট তিরমিজি ধর্মীয় পরিবারের লোক বলে উল্লেখ আছে। এই পরিবারের সাথে শাহী পরিবারেরও আত্মীয়তা রয়েছে। এদের বহু আত্মীয়-স্বজন সামরিক বিভাগে রয়েছে। সম্ভবতঃ এরা দু'জন সম্রাট বাবুরের প্রথম আহ্বানে সাড়া দিয়ে এখানে চলে আসেন।

এই সম্মানিতা মহিলাদ্বয় যখন ছেলেপিলে ও আত্মীয়-পরিজনসহ আগ্রা পৌঁছেন, বাদশাহ বাবুর তাদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে ব্যক্তিগতভাবে শহরের বাইরে আসেন এবং যথারীতি তাদের কদমবুচি করেন। অতঃপর সসম্মানে তাদেরকে নির্ধারিত প্রাসাদে পৌঁছে দেন।

ফখরে জাঁহা ও খোদেজা বেগম ১৫২৮ সালের ৩০শে ডিসেম্বর পর্যন্ত হিন্দুস্থানে থাকেন। কিন্তু এরপর ফখরে জাঁহা 'কাহিলে' ফিরে যান। খোদেজা বেগম সেখানেই থেকে যান। বাদশাহ বাবুর প্রতি শুক্রবার তার কুশলাদি জিজ্ঞেস করার জন্যে তার মহলে যেতেন। এ মাসেই ফখরে জাঁহা ও খোদেজা বেগমের আরো তিন বোন আগ্রার উপকণ্ঠে এসে হাজির হলো। তারাও কাবুল থেকে এসেছেন। বাদশাহ এবারেও তাদের স্বাগত জানাবার জন্যে শহরের বাইরে চলে এলেন এবং কাবুলের ঘটনাবলী বড় মজা করে গল্পের মত তাদের কাছ থেকে শোনেন। তাঁদের জন্যেও বাবুর উপযুক্ত জায়গীর প্রদান করেন এবং থাকার জন্যে আরামপ্রদ আবাসস্থলের বন্দোবস্ত করেন। বাদশাহ তাদের সকল অভাব-অভিযোগ শোনেন এবং তাদেরকে খুশী করার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করেন।

'তুজুকে বাবুরী' এবং 'তারিখে রশিদি'তে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, বাদশাহ বাবুর তার ফুফুদের খুব সম্মান প্রদর্শন করতেন এবং তাদেরকে খুশী করার জন্যে সচেষ্ট থাকতেন।

কাবুলে অবস্থানরত শাহী খান্দানের মহিলাদের হিন্দুস্থানে চলে আসার জন্যে ১৫২৮ সালে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। কিন্তু সে নির্দেশ পালন করতে তাদের সে বছর পার হয়ে গেল। অর্থাৎ ১৫২৯ সালের প্রথম দিকে তারা এক এক করে আগ্রার উদ্দেশ্যে রওনা হল। সর্বপ্রথম মহম বেগম নিজের

লোকলস্কর নিয়ে রওনা হলেন। অন্যান্য মহিলারাও ক্রমান্বয়ে নিজেদের সুযোগসুবিধা মতো তারপর রওনা হন। মার্চ মাসের ২২ তারিখে সম্রাট বাবুর খবর পেলেন যে, শাহী পরিবারের মহিলাগণ কাবুল ত্যাগ করে আগ্রার দিকে আসছেন। মহম বেগম গুলবদনকে সাথে নিয়ে দ্রুততার সাথে আগ্রার দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। তিনি প্রিয়তম স্বামীর দর্শন থেকে কয়েক বছর বঞ্চিত হয়েছেন। স্বামীকে দেখার প্রেরণা তাকে আগ্রার দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল উর্ধ্বশ্বাসে। তার পেছনে অন্যান্য মহিলাদের কাফেলাও আসছিল। এই দীর্ঘ দিন সফরে মহিলাগণ কখনো ঘোড়ার পিঠে, কখনো পাল্কীতে চড়ে পথ অতিক্রম করেন।

কাবুল থেকে সিন্ধুনদ পর্যন্ত আসার জন্যে আরো একটি বিকল্প রাস্তা ছিল। কিন্তু এ পথে শুধু পুরুষরাই আসতে পারতো। তারা নদীতে কাঠ ও গাছ-পালা ফেলে একটা কৃত্রিম সেতু তৈরী করে নিতো এবং দশ মনজিলের সফর মাত্র কয়েক ঘণ্টাতেই অতিক্রম করতো। কিন্তু মহিলাদের জন্যে এসব ঝকমারী সহ্য করা সম্ভব ছিল না।

সম্ভবতঃ মহিলাগণ এই সফর বাতেখাক এবং জাগালাক থেকে শুরু করে প্রথম জালালাবাদ এবং পরে খাইবার পৌঁছেন। তবে এ সম্পর্কে নিশ্চিত কিছু বলা সম্ভব নয়।

যেহেতু মহম বেগম এবং গুলবদন বেগম সর্বপ্রথম আগ্রা পৌঁছেন, এজন্যে বাদশাহ বাবুর তাদেরকে স্বাগত জানান।

গুলবদন বেগমের সহজাত চাঞ্চল্য এবং শিশুসুলভ বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ এই দীর্ঘ পথ চলার ক্লান্তিকে দূর করে দিয়েছে। পুত্র ফারুকের মৃত্যুও যেন ভুলে গেছেন মহম বেগম গুলবদন বেগমের মায়াময় চাহনির দিকে তাকিয়ে।

এটা দুর্ভাগ্য যে, গুলবদন এই দীর্ঘ সফরের বর্ণনা তাঁর গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেননি। শুধু সফরের শেষাংশের বর্ণনা দিয়েছেন এবং বলেছেন সফরের মাঝে বাদশাহ বাবুর এবং তাঁর মায়ের মাঝে চিঠিপত্রের আদানপ্রদান ছিল। বাদশাহ বাবুর মহম বেগমের কাছে পত্র দিয়ে ৫ই মার্চ যে কাসেদ প্রেরণ করেছিলেন, 'তুজুকে বাবুরী'র একটি অনুলিপিও তার হাতে দিয়ে বলে-ছিলেন, "এই পাণ্ডুলিপি সমরকন্দ (ইংরেজী সংস্করণের ভূমিকা পৃষ্ঠা নং ২০-২১) পৌঁছে দিও।"

এপ্রিলের পয়লা তারিখে বাদশাহ বাবুর যখন গাজীপুরে ছিলেন, সে সময় খবর এলো তিনি যেসব সৈন্য একজন অশ্বারোহীর নেতৃত্বে সিন্ধুতে পাঠিয়েছিলেন, তারা উনিশে ফেব্রুয়ারী বেগমদের কাফেলা নিজেদের হেফাজতে নিয়ে চেনাবের দিকে এগিয়ে এসেছে। সম্ভবতঃ এই দল ছিল মহম বেগমের। কেননা মহম বেগমের কাবুল থেকে সিন্ধুনদ পর্যন্ত আসতে এক মাস অতিক্রান্ত হয়েছে।

বাইশে এপ্রিল তারিখে মহম বেগমের চিঠি নিয়ে এক বিশেষ ভৃত্য আগ্রা পৌঁছে। তিনি পত্রে বাদশাহ্কে জানিয়েছিলেন যে, পথিমধ্যে তিনি পেস্তদাদ খানের উপকণ্ঠে অবস্থিত 'বাগে সাফা'তে অবস্থান করেছিলেন। ব্যস, এই সফর সম্পর্কে শুধু এইটুকু স্মৃতিতে রয়ে গেছে।

মহম বেগম ২৭শে জুন আগ্রাতে পদার্পণ করেন। তখন সময় ছিল রাত্রি দ্বিপ্রহর। বাবুর মহম বেগমকে দেখামাত্রই অন্যান্যরা গুলবদনকে নিয়ে অন্য শিবিরের দিকে চলে গেল আর এদিকে বাদশাহ্ এবং বেগম একাকী তাদের দীর্ঘ দিনের দূরত্বের যবনিকাপাত করেন। দ্বিতীয় দিন যখন সারা দুনিয়া সূর্যালোকে ছেয়ে গেলো তখন সেবিকাগণ শিশু গুলবদনকে নিয়ে এলেন পিতার পূণ্য স্নেহের পাশে। গুলবদন বেগম পিতার পদচুম্বন করলেন। পূর্বেই বলা হয়েছে গুলবদনের বয়স যখন দুই বছর তখন পিতা হিন্দুস্থানে আসেন আর এখন গুলবদন ছ'বছরে পা রেখেছেন। তাঁর স্মৃতিতে পিতার কথা আবছা মনে আছে। কিন্তু এই মুহূর্তে হঠাৎ আলোর ঝলকানীর মতো সকল অস্পষ্টতা তার দূরীভূত হলো যখন মহামান্য পিতার পেশল বাহুর অবেষ্টনীতে বুকের সাথে মাথা রেখে বসেছিলেন তিনি। কিছুক্ষণ বসার পর পিতা গুলবদন বেগমকে মহম বেগমের কোলে তুলে দিলেন। অতঃপর তিনি রাজকীয় কাজে দরবারে দিকে চলে যান।

আগ্রা আসার পর আমাদের লেখিকার জীবন বেশ আনন্দেই কাটছিল। বাদশাহ যখন কোথাও বেড়াতে বের হতেন, মহম বেগমের সাথে গুলবদনও থাকতেন। লেখিকা নিজেই তার লেখায় ধোলপুর ও সিক্রি সম্পর্কে বর্ণনা দিয়েছেন।

বাদশাহ বাবুর স্থাপত্য শিল্প ও বাগান তৈরীর ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ রাখতেন। তিনি যেখানেই যেতেন, তাঁর এ ইচ্ছা পূরণ করতেন।

প্রথমতঃ আগ্রার যে স্থানটায় তিনি রাজ-দরবার (সিংহাসন স্থাপন) করার পরিকল্পনা নেন, সে জায়গাটা তার মোটেই পছন্দ ছিল না। চারদিকে ধুধু মাঠ, কোথাও কোন ফলফলারী বা ফুলের গাছ ছিল না। এ জায়গাটাকে মনোমুগ্ধকর করার জন্যে তাঁকে অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছিল। সুপরিকল্পিতভাবে চারিদিকের সুদৃশ্য ফলফুলের গাছ এবং সুন্দর অট্টালিকা তৈরী করেন। বিশেষ করে ধৌলপুর এবং সিক্রিতে তিনি অনেক সুরম্য প্রাসাদ তৈরী করেন।

গুলবদন বলেন, সিক্রিতে তিনি অনেক দালানকোঠা নির্মাণ করেন। তিনি 'তুজুকে বাবুরী' যে ভবনে বসে লিখতেন, সেটিও সিক্রিতেই ছিল।

ফতেহ্‌পুর সিক্রিতে বাবুর যে লড়াই করেছিলেন, তার আদ্যপান্ত বিবরণ যখন তিনি মহম বেগমের কাছে ব্যক্ত করছিলেন, তখনই প্রথমবার গুলবদন জানতে পারলেন যুদ্ধের ভাষায় 'গাজী' কাকে বলে। খোদার জন্যে যিনি এভাবে যুদ্ধ করেন বিনিময়ে খোদা তাকে কি দিয়ে থাকেন তাও এসময় তিনি জানতে পারলেন।

গুলবদন বেগম ফতেহপুর সিক্রি ও ধৌলপুরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, তিনি এবং তাঁর মাতা এ তল্লাটে এসেছেন তিন মাস গত হলো। তারপর একদিন অন্যান্যদের এক কাফেলাও আগ্রা এসে পৌছল। এই দলের নেতৃত্ব দিযেছিলেন বাদশাহ বাবুরের বড় বোন খানজাদা বেগম। তিনি উজবেক খানের স্ত্রী ছিলেন। এই কাফেলা যখন আগ্রাতে পৌছে সম্রাট বাবুর সানন্দে নিজেই এগিয়ে গিয়ে তাদের স্বাগত জানান। সর্বপ্রথম তিনি বড় বোনের সাথে মিলিত হন, অতঃপর শ্রেণীভেদে প্রত্যেকের সাথে কথাবার্তা বলেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পরই বাবুর রোগাক্রান্ত হন। ১৫২৯ সালের গরমের সময় ছিল তখন। হুমায়ুন বদখশানে খবর পেলেন যে পিতা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। বাবুর তাকে আসার জন্য কোন সংবাদ দেননি। তা সত্ত্বেও হুমায়ুন তল্পিতল্পা বেঁধে রওনা হয়ে কাবুলে আসেন এবং মির্জা কামরানের সাথে দেখা করেন। কামরান সবে গজনী থেকে ফিরে এসেছেন। তাঁকে দেখে কামরান বিস্ময় প্রকাশ করেন। পরে দু'ভাইয়ে মিলে শলাপরামর্শ করেন। মির্জা হিন্দালের বয়স এসময় দশ বছর ছিল। ক'জন উচ্চপদস্থ আমীর-ওমরাহ সমভিব্যহারে তাকে বদখশান পাঠিয়ে দেয়া হলো যাতে হুমায়ুনের স্থলাভিষিক্ত হয়ে কাজ চালাতে পারে। অতঃপর মির্জা হুমায়ুন দ্রুত গতিতে আগ্রার

উদ্দেশ্যে রওনা হন এবং সম্রাট বাবুর তাকে আসার খবর দেয়ার পূর্বেই তিনি সেখানে পৌঁছেন।

একটা শুভযোগ বলা যেতে পারে অথবা মহম বেগম প্রিয়তম পুত্রের আগমন সংবাদ পেয়েছিলেন। তিনি বাবুরকে তার কথা বলে রেখেছিলেন যে, তার সওয়ারী সদর দ্বারে এসে পড়ল বলে। শুধু আপনার অনুমতির অপেক্ষা মাত্র। মহম পুত্র-স্নেহে আপ্লুত হয়ে বাবুরের কাছে তার আগমনের কথা এমনভাবে তুলে ধরলেন যে, রোগশয্যায় বাবুরও পুত্রস্নেহে বিগলিত হয়ে গেলেন এবং বেমালুম ভুলে গেলেন যে, হুমায়ুন তার অনুমতি ছাড়াই বদখশানকে অরক্ষিত রেখে এদিকে আসছে। এমনিতেই বাবুর তার উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন। তদুপরি বদখশানকে এভাবে অরক্ষিত রেখে এসে একটা মারাত্মক রাজনৈতিক ভুল করলেন।

বাবুর কিছুদিন থেকে হুমায়ুনকে বলে আসছিলেন তিনি যেন অনতিবিলম্বে বদখশান ফিরে চলে যান। রাজ্যের নিরাপত্তার জন্যে সেখানে তার উপস্থিতি একান্ত অপরিহার্য। হুমায়ুন এ নির্দেশ শুনে প্রকাশ্যে 'যাব যাব' বলছিলেন। কিন্তু পরিবারের সকলকে রেখে এত দুর দেশে যেতে তার মন চাইছিল না মোটেই।

বদখশান যাবার ব্যাপারে হুমায়ুনের এ অনিচ্ছা সম্পর্কে বাবর টের পেলেন এবং খলিফাকে বললেন তিনি যেন বদখশানে চলে যান। কিন্তু খলিফারও যাবার ইচ্ছে ছিল না। কেননা তাঁর ধারণা, বাবুরের রোগ ক্রমশঃ অবনতির দিকে যাচ্ছে। যদি কোন অঘটন ঘটে বসে তাহলে তিনি আর দেখতে পারবেন না। তাছাড়া বাবুরের প্রতি তার ভালবাসা ছিল অপরিসীম। কোনক্রমেই এত দুরাঞ্চলে যাবার মন চাইছিল না তার।

হুমায়ুন এবং খলিফা বদখশানে যেতে অস্বীকৃতি জানালে এ দায়িত্ব বর্তাল অতঃপর মির্জা সোলায়মানের উপর। মিরান শাহী বংশোদ্ভূত মির্জা সোলায়মান বদখশানের উত্তরাধিকারীও ছিলেন বটে। এ সময় তাঁর বয়স ছিল সবেমাত্র ১৬ বছর।

সোলায়মান মির্জা বদখশানে চলে যাবার পর, মির্জা হুমায়ুনও তার জায়গীর ছম্বল অঞ্চলে প্রস্থান করেন। ছম্বলে যাবার কয়েক মাস পরেই হুমায়ুন তার সেই

বিখ্যাত রোগে পতিত হন। তাঁর ব্যাধি ক্রমান্বয়ে এমন ভয়াবহ আকার ধারণ করে যে, শেষ পর্যন্ত স্বয়ং বাবুরকে তাঁর প্রাণ বিসর্জন দেবার প্রয়োজন হয়।

পুত্রের রোগমুক্তির জন্যে পিতার এ আত্মদানের বিবরণ ইতিহাসে লেখা রয়েছে বিশদভাবে।

গুলবদন বেগমও এ ঘটনা বিবৃত করেছেন তার লেখায়। হুমায়ুন নামার অনুবাদক মিসেস এনিটা এই ঘটনা সম্পর্কে বলেন :

প্রাচ্যদেশে এক ধরনের বিশ্বাস মানুষের মাঝে প্রচলিত রয়েছে যে, কোন লোক যদি নিজের সবচাইতে মূল্যবান সম্পদ কোন রোগীর জন্যে কোরবানী করে দেয় এবং এই কোরবানী যদি আল্লাহ্‌র দরবারে কবুল হয়, তাহলে সেই রোগীর রোগ একসময় এই লোকটির গায়ে এসে লেগে যায় এবং ক্রমশঃ রোগী সুস্থ হয়ে ওঠে।

এই ধরনের আত্মত্যাগের উদ্দেশ্য সফল করতে হলে প্রথমতঃ আল্লাহ্‌র কাছে এজন্য প্রার্থনা করতে হয়। অতঃপর যে লোকটি প্রিয়তম লোকটির রোগ নিজের দেহে টেনে নিতে চায় তার শয্যার চারপাশে তিনবার প্রদক্ষিণ করতে হয়।

প্রিয়তম পুত্রের রোগমুক্তির জন্যে সম্রাট বাবুরও এই নিয়মে আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করে বলেন, হুমায়ুনের রোগ আমাকে দান করো এবং হুমায়ুনকে ভাল করে দাও। সত্যি দেখা গেল, এই প্রার্থনার পর ক্রমশঃ হুমায়ুন ভাল হয়ে উঠতে লাগলেন এবং বাদশাহ বাবুর দিন দিন অসুস্থ হয়ে পড়লেন।

মৃত্যুর পূর্বে বাদশাহ বাবুরের রোগ যখন চরম আকার ধারণ করে, তখন তিনি কন্যা গুলরং এবং গুলচেহরার বিয়ের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তিনি মৃত্যুর পূর্বে মন্ত্রীপরিষদ ও আমীর-ওমরাহদের নিয়ে পরামর্শ সভায় বসেন, ঘনিষ্ঠভাবে হুমায়ুনের সাথে আলাপ করেন এবং তাঁর উত্তরাধিকারীর গৌরব প্রদান করেন তাঁকে।

মহাত্মা বাবুর ১৩৫০ সালের ২৬শে ডিসেম্বর পরলোক গমন করেন। কন্যা গুলবদন বেগম মহামান্য পিতার মৃত্যুর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, যেদিন বংশকুল চূড়ামণি মহাত্মা বাবুর এই দুনিয়া ত্যাগ করেন, হঠাৎ আলোকিত এই দুনিয়া যেন অন্ধকারে ছেয়ে গেল। চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার মনে হচ্ছিল।

সেদিন আমরা মেয়েরা এখানে সেখানে চুপি চুপি বসে শোকাকুল হয়ে নিজেদের অদৃষ্টের পরিহাসের কথা চিন্তা করে অশ্রু বর্ষণ করছিলাম।

হুমায়ুনকে এই মহান সুযোগ থেকে বঞ্চিত করার জন্যে খলিফা দীর্ঘ দিন ধরে মনে মনে চক্রান্ত করছিল। 'তাবকাতে আকবরীর' লেখক নিজামুদ্দিন আহমদ এ ব্যাপারটি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন। তিনি তাঁর পিতা মকিম খান-এর কাছ থেকে ব্যাপারটি শুনেছিলেন। মকিম খান বাবুরের দরবারের একজন প্রভাবশালী সদস্য ছিলেন।

আল্লামা আবুল ফজলও এই বিষয়টির পুনরাবৃত্তি করেছেন। তাঁর মতে, এই খলিফা সব সময় সচেষ্ট ছিলেন যে, হুমায়ুন যেন কোনক্রমেই বাবুরের উত্তরাধিকারী না হতে পারে। তার বদলে খানজাদা বেগমের স্বামী মোহাম্মদ মেহদী খাজা যেন এই সুযোগ লাভ করেন। বাবুর দীর্ঘ দিন রোগশয্যায় ছিলেন। হিন্দুস্থানের আবহাওয়া তাঁর স্বাস্থ্যহানির অন্যতম কারণ। রোগাক্রান্ত হয়েও তিনি হুমায়ুনকে ডেকে পাঠাননি। কিন্তু যখন তিনি অনাহূত এবং অনুমতি ছাড়াই এসে পড়লেন বাবুর বারংবার তাকে বদখশান ফিরে যাবার জন্যে পীড়াপীড়ি করছিলেন। কেননা, হুমায়ুনের এখানে থাকার তেমন কোন প্রয়োজন ছিল না। মির্জা আসকরী এখানে ছিল। তাছাড়া রোগাক্রান্ত হওয়ার পর বাবুর তিনি মির্জা হিন্দালের আগমন প্রতীক্ষা করছিলেন তীব্রভাবে।

বাদশাহ বাবুর এবং খলিফা পরস্পর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। দু'জনেই হুমায়ুনের চরিত্রের খারাপ দিক সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। অতএব খলিফা যদি বাবুরকে গোপনে হুমায়ুনকে উত্তরাধিকারী মনোনীত না করার জন্যে পরামর্শ দিয়েও থাকেন তা তেমন কোন বিচিত্র কিছু নয়।

তাছাড়া খলিফা যদি বাবুরের মনের খবর না রাখতেন তাহলে এমন প্রস্তাব দেওয়াও তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। খলিফা শুধু বাবুরের মনের খবরই জানতেন না বরং দরবারের সকল প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের মনের খবরও রাখতেন। মেহদী খাজা হুমায়ুনের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার মতো ব্যাক্তি ছিলেন কিন্তু এ ব্যাপারে বাবুর বা গুলবদন বেগম কেহই কিছু বলেন নি।

তুজুকে বাবুরীতে তার সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু বলা হয় নাই। অথচ বাবুরের স্বভাবসিদ্ধ রীতি ছিল যার প্রসঙ্গ টানতেন তার সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ পরিচয় এমনকি বংশ পরিচয় পর্যন্ত উল্লেখ করতেন। তবে এতে বুঝা যাচ্ছে মোহাম্মদ

মেহদী খাজার সাথে তাঁর (বাবুর) প্রথম পরিচয়ের অভিজ্ঞতা যেসব পৃষ্ঠা-গুলোতে লিপিবদ্ধ করেছিলেন, সেই পৃষ্ঠাগুলো বিনষ্ট হয়ে গেছে।

যাহোক নিজামুদ্দিন আহমদ যা কিছু লিখেছেন, সেই প্রেক্ষিতে মেহদী খাজা শুধুমাত্র বংশ পরিচয়, সামরিক দক্ষতা, খানজাদা বেগমের স্বামী ইত্যাদি পরিচয়ের চেয়েও বেশী যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি বলে চিহ্নিত ছিলেন।

এছাড়াও কিছু তথ্যাবলী এমনও পাওয়া গেছে যে, মেহদী খাজার পিতা একজন তিরমিজি নরপতি ছিলেন। তাছাড়া তার মা ছিলেন তৈমুর বংশজাত। তিরমিজি বংশোদ্ভূত বলে এজন্যে মানতে হয় যে, মেহদী খাজা এবং খানজাদা বেগমের সমাধির ঠিক মাঝখানে আবুল মাআলী তিরমিজির সমাধি রচিত হয়েছিল।

মিসেস এনিটা বলেন, যতদুর মনে হচ্ছে, যদি হুমায়ুনকে বঞ্চিত করে মেহদী খাজাকে বাবুরের উত্তরাধিকারী মনোনীত করা হতো তাহলে তা হতো শুধু হিন্দুস্থানের জন্যে। অন্যান্য অধিকৃত এলাকা বাবুর তনয়দের মাঝে বন্টিত হতো, যেমন আবু সাইদ মির্জা সন্তানদের মাঝে নিজের সাম্রাজ্য বন্টন করে দিয়েছিলেন।

এমনিতে দিল্লী আগ্রার ব্যাপারে বাবুরের হৃদয়গত কোন টান ছিল না। বরং ফরগণা এবং সমরকন্দের প্রতি তাঁর বেজায় রকম টান ছিল। তাঁর একটা স্বপ্ন ছিল তাঁর সাম্রাজ্যের পরিধি বিস্তৃত হবে জিহুন নদী পর্যন্ত। এজন্যে তিনি তাঁর দুই পুত্রকে এতদঞ্চলে মোতায়েন করেছিলেন। তিনি এভাবে তাঁর পুত্রদের দ্বারা তাঁর ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তারের কেন্দ্রবিন্দু করতে চেয়েছিলেন কাবুল নগরীকে। কাবুলকে কেন্দ্র করে তিনি উজবেক সম্প্রদায়কে আরো পেছনের দিকে হটিয়ে দেবার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন। যদি মেহদী খাজা অথবা এ ধরনের অন্য কোন সুযোগ্য ব্যক্তি দিল্লীতে শাসনদণ্ড পরিচালনা করতেন তাহলে মূলতঃ হুমায়ুনের কোন পরাজয় ছিল না। বাবুর অপরিসীম কষ্ট করে যে সব দেশ জয় করেছিলেন, তাও এভাবে আর হাতছাড়া হতোনা।

সম্রাট বাবুর হুমায়ুনের উদ্দেশ্যে যত আদেশ-উপদেশ জারি করেছিলেন তার মধ্যে একটি উদ্দেশ্যই বেশী প্রকাশ পেত। হুমায়ুন যেন হিন্দুকোশের শীর্ষে

অচল অটল দাঁড়িয়ে থেকে জিহুন নদী তীর পর্যন্ত তার সাম্রাজ্য বিস্তারে সচেষ্ট হয়।

এখানে অবশ্য প্রশ্ন হতে পারে, হুমায়ুন যদি বাবুরের নির্দেশ শুনে তখন বদখশানে ফিরে চলে যেতেন তাহলে বাবুর হিন্দুস্থানের শাসনদণ্ড সত্যি কার হাতে দিতেন ?

স্মর্তব্য যে, যখন হুমায়ুন সম্রাট হলেন, মির্জা কামরানকে কাবুল শহর জায়গীর হিসাবে প্রদান করেন। কেননা, কামরান দাবী করেছিলেন যে, বাবুর বাদশাহ কাবুলকে তার মাতা গুলরুখকে দান করেছিলেন। এভাবে কাবুল যদি কামরানের হতো তাহলে শুধু বদখশান হুমায়ুনের জন্যে নির্ধারিত হতো, তখন ব্যাপারটা দাঁড়াতো কেমন ? জটিল ব্যাপার বৈ কি।

নিজামুদ্দিন আহমদের এই পুরো বক্তব্য যদি নির্ভরযোগ্য মনে না করা হয় তাহলে ব্যাপারটা শুধু এতটুকুতে দাঁড়ায় যে, বাবুরের অনুমতি ছাড়া হুমায়ুন বদখশান থেকে আগ্রাতে আসেন। যেহেতু তিনি বাবুরের প্রিয়তমা স্ত্রী মহম বেগমের পুত্র, এজন্যে তার এই অনভিপ্রেত আগমনকে ক্ষমা করা হয়েছে এবং মৃত্যুর পূর্বে বাবর তাঁকেই উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন।

বাবুরের মৃত্যুকালে যদিও আমাদের গ্রন্থলেখিকা অল্প বয়সের ছিলেন, কিন্তু পিতার মৃত্যু তার ওপর বিশেষ রেখাপাত করে। পূর্বাপর সকল ঘটনার সাথে তিনি বিশেষ প্রভাবান্বিত হন। প্রথম দিকে তাঁর ভাই আলোয়ার মির্জা মারা যান। অতঃপর সিক্রিতে একটা দুর্ঘটনা ঘটে। পিতা শেষের দিকে 'দরবেশব্রত' গ্রহণ করেন এবং রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। এ সময় হঠাৎ ভ্রাতা হুমায়ুনের আগমন। বাবুর এতে খুব ক্রুদ্ধ হন এবং হুমায়ুন অসুস্থ হয়ে পড়েন। বাবুর নিজের প্রাণের বিনিময়ে পুত্রের প্রাণরক্ষার প্রার্থনা করেন। বাবুর এরপর আবার অসুস্থ হন এবং দীর্ঘদিন রোগ ভোগের পর হঠাৎ একদিন মৃত্যুবরণ করেন।

এ সমুদয় ঘটনাবলী গুলবদন বেগমের মনে ছবির মতো আঁকা হয়েছিল। সকল ঘটনার মধ্যে বাবুরের মৃত্যু তার জন্যে ছিল চরম অসহনীয়। অন্যান্যদের মতো গুলবদন বেগমও ৪০ দিন পিতার মৃত্যুশোকে মাতম করতে থাকেন। পিতার মৃত্যুর পর আত্মার মাগফেরাতের জন্য যেসব দান খয়রাত করা হয়েছে, তাও

গুলবদনের বিলক্ষণ মনে আছে। বাবুরের কবরে যে সব 'কোরানে হাফেজগণ' কোরান তেলাওয়াত করতেন, তার মাতা মহম বেগম তাদের জন্য দুবেলা খাবার পাঠাতেন তাও গুলবদনের মনে আছে।

হুমায়ুন প্রসঙ্গ

মিসেস এনিটার মতে, যদিও হুমায়ুন উন্নত-চরিত্র এবং বৈশিষ্ট্যহীন চরিত্রের ছিলেন, তবু হুমায়ুনের ভূমিকাও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিশেষতঃ এজন্যে যে, তার জন্যে তার মাতাদের, বোনদের, বেগমদের ও পরিবারের অসংখ্য লোকদের বিপদের সমুখীন হতে হয়েছে।

মিসেস এনিটা বলেন, বৃটেনের লোকেরা যদি কোন দিন পরাজিত হয় এবং পশ্চাৎপদ হতে বাধ্য হয়, তখন গা বাঁচাবার জন্যে তারা সুরক্ষিত বাড়ী-ঘরে আশ্রয় নিয়ে পরবর্তী চিন্তাভাবনা করার সুযোগ পাবে। কিন্তু তৈমুররা ১৫৩৯-৪০ সালে যখন পরাজিত হয় এবং তারা আগ্রা, দিল্লী এবং লাহোরে মার খায় তখন তারা আশ্রয় নেবার মতো কোন জায়গা পায়নি। বিশেষতঃ হুমায়ুনের বেলায় এধরনের কোন আশ্রয়ই ভাগ্যে জুটেনি। যা কিছু আশা ভরসা ছিল তাও তার ভাই কেড়ে নিয়েছিল।

বনি ইস্রাইলদের মতো হুমায়ুন ও তার সাথীদের পথে প্রান্তরে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে পথভ্রষ্টের মতো। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় তাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েছে দিনের পর দিন। নিরুপায় হয়ে ভিনদেশে আশ্রয় নিতে হয়েছে তাকে। কিন্তু সেখানেও পিছু ধাওয়া করেছে তার ভাই। পদে পদে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়েছেন তিনি।

হুমায়ুন ও তার সাথীদের যে ঘটনাবলীর সম্মুখীন হতে হয়েছে তা কোন রকম জাতীয় বা সমষ্টিগত ছিল না, ছিল সম্পূর্ণ ব্যক্তিগতভাবে। কেননা হুমায়ুন ও বাবুর কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের প্রতিভূ ছিলেন না। তারা ছিলেন একটি শাসকপরিবারের প্রতিনিধি। একজনের পর আরেকজন ক্ষমতা দখল করেছেন। এরপরে আরেকজন। এক বংশের পর আরেক বংশের লোক। যে শক্তিমান ছিলেন তিনি দুর্বলকে অবদমন করে আসন করে নিয়েছেন নিজের। (বাবুর স্বয়ং ইব্রাহিম লোদীর জায়গা দখল করে নিয়েছেন। যেহেতু তিনি

ইব্রাহিম লোদীর চাইতে বেশী শক্তিশালী এবং মহান ছিলেন। অথচ তাঁর পুত্র হুমায়ুন তার প্রতিদ্বন্দ্বী শেরশাহ সুরীর তুলনায় অক্ষম ছিলেন)।

মিসেস এনিটা হুমায়ুনের পতনকে আলোচ্য বিষয় মনে করে হুমায়ুনের উত্থান ও পতনের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তিনি বলেন, হুমায়ুন ১৫৩০ সালের ডিসেম্বরে ক্ষমতালাভ করেন। পরবর্তী বছরে মির্জা কামরান এসে লাহোর দখল করেন এবং কাবুল ছাড়াও তিনি পাঞ্জাবের প্রভু হয়ে বসেন। হুমায়ুন তার এই তৎপরতার প্রতিবাদে কিছুই বলেন নি। এবং নির্বিবাদে এতবড় বিস্তীর্ণ শস্যশ্যামল জনপদের বাদশাহ হবার সুযোগ দান করেন।

১৫৩৩ সালে শাহজাদাগণ তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং ১৫৩৭ সালে গুজরাট তাঁর হাত ছাড়া হয়ে যায়। হুমায়ুনের রাজ্যে বিশৃংখলার সূত্রপাত হয়। শেরশাহ এই সুযোগ গ্রহণ করেন। এই সময় শের শাহের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। বাংলাদেশে হুমায়ুন শের শাহের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ পরিচালনা করেন, তার সূত্রপাত ছিল আশাব্যঞ্জক, কিন্তু পরিণাম হলো খারাপ। স্বয়ং হুমায়ুনের দরবারে লোকেরা তাঁর ব্যবহারে তুষ্ট ছিল না। এজন্যে ১৫৩৫ সালে তার বদলে মির্জা হিন্দালকে ক্ষমতাসীন করার এক চক্রান্ত হয়। তিনি পরিস্থিতি আয়ত্তে না রাখতে পেরে সক্রিয়ভাবে কয়েকমাস রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপ থেকে দুরে থাকেন।

১৫৩৫ সালের ২৭শে জুন হুমায়ুন চুসা এলাকায় শের শাহের সৈন্য বাহিনীর কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। দ্বিতীয়বার পরাজিত হলেন ১৫৪০ সালে কনুজ নামক স্থানে। শেষোক্ত পরাজয় এত বেশী শোচনীয় ছিল যে, হুমায়ুনকে তখন রীতিমত পালিয়ে যেতে হয়েছিল।

হুমায়ুনের মাতা মহম বেগমকে এদিক দিয়ে সৌভাগ্যবতী বলতে হবে যে, তিনি প্রিয়তম পুত্রের এই ভয়ানক পরাজয় দেখে যেতে পারেননি। তিনি হিন্দালের বিবাহের পূর্বেই ১৫৩৭ সালে এ দুনিয়া ত্যাগ করেন। যদিও হুমায়ুন মহম বেগমের মৃত্যুর পূর্বেই আফিম খেতে শুরু করেছিলেন, কিন্তু এ ব্যাপারে তিনি পরে অনেক দুর এগিয়ে গিয়েছিলেন।

গুলবদন বেগম ১৫৩৭ সালের পরবর্তীকালের প্রাসাদের বাইরের ঘটনাবলী সম্পর্কেও লিখেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি প্রাসাদ অভ্যন্তরের রাজনীতির

(চক্রান্ত) একজন স্থিরচিত্ত পর্যবেক্ষক ছিলেন এবং তা বর্ণনাও করেছেন বিস্তারিত-ভাবে। বিশেষতঃ হিন্দালের বিদ্রোহের ব্যাপারে প্রাসাদ অভ্যন্তরে যে সম্মেলন বসেছিল এবং শেখ বহুলুলকে হত্যার ব্যাপারে মির্জা হিন্দালকে অভিযুক্ত করার পটভূমিকা ব্যাখ্যা ইত্যাদি গুলবদন বেগম প্রাসাদ অভ্যন্তরের অভিজ্ঞতা থেকেই লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

প্রতিটি সুহৃদ বোনের মতো গুলবদন বেগমও আপন ভাই মির্জা হিন্দালের (হুমায়ুনের বিরুদ্ধে) বিদ্রোহের স্বপক্ষে যুক্তি তালাশ করেছিলেন। কিন্তু গুলবদনের মতো হিন্দালের সাথে রক্ত এবং হৃদয়ের সম্পর্ক ছিল না যাদের, তাদের কাছে এ বিদ্রোহ ছিল ভয়াবহ।

মির্জা হিন্দালের বয়েস এসময় ছিল উনিশ বছর। তিনি একজন পাকা সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। হুমায়ুনের দরবারের অনেক প্রভাবশালী ব্যক্তি তাঁর পক্ষে ছিলেন। এদের অনেকে গৌড় থেকে পালিয়ে এসেছে। গৌড়ে এরা হুমায়ুনের সৈন্যদলের পরাজয়ের জন্য দায়ী। সত্যি বলতে কি, গৌড়ে হুমায়ুন রীতিমত অবরুদ্ধ হয়ে। পড়েছিলেন। তখন হুমায়ুনের রাজত্বে শেরশাহ দাঁড়িয়ে ছিল প্রধান শত্রু হয়ে। তৈমুরি শাহজাদা এসময় তার টলটলায়মান রাজত্বের পরিস্থিতি বারংবার অবলোকন করতেন এবং একজন যথার্থ যোগ্য সেনাধ্যক্ষ বা নেতার প্রতীক্ষা করতেন মনে মনে।

বাবুরের পুত্রদের মধ্যে হিন্দাল ছিলেন সুযোগ্য এবং কর্মঠ। হুমায়ুন 'আফিম খোর' হয়ে যাওয়ার পর লোকরা হিন্দালকে কেন্দ্র করে আশাবাদী হয়ে উঠেছিলেন। এজন্যে মির্জা হিন্দাল নিজের নামে খোৎবা পাঠ করিয়েছিলেন। এবং তার পক্ষ থেকে নুরুদ্দিন মোহাম্মদ (বাবুরের জামাতা এবং সুলতান হোসেন বেকারার-এর পৌত্র) শেখ বহুলুলকে হত্যা করে। অনেকের ধারণা, শেখ বহুলুলকে হত্যা করার কারণ হলো, উভয় ভ্রাতার মাঝে বিরোধের দেয়াল যেন পাকাপোক্ত হয়।

গৌড়ে হিন্দাল বিদ্রোহ করেছেন এ খবর পেয়ে হুমায়ুন বিলম্ব না করে রাজধানীর দিকে ধাবিত হন। পথিমধ্যে চুসা নামক স্থানে শেরশাহ-এর দ্বারা শোচনীয়ভাবে তিনি পরাজিত হন এবং তাঁর আট হাজার তুর্কী সৈন্য এতে প্রাণদান করেন।

চুসার যুদ্ধে বাবুর-কন্যা মাসুমা বিধবা হন এবং হুমায়ুনের হেরেমের কয়েকজন ললনা শত্রুদের দ্বারা অপহৃতা হন। তাদেরকে উদ্ধার করতে যেয়ে কয়েকজন খ্যাতনামা আমীর-ওমরাহ প্রাণদান করেন।

এসময়ে হুমায়ুনের স্ত্রী বেগা বেগমের বন্দী হওয়া এবং প্রত্যাবর্তন সম্পর্কিত ঘটনাবলী ঐতিহাসিকরা বিশেষভাবে ওয়াকিফহাল আছেন।

এই মোগল ললনাগণ যখন শের শাহের লোকদের হাতে ধরা পড়ে তখন শের শাহ তাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও হেফাজতের বন্দোবস্ত করেন এবং নিজের রীতিতে তাদের প্রতি দায়িত্ব পালন করেন। এটাও সত্যি ঘটনা যে, হুমায়ুনের হেরেম ললনাদের ইজ্জত আব্রু বাঁচাতে গিয়ে হুমায়ুনের আমীর-ওমরাহ ও শের শাহের সৈন্যদের মাঝে যে সংঘর্ষ হয় তাতে শিবিরে অবস্থানকারী কতিপয় মহিলা ও শিশু প্রাণ ত্যাগ করে। এ সম্পর্কে ইতিহাসে কোন কিছু উল্লেখ নেই। নিহত মহিলাদের মাঝে কাশেম হোসেন সুলতান মির্জার স্ত্রী আয়েশা বেকারা এবং হুমায়ুন ও বাবুরের সেবিকাদের প্রধানা বেচাকা বেগমও ছিলেন। এদের মধ্যে আরো কিছু সংখ্যক মহিলা ছিলেন যারা বাবুরের মাতার সাথে সমরকন্দ থেকে পালিয়ে এসেছিলেন। এই সংঘর্ষে যে দুটি শিশু প্রাণ ত্যাগ করে তন্মধ্যে হুমায়ুনের ছ' বছর বয়স্কা কন্যা আকিকা বেগমও ছিলেন। তা ছাড়া হুমায়ুনের আরো দু'জন স্ত্রী চুসাতে রয়ে গিয়েছিল।

বাদশাহ হুমায়ুন অতিকষ্টে নদী পার হয়ে আগ্রা পৌছেন। আগ্রা পৌছে তিনি গুলবদন বেগমের কাছে আকিকা বেগমের প্রাণহানির অভিযোগ করেন। এসময় গুলবদনের বয়েস ছিল সতের বছর।'

এসময় হুমায়ুন এবং গুলবদনের মাঝে যে সংলাপ বিনিময় হয়, তা থেকে বুঝা যায়, গুলদবন তখন বিবাহিতা ছিলেন। যেমন, হুমায়ুন প্রথম দৃষ্টিতে গুলবদনকে চিনতে পারেননি। কেননা, ১৫৩৭ সালে যখন তিনি সৈন্য নিয়ে আগ্রা থেকে রওনা হন তখন গুলবদনের পরণে ছিল 'তাক'। আর এখন তার পরনে রয়েছে 'লেচক'। বিবাহিতা মেয়েরাই লেচক পরিধান করে থাকে। আর কুমারী মেয়েরা 'তাক' পরিধান করে। 'লেচক' এক ধরনের রুমাল-বিশিষ্ট শির-পরিচ্ছদ যা বিবাহিত মেয়েদের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্যে পরানো হয়। অনেকটা এযুগের স্কার্ফের মতো চিবুকের কাছে এনে তার গিরা দেয়া হয়।

গুলবদন বেগম ভাই হুমায়ুনের সাথে তার কথাবার্তার উদ্ধৃতি দিয়ে সহজভাবে তাঁর নিজের বিবাহের খবরটি যেন পাঠকদের জানিয়ে দিলেন। এছাড়া গুলবদন বেগম তার স্বামীর পরিচয় সম্পর্কে আর কিছু বলেন নি। অবশ্য তার স্বামী ছিলেন খিজির খাজা খান চুগতাই মোগলদের বংশোদ্ভূত। তিনি এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান ছিলেন। তাঁর পিতার নাম ছিল ইমন খাজা। তার মাতা হায়দার মির্জা 'দোইল্লত'-এর চাচাতো বোন ছিলেন। তার এক পিতামহের নাম ছিল ইউনুস খান। যদিও তিনি যাযাবর সম্প্রদায়ের সর্দার ছিলেন, কিন্তু বইপড়া ও নাগরিক জীবন সম্পর্কে তিনি ছিলেন বিশেষ আগ্রহশীল।

গুলবদন বেগমের দুই বোন ছিলেন। গুলরং ও গোলচেহারা নাম্নী এই দুই বোনের বিয়ে হয়েছিল খিজির খাজা খানের দুই চাচার সাথে। ওদিকে খিজির খাজা খানের এক ভাই-এর সাথে মির্জা কামরানের মেয়ে হাবিবার বিবাহ হয়েছিল। খিজির খাজা খানের আরো দুই ভাই ছিলেন হিন্দুস্থানে। এই দু'জনের নাম ছিল মেহদী ও মাসুদ। পিতার মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে তার পিতা ও এক পুত্র কাশগড় থেকে আগ্রা গিয়েছিলেন।

গুলবদন বেগমও হুমায়ুনের মাঝে যে কথাবার্তা হয়েছিল তার কিছু দিন পূর্বে হুমায়ুন ও শের'শাহ সুরীর মাঝে আরো একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। কামরান মির্জা নিজের দায়িত্ব ফেলে রেখে বার হাজার সৈন্য নিয়ে লাহোর অভিমুখে যাত্রা করেন। তার এই বাহিনীর সাথে অধিকাংশ দুর্বল ও অক্ষম মেয়ে পুরুষ ও ছেলেপিলেরা দিল্লী ছেড়ে লাহোরে রওয়ানা হয়। মির্জা কামরান গুলবদন বেগমকেও জবরদস্তি তাঁর 'সাথে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেন। প্রথমতঃ গুলবদন বেগম যেতে অস্বীকৃতি জানান। কিন্তু পরে যখন জানতে পারলেন যে, কামরান হুমায়ুনের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে রেখেছেন, তখন যেতে রাজী হলেন।

গুলবদন বেগম রওনা হবার পূর্বে খুব কান্নাকাটি করেন। যাদের সাথে তার শৈশব কেটেছে এবং যারা তার খেলার সাথী ছিল তাদের কথা মনে করে তিনি এমন করে কান্নাকাটি করছিলেন যেন তিনি ভাই কামরানের সাথে নয়, অন্য কারো সাথে লাহোর যাচ্ছেন।

গুলবদন বেগম খুবই মেধাবী, বুদ্ধিমতী, এবং প্রিয়দর্শিনী ছিলেন। সুন্দর

স্বভাবের জন্যে সকল ভাইয়ের প্রিয়পাত্রী ছিলেন তিনি। কিন্তু কামরান কর্তৃক তাঁকে লাহোর নিয়ে যাবার পেছনে অন্য কারণ নিহিত ছিল।

হয়ত মির্জা কামরান বোনকে আদর করতেন বলেই তাকে নিজের সাথে নিয়ে যাচ্ছিলেন। ভাবছিলেন, এসব যুদ্ধবিগ্রহের মাঝে গুলবদনের কোন দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। একথা ভেবেও হয়ত তাকে সাথে নিয়েছিলেন। পক্ষান্তরে এমনও হতে পারে যে, আসলে তার স্বামী খিজির খাজা খানকে হাত করার জন্যেই কামরান এই পন্থা গ্রহণ করেছেন। ওদিকে খিজির খাজার দুই ভাই পূর্বেই কামরানের বন্ধু হিসেবে পরিগণিত হন।

সম্ভবতঃ এটাই প্রথম ঘটনা যে, গুলবদন বেগম পারিবারিক পরিবেশ ছেড়ে প্রথম অন্যত্র রওয়ানা হন। গুলবদন মির্জা কামরানের নিরাপদ কাফেলায় শামিল হওয়ার লাভ এতটুকু হয়েছে যে, মির্জা হিন্দালের সাথে তার মা, বোন ও শাহী পরিবারের অন্যান্য লোকেরা পাঞ্জাবের দিকে রওনা হয়ে যে অপরিসীম দুঃখ কষ্ট ভোগ করেছে—তা থেকে তিনি বেঁচে গেছেন। হিন্দালের এই কাফেলার এমন কঠিন বিপদ ছিল যে, এদের আগে পেছনে উভয়দিকে শত্রুরা বিপদজাল বিস্তার করেছিল।

গুলবদন বেগম এবং কামরান মির্জার কাফেলা লাহোরের দিকে রওনা হয়ে যাবার পর কনৌজের লড়াই সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে হুমায়ুনের সৈন্য সংখ্যা ছিল চল্লিশ হাজার। অথচ শের শাহের মাত্র দশ হাজার সৈন্যের মোকাবিলায় এদেরকে পালিয়ে যেতে হয়েছে। কনৌজের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে হুমায়ুনের কত সৈন্য পানিতে ডুবে মরেছে তার ইয়ত্তা নেই। এ বারেও একজন সাধারণ লোক হুমায়ুনের প্রাণ রক্ষা করেছিলেন। এবারেও যুদ্ধে পলাতকের দল আগ্রার দিকে ধাবিত হয়। কিন্তু 'তারিখে রশিদির' প্রণেতা হায়দার মির্জা বলেন, আমরা আগ্রাতে না থেমে চরম হতাশ ও বিপন্ন অবস্থায় লাহোরের দিকে পালিয়ে চলে যাই।

মিসেস এনিটা হায়দার মির্জার উদ্ধৃতি নকল করে পরে বলেন, পলাতকরা সেই সিক্রিয় পথ ধরেই অগ্রসর হচ্ছিলেন, যেখানে সম্রাট বাবুর সুরম্য প্রাসাদ ও বিভিন্ন ভবন নির্মাণ করেছিলেন। লাঞ্ছিত, পরাজিত এই পলাতকরা বাবুরের এসব স্থাপত্য দেখে অবশ্যই বাবুরের স্মৃতি মনে করেছিল। অনেকটা কাটা ঘায়ে লবণের ছিটার মতো।

এসময় অনেক মহিলা আগ্রাতে থেকে গিয়েছিলেন। হুমায়ুন এই মহিলাদের নিরাপদে লাহোর পৌঁছে দেবার সমস্যাবলী নিয়ে হিন্দালের সাথে আলাপ করছিলেন। তিনি কথায় কথায় বার বার আফসোস করে বলছিলেন যে, তিনি কেন এই দুর্ঘটনা ঘটার পূর্বেই নিজের হাতে কেন আকিকা বেগমকে হত্যা করলেন না।

হুমায়ুন এই সংগীন অবস্থায় ইজ্জত সম্মান বাঁচানোর জন্যে মা বোনদের মেরে ফেলার প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু হিন্দাল এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন এবং এদের সকলকে নিয়ে তিনি আফগানদের বস্তির ভেতর দিয়ে পালিয়ে লাহোর পৌঁছেন।

লাহোরে তৈমুরী শাহজাদা এবং তাদের লোক-লস্কর এসে জমায়েত হলো এবং দীর্ঘ পাঁচ মাস তর্ক-বিতর্ক এবং নিষ্ফল আলোচনায় ব্যয় হয়। ভ্রাতৃচতুষ্ঠয়ের মাঝে প্রায়শঃ দেখাসাক্ষাৎ হতো, বিভিন্ন প্রস্তাব পেশ করা হতো। কিন্তু সকল প্রস্তাবই কার্যে পরিণত হতো না। কেননা, কামরান প্রতিটি পরামর্শের বিরোধিতা করতেন। তার বিরোধিতা থেকে এটা বোঝা যায় যে, কামরানের মগজে কিছুই ছিল না।

মির্জা কামরান চাইতেন, শের শাহের (যিনি ক্রমশঃ বিজয়কেতন উড়িয়ে এগিয়ে আসছে) সাথে একটা ফলপ্রসু আপেক্ষ আলোচনা সেরে নিতে। যে করে হোক পাঞ্জাব এবং লাহোর অধিকারে রাখতে হবে। যদি শের শাহ এই প্রস্তাবে অসম্মত হয় এবং শেষ পর্যন্ত যদি পাঞ্জাব ছেড়ে দিতে হয় তাহলে কাবুল যেন তার অধিকারে থাকেই আর হুমায়ুনকে এসব থেকে দূরে রাখতে হবে।

মির্জা কামরানের মতলব ছিল, যেহেতু হুমায়ুন তাকে কাবুল নগরী জায়গীর হিসাবে প্রদান করেছেন, নিজের জন্যে তিনি এই দান অক্ষুণ্ণ রাখবেন এবং কোন রকম হস্তক্ষেপ সহ্য করবেন না। এজন্যে হুমায়ুন যখন প্রস্তাব দিলেন যে, তিনি বদখশান রওনা হবেন, কামরান তার বিরোধিতা করেন। কেননা, বদখশানে যাবার রাস্তা কাবুলের উপর দিয়েই। এই রাস্তায় যাওয়ার সময় হুমায়ুন কাবুলে পৌঁছে যদি তাঁর পুরনো স্মৃতির টানে আর এগুতে না পারে এবং সেখানেই থেকে যায় তাহলে কামরানের সব ইচ্ছাই পণ্ড হবে। কেননা, কাবুল হুমায়ুনের প্রিয় শহর। এরি মধ্যে ১৫৪০ সালের অক্টোবর মাসে খবর এলো যে, শের শাহ সুরী অনেক কাছে এসে পড়েছেন এবং 'বিয়াস' অতিক্রম করেছেন।

গুলবদন বেগম এই সময়ের পরিস্থিতি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, তখনকার সময় ছিল কিয়ামতের মতো। ভয়ে ত্রাসে প্রায় দেড় লক্ষ লোক মুহূর্তে শহর ছেড়ে পালিয়ে গেল। যার ফলে শহরের সকল যানবাহনের ভাড়া বেড়ে গেল একমুহূর্তে। এই বিপন্ন লোকদের কপাল ভাল বলতে হবে যে, তখন 'রাভি' নদীতে পানি কম ছিল, পদব্রজে সবাই নদী পার হতে পারল। তবে চেনাব নদী পারাপারের সময় তাদের নৌকা ব্যবহার করতে হয়। ঝিলাম পর্যন্ত পৌঁছে তারা বন্যার সম্মুখীন হন।

এ সময় হায়দার মির্জা কাশ্মীরের দিকে রওনা দেন, যাতে করে শাহী পরিবারের আশ্রয়স্থল খুঁজে পাবার সম্ভাব্যতা পরীক্ষা করা যায়। শাহজাদা হিন্দাল এবং ইয়াদগার নাসের মির্জা এই দল থেকে আলাদা হয়ে মুলতান চলে যান। হেরেমের কতিপয় সদস্য হুমায়ুন বাদশাহ্কে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, এই হয়রানী এবং বিপন্ন অবস্থা থেকে রেহাই পেতে হলে মির্জা কামরানকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করা হোক। কিন্তু হুমায়ুন এই পরামর্শ মতো কাজ করতে অস্বীকার করেন। অথচ তিনি জানতেন, কামরান কোন মতেই এই শাহী কাফেলাকে কাবুলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে দেবে না।

হুমায়ুন ও বাবুরের জীবন ছিল খুবই দুর্যোগপূর্ণ এবং সংগ্রাম মুখর। কিন্তু পাঞ্জাব থেকে হুমায়ুনের লোকজনদের নাটকীয়ভাবে পলায়নের সময় যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল তার মতো সন্ত্রাসপূর্ণ দিন বোধ হয় তাদের জীবনেও আর ছিল না।

ঝিলামের পশ্চিম দিক থেকে খোশাবের দিকে যে রাস্তা চলে গেছে, তা কোহিস্থানে নমকের বহিঃঅঞ্চলের প্রান্তর বেয়ে এমন এক দু'রাস্তার সংযোগে এসে মিশেছে যেখান থেকে কাবুল এবং সিন্ধুর রাস্তা আলাদা হয়েছে। কামরান মির্জা চেষ্টা করছিলেন, শাহী ফৌজকে ডিঙ্গিয়ে তার সৈন্যসামন্ত নিয়ে এখানে আগে পৌঁছবেন এবং হুমায়ুনকে কাবুল যেতে বাধা দেবেন। এই পরিস্থিতিতে হুমায়ুন এবং কামরানের সৈন্যরা সংঘর্ষের মুখোমুখি হয়। খাপ থেকে উভয় পক্ষ তলোয়ার বের করে নিয়েছে। এমতাবস্থায় আবুল বকা নামক এক ব্যক্তি আপোষ মীমাংসার চেষ্টা করেন। তিনি হুমায়ুনকে বললেন, কামরানের সৈন্য সংখ্যা অনেক বেশী আর কামরানকে বললেন, হুমায়ুন আপনার বড় ভাই এবং বাদশাহ বটে। লোকজন নিয়ে তারই আগে যাওয়ার অধিকার আছে।

নিষ্পত্তি এ পর্যন্তই হলো। হুমায়ুনকে আগে যেতে দেওয়া হলো। তিনি কাবুলের দিকের রাস্তায় না গিয়ে সিন্ধুর রাস্তা ধরলেন। এমতাবস্থায় শাহী সৈন্যরা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে একদল হুমায়ুনের সাথে রওনা হলো, অন্যদল কাবুলের দিকে।

অধিকাংশ মহিলা কামরানের সঙ্গ নিলেন। এদের মধ্যে গুলবদন বেগমও ছিলেন। তাছাড়া গুলবদন বেগমের মাতা দিলদার বেগম পূর্বাহ্নে হামিদা বেগমকে সঙ্গে নিয়ে পুত্র মির্জা হিন্দালের সাথে মুলতানে পৌঁছেন।

মিসেস এনিটার ধারণা, খানজাদা বেগম হুমায়ুনের সাথে সিন্ধুতে চলে গিয়েছেন। হুমায়ুনের সহযাত্রীদের তালিকায় খাজা খিজির খানের নাম ছিল না। তিনি আসকরী মির্জার সাথে কান্দাহারে ছিলেন।

গুলবদন বেগম যখন ১৫৪৫ সালে হুমায়ুনের সাথে পুনরায় দেখা করেন। তিনি নিজেই বলেছেন, 'দীর্ঘ পাঁচ বছর পর আমাদের দেখা হলো।'

গুলবদন বেগম সিন্ধুর ঘটনাবলী যেভাবে বর্ণনা করেছেন তা পড়ে মনে হয় আসলে তিনি সিন্ধুতে গমন করেছিলেন। কিন্তু গুলবদন বেগম অনুরূপ ঘনিষ্ঠ-ভাবে ইরানের ঘটনাবলীও বর্ণনা করেছেন—একজন প্রত্যক্ষদর্শীর মতো। অথচ ইরানে তিনি কোনদিনই যাননি। প্রকৃতপক্ষে শ্রুত ঘটনাবলী সুন্দরভাবে তিনি লিপিবদ্ধ করতে পারদর্শী ছিলেন। সিন্ধুর ঘটনাবলী শোনার অনেক সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি। তাঁর মাতার সাথে ১৫৪৩ সালে তার দ্বিতীয়বার দেখা হয়েছিল। তিনি কান্দাহার থেকে কাবুল এসেছিলেন। গুলবদন বেগম ১৫৪৫ সালে হামিদা বানুর সাথেও দেখা করেছিলেন। এঁদের কাছ থেকে তিনি হুমায়ুনের বিবাহের চকমপ্রদ ঘটনাবলী শুনেছেন, যা 'হুমায়ুন নামার' একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায় হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। ইরানের দূতের ঘটনাবলীও তিনি শুনেছেন।

গুলবদন বেগম ও হামিদা বানু বেগম-এর অতীত ঘটনাবলী শোনার এবং আলোচনা করার একটা বিরাট অবসর মিলেছিল। গুলবদন বেগম ১৫৮৭ সালে এই গ্রন্থ রচনা করেন। এসময় উভয় ননদ-ভাবী আকবরের দরবারের পরম সম্মানিতা মহিলা হিসাবে আসীন ছিলেন। এদের একজন ছিলেন সম্রাট আকবরের মাতা এবং অপরজন ফুফী।

এছাড়াও গুলবদন বেগম খাজা কিচক-এর লেখা থেকেও সাহায্য নিয়েছেন। তিনি শাহী ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

এজন্যে এই সম্ভাবনার আর কোন অবকাশ নেই যে, গুলবদন বেগম ১৫৪০ থেকে ১৫৪৫ পর্যন্ত একাধারে কামরানের কাছে ছিলেন যখন হুমায়ুন দ্বিতীয়বার কাবুল জয় করেন।

যে দীর্ঘকাল গুলবদন হুমায়ুন বাদশাহর দর্শন থেকে বঞ্চিত ছিলেন, এসময় হুমায়ুন নানা দুঃখকষ্ট বরণ করেন। মিঃ আরস্কাইন এসব ঘটনাবলী সুন্দর-ভাবে বর্ণনা করেছেন। গুলবদন যেসব তথ্যাবলী নিজের লেখায় সন্নিবেশ করেছেন তা পড়ে অবশ্য মনে হয় মিঃ আরস্কাইন 'হুমায়ুন নামা' দেখেননি। ইরান এবং সিন্ধুতে বাদশাহ হুমায়ুনের ক্ষমতাহীন ভবঘুরে জীবনের যে আলেখ্য বর্ণনা করেছেন তার উপাদান হামিদা বানু বেগমের কাছ থেকে প্রাপ্ত। গুলবদন বেগমও তার বর্ণনার নানা সূত্রে হামিদা বানুর উল্লেখ করেছেন।

হুমায়ুন যখন সিন্ধুর অমর কোটে অবস্থান করছিলেন তখন তার সাথে হামিদা বানু বেগম ছিলেন। সম্ভবতঃ গুলবদন বেগম হামিদা বানুর কাছেই শুনেছিলেন যে, আকবর যে স্থানে জন্মলাভ করেন সেখানকার খাদ্যদ্রব্যের মূল্য খুব সস্তা ছিল।

হামিদা বানু বেগম সেই সংক্ষিপ্ত সফরেও অংশ গ্রহণ করেছিলেন, যখন কোয়েটার (দররা বোলান) পথে ইরানের দিকে পালিয়েছিলেন। হামিদা বানু বেগম ইরানের বাদশাহর আতিথ্য গ্রহণ করেন। এবং তিনি এসম্পর্কে যা কিছু বলেছেন, সর্বত্র ইরানের বাদশাহর প্রশংসাই প্রকাশ পেয়েছে। হামিদা বানু যখন কান্দাহারে ফিরে আসেন তখন ইরানের বাদশাহর সৈন্যরা তার সহযাত্রী হয়ে বিদায় সম্ভাষণ জানান।

কাবুলে গুলবদনের আত্মীয় ও বন্ধুজনের নিজের সংখ্যা ছিল প্রচুর। কাবুলে গুলবদনের নিজের বাসভবন ছিল, ছেলে পিলে ছিল। তন্মধ্যে গুলবদন বেগম 'সাদত ইয়ার' নামক পুত্রের উল্লেখ করেছেন। সাদত ইয়ার ছাড়াও তার আরো ছেলেপিলে ছিল। কিন্তু একথা বলা মুশকিল যে, খিজির খাজার ঔরসে গুলবদনের কোন সন্তান ছিল।

মির্জা কামরান গুলবদনের সাথে ততখানি দুর্ব্যবহার করেনি নি, যতটুকু দুর্ব্যবহার করেছেন অন্যান্য মেয়েদের সাথে। এসব মেয়েদের ঘরবাড়ী 'ধন-দৌলত

পর্যন্ত ছিনিয়ে নিয়েছেন তিনি। তার লেখায় এমন কোন উক্তি ছিল না, যাতে গুলবদনকে নিজের পরিবারের সদস্য হিসাবে গণ্য করেছেন। তবে মা এবং তার (মেয়ে) মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান রেখেছেন।

১৫৪৩ সালে গুলবদন বেগম দ্বিতীয়বারের মতো ভাই হিন্দালের সহযাত্রী ছিলেন যখন হিন্দাল কামরানের কাছে পরাজিত ও বন্দী হন। এ সময় কিছুদিনের ছুটি নিয়ে তিনি মায়ের কাছে কাবুলে চলে আসেন।

হুমায়ুন যখন সিন্ধুতে ছিলেন, তার সকল তৎপরতা ও খবরাখবর নিয়মিত কাবুলে পৌঁছতো।

সিন্ধুর বাদশাহ শাহ হোসাইন আরগাউন হুমায়ুনের দুরবস্থার প্রতি কেন মনযোগী হননি, তার কতগুলো কারণ ছিল 'পারিবারিক'। এ ছাড়া আর কিছু কারণ ছিল তাহলো হুমায়ুন এখানে বেশ কিছুকাল অবস্থান করেছিলেন। পারিবারিক কারণ এ জন্যে বলছি যে, সম্রাট বাবুর আরগাউন পরিবারকে কাবুল ও কান্দাহার থেকে নির্বাসিত করেছিলেন। শুধু তাই নয়, নিজের দুধভাই কাশেম-এর সাথে মকিম মির্জার মেয়ে মাহচুচককে জবরদস্তি বিয়ে দিয়েছিলেন। এই বিয়েতে মাহচুচকের অসন্তোষ ও বিদ্রোহ সম্পর্কিত কাহিনী বর্ণনা করেছেন মিঃ আরস্কাইন।

কাশেম-এর মৃত্যুর পর মাহচুচক তার চাচাতো ভাই শাহ হোসেনের সাথে পরিণয়াবদ্ধ হন। হুমায়ুন মির্জা যখন সিন্ধুতে আশ্রয় নেন তখন মাহচুচক বেগম তার স্বামীর সাথে ছিলেন। এ ছাড়াও মনোমালিন্যের দরুন শাহ হোসেনের এক সাবেক স্ত্রী এ সময় হুমায়ুনের কাছে ছিল। শাহ হোসেন বাবুরের বন্ধু খলিফা পরিবারের এক মেয়ে (গুলবুর্গ)-কে ১৫২৪ সালে বিবাহ করেছিলেন।

এ প্রসঙ্গে এটাও স্মর্তব্য যে, শাহ হোসেনের সৎ মেয়ে (কাশেম ও মাহচুচকের কন্যা) নাহিদকে খলিফার পুত্র মেহের আলী বিয়ে করেছিলেন। শাহ হোসেন এবং গুলবুর্গ-এর সম্পর্ক কোনদিন ভাল ছিল না এবং বছর দু'য়েক পর (মীর মাসুম -এর বর্ণনা মতে) ছাড়াছাড়ি হয় এদের। এই লেখকের অপর এক বর্ণনা থেকে জানা যায়, এরপর গুলবুর্গ হুমায়ুনের সাথে হিন্দুস্থান চলে আসেন (চুসার যুদ্ধের প্রাক্কালে)। কারো মতে এ ঘটনা বাবুরের মৃত্যুর পূর্বেকার। কেননা গুলবদন বেগম গুলবুর্গকে হুমায়ুনের বাসভবনে সম্রাটের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই দেখেছিলেন। গুলবুর্গ ১৫৪১ সালে হুমায়ুনের সাথে সিন্ধুতেও এসেছিলেন।

গুলবুর্গ ছাড়া সুলতানুম বেগমও (সম্ভবতঃ তার মাতা) এ সময় তাঁর সাথে ছিলেন। এরা দু'জনই হুমায়ুন এবং শাহ হোসেনের সম্পর্কোন্নয়নের ক্ষেত্রে এক বিরাট অন্তরায় হিসাবে বিরাজ করছিলেন।

১৫৪৫ সালে কাবুলে খবর এলো যে, হুমায়ুন ইরান থেকে ফিরে এসেছেন এবং ইরানের শাহের 'সৈন্যবাহিনী তার ছত্রছায়ায় রয়েছে। এই সংবাদের প্রথম প্রতিক্রিয়াস্বরূপ শিশু জালালউদ্দিন মোঃ আকবরকে খানজাদা বেগমের কাছে ন্যস্ত করা হলো। সকল ইতিহাসেই এ ঘটনার সাক্ষ্য মেলে যে, আকবর শীতের সময় কান্দাহার থেকে যাত্রা করেন। এসময় তার সাথে বখশী বানুও ছিলেন। তখন আকবরের বয়েস ছিল তিন বছর আর বানুর বয়েস ছিল চার বছর।

তার এহেন আগমন খানজাদা বেগমকে ইতিহাসের একজন হৃদয়বান নারী হিসাবে চিহ্নিত করে। আকবরকে তার কোলে তুলে দিতেই তার হাতেপায়ে চুমো দিয়ে বললেন, এই শিশুর হাত পা অবিকল তার দাদা বাবুর বাদশাহর মতো।

স্মর্তব্য যে, এই খানজাদা বেগম বাবুরের প্রাণ রক্ষার্থে শত্রু মহলে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ করতে রাজী হন এবং এভাবে বাবুরের প্রাণরক্ষা করেন। এই স্বামীর সাথে খানজাদা বেগমের তখনই বিচ্ছেদ হয় যখন বাবুরের সাথে তাদের স্বার্থের দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে ওঠে। তারাও বুঝতে পারল যে, খানজাদা বেগম আসলে বাবুরের স্বার্থে কাজ করে যাচ্ছে। খানজাদা বেগম ১৫১১ খ্রীস্টাব্দে বাবুরের কাছে ফিরে আসেন। এ সময় খানজাদা বেগমের বয়েস ছিল তেত্রিশ বছর। যে ব্যক্তির সহযোগিতায় খানজাদা বেগম বাবুরের কাছে ফিরে আসতে সমর্থ হয়েছেন, তাঁর নাম শাহ ইসমাইল। তার তৃতীয় বিবাহ হয়েছিল মেহদী খাজার সাথে। মেহদীর কোন সন্তান হয়নি। এজন্যে তিনি মেহদীর বোন সুলতানমকে নিজের মেয়ে হিসাবে গ্রহণ করেন। তাকে প্রতিপালন করে পরে হিন্দালের কাছে বিয়ে দেন।

মার্চের একুশ তারিখে হুমায়ুন কান্দাহার অবরোধ করেন এবং একজন দূত পাঠালেন কাবুলে। কাবুলে এই দূতের যথেষ্ট সমাদর করা হয়। এ দূতটি ছিলেন বৈরাম খান। তার সাথে অন্য লোকটি ছিলেন বায়েজিদ বিয়াত। তিনি এখানে আকবরকে দেখেন, যাতে করে তার খবরাখবর হামিদা বানু বেগমকে জানানো

যায়। বৈরাম খান কয়েকজন শাহজাদার সাথেও দেখাসাক্ষাৎ করেন। এরা সকলে মির্জা কামরানের বন্দীশালায় ছিলেন। এরা হলেন মির্জা হিন্দাল, ইয়াদগার নাসের, সোলায়মান মির্জা ও ইব্রাহিম মির্জা।

বৈরাম খান ছ'সপ্তাহ কাবুলে অবস্থান করেছিলেন শুধু একটি বিষয় বুঝবার জন্যে। তাহলো, মির্জা কামরান টের পেয়েছেন যে, তার ভাই হুমায়ুন এখন সবচাইতে বেশী শক্তিশালী। এমতাবস্থায় তার (কামরান) কি পন্থা অবলম্বন করা উচিত। কাবুল থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় তাঁর সাথে খানজাদা বেগমও ছিলেন, যাতে করে তিনি হুমায়ুনকে নম্র হওয়ার পরামর্শ দিতে পারেন। আর আসকরী যদি অস্ত্র সমর্পণ করতে রাজী হন তাহলে তার জন্যে একটা উপযুক্ত পন্থা খুঁজে নেয়া যায়।

খানজাদা কান্দাহারে পৌঁছে শহরে উপনীত হলেন। কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে তার এই আগমনের কোন প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। এবং এদিকে শ্বাসরুদ্ধকর কষ্টদায়ক অবরোধ কবে থেকেই চালু রয়েছে।

দীর্ঘ বিলম্বিত অবরোধ সহ্য করতে না পেরে অনেক আমীর-ওমরাহ আসকরীর সঙ্গ ত্যাগ করেন। ফলে, ৩রা ডিসেম্বর আসকরী অস্ত্র সমর্পণ করেন এবং হুমায়ুনের খেদমতে হাজির হন। হুমায়ুন আসকরীকে ক্ষমা করেন। হুমায়ুন এরপর আসকরী ও তার লোকজনদের জন্য একটি বিরাট প্রীতিভোজের আয়োজন করেন। এদের জন্য মদেরও বন্দোবস্ত করা হয়েছিল।

ভোজ শেষে আসকরী যখন মজা করে মদ পান করছিলেন এমন সময় কে একজন আসকরীর লিখিত (হুমায়ুনকে গ্রেফতার করার জন্য বেলুচ সর্দারকে লিখিত) সেই চিঠিখানি সামনে মেলে ধরলো। হুমায়ুন আসকরীর সামনে এ পত্র মেলে ধরা ছাড়া আর কিছুই বললেন না। কারণ, ক্ষোভ প্রকাশ করার জন্যে এটাকেই মোক্ষম পন্থা মনে করলেন।

কান্দাহারের অপরাধের বিলুপ্তি এবং বাদশাহী সৈন্যদের কাবুল অভিমুখে রওনা হবার খবর যখন মির্জা কামরানের কাছে পৌঁছে তখন তিনি কাবুলে ছিলেন। এই সৈন্যদলের পথ আগলাবার জন্যে কামরান এক বাহিনী প্রেরণ করেন। এই সৈন্যবাহিনী যুদ্ধ না করেই পরাজয় বরণ করে এবং বাধ্য হয়ে কামরানকে গজনীর দিকে পালিয়ে যেতে হলো। গজনী থেকে কামরান পরে সিন্ধুতে পৌঁছেন।

দীর্ঘ পাঁচ বছর পর গুলবদন ভ্রাতা সম্রাট হুমায়ুন-এর সাক্ষাৎ লাভ করেন। তাদের এই সাক্ষাৎ ১৫৪৫ সালের ১৫ই নভেম্বরে সংঘটিত হয়। এরপর বেশ কিছুকাল কাবুলে শান্তিশৃংখলা ছিল। হামিদা বেগম বসন্ত কালে কাবুলে আসেন। তাঁর গর্ভে এক কন্যা সন্তান জন্ম লাভ করেছিল। এই মেয়ের জন্ম হয়েছিল ইরানে। হামিদা বানু কাবুলে এলে হুমায়ুনের কৌতূহল হলো যে, দেখা যাক দীর্ঘ ১৪ মাস আকবর মায়ের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোয়েটাতে ছিল, এখন সে মাকে চিনতে পারে কি না। হুমায়ুন তাকে মায়ের কামরায় পৌঁছে দিলেন। কামরায় হামিদা বানু ছাড়াও অনেক মহিলা ছিলেন। আকবর তার মাকে চিনে ফেললো এবং দু'হাত প্রসারিত করে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরল। আবুল ফজল এ ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, আকবরই শুধু মাকে চিনে ফেলল এটা ঠিক নয়। আকবরকে দেখে মা হামিদাবানু বেগমের মুখে বাৎসল্য সুলভ হাসি ফুটে উঠল। সেই অনুপম হাসি হামিদা বানু ছাড়া আর কারো মুখে ছিল না।

এই বসন্ত ঋতুতেই হুমায়ুন বদখশান অভিযানে রওনা হন। বদখশান থেকেই কাবুলের গভর্নর খাজা মোহাম্মদ আলীকে পয়গাম পাঠিয়ে বললেন, "ইয়াদগার নাসেরের বিশ্বাসঘাতকতা প্রমাণিত হয়েছে, তাকে হত্যা করে ফেল।"

খাজা মোহাম্মদ আলী এই নির্দেশ পালনে অক্ষমতা জানিয়ে বললেন, 'যে ব্যক্তি কোনদিন একটা পাখীও মারে নাই, সে কেমন করে নাসেরকে হত্যা করবে?'

খাজা মোহাম্মদ আলী নম্র ও দয়ালু স্বভাবের লোক ছিলেন। এজন্যে তার বদলে অন্য একজনকে নাসেরকে হত্যার নির্দেশ দেন এবং সে নাসেরকে হত্যা করে।

হুমায়ুন যাবার সময় আসকরীকে সঙ্গে নিয়েছিলেন। মহিলাদের মধ্যে মাহ চুচক বেগম তার সাথে ছিলেন। তার আর্দালী ছিলেন বিবি ফাতেমা। ইনি হুমায়ুনের সশস্ত্র মহিলা স্কোয়াডের নেত্রী ছিলেন। ইনি জোহরা বেগমের মাতা ছিলেন যার সাথে হামিদা বেগমের ভাইর বিয়ে হওয়ার কথা ছিল।

'খসম' এলাকায় হুমায়ুন কঠিন রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। চারদিন একেবারে অজ্ঞান অবস্থায় ছিলেন। সেবিকাগণ তাঁর প্রাণ বাঁচাবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করেন। চারদিন গত হবার পর মাহচুচক প্রথমবারের মতো তার মুখে খেজুরের রস দেন এবং ক্রমে তিনি চোখ খুলেন এবং তার জ্ঞান ফিরে আসে।

যদিও তার শরীর অনেকটা সেরে এলো, কিন্তু এসময়টা খুবই সংকটাপন্ন ছিল তার জন্যে। তার এই মারাত্মক অসুখের খবর সিন্ধুতে যেয়ে পৌঁছল। সেখানে কামরান মির্জা অবস্থান করছিলেন। কামরান বিলম্ব না করে তার শ্বশুরের কাছ থেকে সহযোগী অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে দিন রাত উর্ধ্বশ্বাসে পথ চলতে চলতে কাবুলের দিকে আসতে থাকেন।

এদিকে হুমায়ুনের সাথে যে ক'জন আমীর-ওমরাহ ছিলেন তাদের কয়েকজন হুমায়ুনের সঙ্গ ত্যাগ করে কাবুলে চলে যান। কেননা, কামরান এদের প্রতিশোধে তাদের পরিবারবর্গের উপর অত্যাচার করতে পারে। এরা হুমায়ুনের সাথে বিশ্বাসঘাতকা করেননি। হুমায়ুনের বিরোধীও ছিলেন না। তবু তাদের পরিবারবর্গের নিরাপত্তার জন্যে তারা কামরানের সাথে দেখা করেন।

মির্জা কামরান কাবুল আক্রমণ উপলক্ষে দারুণ ত্রাসের সৃষ্টি করেন। প্রথমেই মোহাম্মদ আলী খাজাকে হত্যা করেন। এরপর অন্যান্যদের পালা।

কাবুলে কামরানের আগমন সংবাদ পেয়ে হুমায়ুন ত্বরিৎ বদখশান থেকে কাবুলে রওনা দেন। বরফ পতনের সময় ছিল সেটা। পথিমধ্যে তাকে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। যাহোক, কাবুলে পৌঁছে তিনি নগর অবরোধ করেন। যখন কামরান বুঝতে পারলেন যে, তিনি টিকতে পারবেন না, নগর দ্বারের ফটক বন্ধ করে তিনি কেটে পড়লেন। কেউ বলেন মির্জা হিন্দাল, কেউ বলেন হাজি মোঃ খান কোকা কামরানকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেন।

কামরান কাবুল থেকে পালিয়ে উজবেকদের কাছে আশ্রয় নেন।

হুমায়ুন ১২ই জুনে দ্বিতীয়বার বদখশান অভিযানে রওনা হন। হামিদা বানু বেগম, আকবর ও গুলবাহার তার সঙ্গে ছিলেন।

এবারে রওনা হবার প্রাক্কালে হুমায়ুন একজন সৈন্য এবং কামরানের বিরোধী একজনকে কাবুলের শাসনভার অর্পণ করেন। এবারে কামরান মির্জা যদি অতর্কিতে কাবুল আক্রমণ করে তাহলে দৃঢ়তার সাথে যেন তার প্রতিরোধ করা চলে। কিন্তু এ সময় মির্জা কামরান 'তালেকানে' ছিলেন। পথিমধ্যে হুমায়ুনের সাথে তার প্রচণ্ড লড়াই হলো। কামরান মির্জা ১৭ই আগস্ট হুমায়ুনের সামনে অস্ত্র সমর্পণ করেন। তাকে অনুমতি দেয়া হলো তিনি যেন অন্যান্য অবাঞ্ছিত আমীর-ওমরাহদের সাথে মক্কা (নির্বাসনে) চলে যান।

কামরান মির্জা যখন জানতে পারলেন যে, অন্যান্য অভিযুক্ত আমীর-ওমরাহ-দের ক্ষমা করা হয়েছে, তখন কামরান মির্জাও ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

হুমায়ুন এটাই আশা করেছিলেন। হুমায়ুন ভাইকে ঢাকঢোল বাজিয়ে স্বাগত জানান। ভাইকে দেখে তার চোখ ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল।

মিঃ আরস্কাইন বলেন, কামরান যখন হুমায়ুনের সামনে আসেন, মোনেম খানের হাত থেকে রশি নিয়ে নিজের গলায় জড়িয়ে নিয়ে নিজেকে একজন দোষী হিসাবে ভাইয়ের সামনে পেশ করেন। হুমায়ুন তা দেখে চীৎকার করে বলে উঠেন : ছি, এ সবের কোন দরকার নেই। ওটা গলা থেকে ফেলে দাও।

কামরান তিনবার মাথা নত করে কুর্নিশ জানান। হুমায়ুন ত্বরিৎ এগিয়ে গিয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে নিলেন। অতঃপর তাকে নিজের পাশে বসতে দিলেন। কামরান মির্জা পুরনো কথা তুলে নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা ও ক্ষমা প্রার্থনা করেন। হুমায়ুন বললেন, 'যা হয়ে গেছে তা আর বলো না। আমরা পার্থিব জীবনকে বড় করে জেনেছি। এসো আর একবার ঠিক ভাইয়ের মতো আলিঙ্গন করি।' একথা বলে উঠলেন এবং আবেগ ভরে ভাইকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। দীর্ঘ সময় জড়িয়ে ধরে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে থাকেন। উপস্থিত সকলের মাঝেও এর একটা প্রতিক্রিয়া ছড়িয়ে পড়ে।

হুমায়ুন দ্বিতীয়বার যখন মসনদে বসেন, কামরানকেও তার ডান পাশে বসান এবং তুর্কী ভাষায় বললেন, আমার পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসো। এর পর শরবতের গ্লাস আনতে বললেন। শরবত এলে অর্ধেক তিনি পান করলেন, অর্ধেক ভাইকে পান করতে দিলেন।

ভাইয়ের সাথে পুণর্মিলন উপলক্ষে একটা বিরাট উৎসবের আয়োজন করা হয়। চার ভাই একত্রে বসে খাবার খেলেন এবং একই মসনদে পাশাপাশি বসলেন। এই আনন্দোৎসব দু'দিন স্থায়ী হয়েছিল।

যেহেতু তাড়াহুড়া করে মির্জা কামরান তার শিবিরের সাজ সরঞ্জাম ফেলে চলে এসেছিলেন এজন্যে হুমায়ুন তার শিবিরের কাছেই কামরানের জন্য দুটো শিবিরের পত্তন করেন। মির্জা আসকরীও অনুমতি নিয়ে কামরানের সাথে অবস্থান করেন।

মিসেস এনিটা এই কাহিনী বর্ণনা করে বলেন, কোলাকুলি, অশ্রুবর্ষণ ও সৌজন্য বিনিময় ছাড়াও হুমায়ুন কামরান মির্জাকে 'কোলাব'-এর জায়গীর প্রদান

করেন। পূর্বে এখানে বাবুর ও হুমায়ুনের প্রতিনিধি (নায়েব) হয়ে হরম বেগমের পিতা শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। তার মৃত্যুর পর তার পুত্র চাকর আলী মির্জা কামরানের অনুগ্রহ লাভ করে।

এই জায়গীর পেয়ে কামরান মির্জা খুশী হননি। যে লোকটি জায়গীর প্রদানের পরওয়ানা নিয়ে তার কাছে এলো, তাকে তিনি অভিযোগ করে বললেন এটা তো বদখশানের একটা জেলা মাত্র। আমি তো পুরো কাবুল ও বদখশানের বাদশাহ ছিলাম। সেস্থলে আমি কেমন করে এইটুকু ক্ষুদ্র জায়গীর নিয়ে দিন গুজরান করব।

যে লোকটি পরওয়ানা বহন করে নিয়েছিল, তার ধারণা ছিল কামরান বেশ বুদ্ধিমান বাদশাহ হবেন। কিন্তু তার কথাবার্তা শুনে তার ধারণা পাল্টে গেল। লোকটি বলল, 'অপরাধ ক্ষমা করবেন, আমার মনে হয় আপনাকে কোন জায়গীর প্রদান না করাই সমীচীন ছিল।'

মির্জা কামরানের পাশাপাশি মির্জা আসকরীকেও একটা জায়গীর প্রদান করা হয়। দু'ভাইকে এই জায়গায় বসিয়ে ১৫৪৮ সালে হুমায়ুন কাবুলে ফিরে আসেন।

পরবর্তী বছর অর্থাৎ ১৫৪৯ সালে হুমায়ুন উজবেক ও বলখদের বিরুদ্ধে এক অভিযানের প্রস্তুতি নেন। মিসেস এনিটা বলেন, এসময় সৈন্য বাহিনীতে শৃংখলা না থাকা সত্ত্বেও এই প্রস্তুতি সুসম্পন্ন হলো। সিদ্ধান্ত হলো, বসন্তকালে এই বাহিনী গন্তব্যস্থলে রওনা হবে।

বসন্ত কাল এলে মহিলামহল ইচ্ছা প্রকাশ করলেন যে, প্রকৃতির রঙীন দৃশ্যাবলী দেখার জন্যে ভ্রমণে বের হতে হবে। বিশেষ করে 'রেওযাজ' ফুল এর সমারোহ (পাহাড়ী ফুল) দেখার জন্যে তাদের বেজায় উৎসাহ।

হুমায়ুনের কাছে এ অভিপ্রায় ব্যক্ত করা হলে তিনি বললেন, বদখশানে রওনা হবার সময় মহিলারাও এ দলভুক্ত হয়ে পাহাড়ী ফুলের সমারোহ দেখার জন্যে পাহাড় পর্যন্ত যাবে।

সৈন্যবাহিনী রওনা হলে মহিলাগণও রওনা হলেন। বিশ মাইল পর্যন্ত ফুলের সমারোহ ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করেন, অতঃপর সৈন্যরা সামনের দিকে এগিয়ে যায় (আর মহিলাগণ ফিরে আসার মনস্তাপ করেন)।

হুমায়ুন কামরান মির্জার মন জয় করার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করেন। এই

অভিযানে কামরান সহযোগিতা দান করবেন এমন একটা কথা থাকা সত্ত্বেও যথা সময় কামরান সে কথা পূরণ করেন নি। অনুরূপভাবে গোলচেহারার স্বামী উজবেক শাহজাদাও বিশ্বাসভঙ্গ করে। শাহী সৈন্য উজবেকদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হচ্ছে একথা শুনে পথিমধ্য থেকেই সে পালিয়ে গেল।

এই অভিযানে শাহী ফৌজ দুশমনদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবার পূর্বেই পিঠটান দেয়। আমীর-ওমরাহদের মধ্যে একটা ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছিল যে, কামরান মির্জা যেহেতু এতে অংশগ্রহণ করেননি, নিশ্চয়ই তিনি কাবুল আক্রমণ করার ফন্দি আঁটছেন।

এ ব্যাপারে আমীর-ওমরাহগণ এতখানি বেইমানী করে যে, হুমায়ুনকে প্রায় একাকী ফেলে রেখে সকলে চলে যায়। উজবেকরা হুমায়ুনের শিবির আক্রমণ করে পলায়ন পর অনেক লোককে হত্যা করে আর হুমায়ুনের ঘোড়াকে আহত করে। এছাড়া উজবেকরা হুমায়ুনের সাথে আর কোন অসদাচরণ করেনি।

পলাতক সৈন্যরা কাবুলে পৌঁছে দেখল কাবুল সুরক্ষিত, কামরান তখনো সেখানে পৌঁছেনি। বলা হয়ে থাকে, কামরান মির্জা হুমায়ুনের সাথে এজন্যে যোগ দেননি যে, তার সাথে ইব্রাহিম ও সোলায়মান মির্জা একত্রিত হয়েছিলেন, আর এদের সাথে কামরানের ভাল সম্পর্ক ছিল না।

গুলবদন বেগম এ সম্পর্কে একটি ঘটনা ব্যক্ত করেন, যে জন্যে কামরান মির্জার সাথে এ দু'জনের মনোমালিন্য হয়। ঘটনাটা ঘটেছিল কামরান যখন 'কোলাবে' ছিলেন। তাঁর উপদেষ্টাদের মাঝে এক অঘটন পটিয়সী নারী ভোর্খান বেগম ছিল। এই নারী তাকে পরামর্শ দেয় যে, সোলায়মান মির্জার স্ত্রী হেরেম বেগমের সাথে চিঠির আদান প্রদান এবং প্রেম নিবেদন করুন। এই নারী এই পরামর্শ এজন্যে দিয়েছিল যে, বদখশানের সৈন্যদের ওপর হেরেম বেগমের একটা প্রভাব ছিল। জানিনা এই নারী কামরানকে কি আকাশকুসুম স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন যে, কামরান সত্যি একদিন প্রেমপত্র ও একখানি সুরভিত রুমাল এক মেয়ে দুতের মাধ্যমে হেরেম বেগমের কাছে প্রেরণ করেন।

হেরেম বেগম এই রুমাল এবং চিঠি পেয়ে তো একেবারে অগ্নিশর্মা। চারদিকে যেন ভূ-কম্পন শুরু হলো। হেরেম বেগম রুমাল এবং প্রেমপত্র তার স্বামী এবং পুত্রের সামনে রেখে কামরানকে যা ইচ্ছে-তাই গালাগাল দিলেন। অথচ

কামরান সম্পর্কে তার ভগ্নিপতি ছিল। তা সত্ত্বেও তার জ্বালাময়ী কথা দিয়ে স্বামী মির্জা সোলায়মান ও পুত্রকে খুব উত্তেজিত করেন।

যে মেয়েটি রুমাল ও পত্র নিয়ে গিয়েছিল তাকে তখনি হত্যা করে টুকরা টুকরা করে ফেলা হলো এবং কামরান মির্জার সাথে চিরতরে বৈরী সম্পর্ক হয়ে গেল।

মিসেস এনিটা গুলবদন বেগমের উক্তির উধৃতিদিয়ে বলেন: মির্জা কামরানের বদখশান অভিযানে যোগ না দেওয়ার কারণ বিশ্বাসঘাতকতা নহে, বরং এটা একটা দুর্ঘটনা।

যা হোক, কামরান এবং হুমায়ুনের মাঝে আর একবার বিচ্ছেদ সূচিত হলো। কামরান পুনরায় ভাইয়ের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে উদ্যত হলেন এবং কাবচাকের শিবিরে হঠাৎ করে আক্রমণ করলেন। উভয় পক্ষে ভীষণ লড়াই হল। উভয় পক্ষের অনেক গণ্য-মান্য ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল। এই যুদ্ধের দৃশ্য মির্জা কামরানের স্ত্রীপুত্রগণ দূরে দাঁড়িয়ে অবলোকন করছিল। বায়েজিদ বায়েত এই পক্ষের মহিলাদের সম্পর্কে বলেন, সকলেই মাথায় পাগড়ী বেঁধে নিয়েছিল, দৌড়ে পালাবার প্রয়োজন হলে তখন যেন নির্বিবাদে দৌড়াতে পারে। লোকরা মনে করবে পুরুষ দৌড়াচ্ছে। এই যুদ্ধে হুমায়ুন দারুণভাবে আহত হন। খিজির খাজা এবং মীর সৈয়দ বরকা তিরমিজি হুমায়ুনকে আশ্রয় দেন। অতি কৌশলে তাঁকে ঘোড়ার উপর থেকে নামিয়ে খচ্চরের পিঠে চড়িয়ে যুদ্ধের ময়দানের বাইরে নিয়ে আসে। হুমায়ুন এত বেশী আহত হয়েছেন যে, রীতিমত বেহুশ হয়ে পড়েছিলেন। যখন আহত হন সে সময় তিনি তার (জররাবক্তর) যুদ্ধাস্ত্র তার ভৃত্যের কাছে অর্পণ করেন। কিন্তু পালিয়ে আসার সময় তা যুদ্ধের ময়দানেই পড়েছিল এবং তা কামরানের হস্তগত হয়। কামরান তা নিয়ে কাবুলে চলে আসেন এবং লোকদের দেখিয়ে বললেন যে, হুমায়ুন আর বেঁচে নেই। এই সংবাদ রটনার পর অতি সহজেই কামরান কাবুল দখল করেন এবং দিব্যি বাদশাহ বনে বসলেন।

মিসেস এনিটা জাওহারের এক উক্তির বরাত দিয়ে বলেন, মনে হয় হুমায়ুনের অবস্থা এ সময় খুবই খারাপ ছিল। তিনি যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম, শিবিরের আসবাবপত্র ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়েছিলেন। প্রচণ্ড শীতের রাত ছিল, অতিকষ্টে রাত অতিবাহিত করেন। সকাল হলে তাঁর ক'জন

অনুগত সৈন্য এসে দেখা করলো। এদের নেতৃত্ব করছিলেন হাজি মোঃ কোকা। হাজি মোঃ কোকা অতি যত্ন সহকারে হুমায়ুনকে একটা নিরাপদ জায়গায় নিয়ে এলেন যেখানে বেশ রৌদ্র কিরণ ছিল। হুমায়ুনকে রৌদ্রে শুইয়ে দিয়ে তার ক্ষত স্থানগুলোতে ব্যাণ্ডেজ করতে থাকেন। হুমায়ুন বসে নামাজ পড়লেন এবং এক-জন ভৃত্যের কাছ থেকে একটা কোট চেয়ে নিয়ে গায়ে দিলেন। এ সময় সেই এলাকার এক বুড়ি মেয়েলোক সেখানে এলো। বৃদ্ধা তাঁকে একটা রেশমী পাজামা পরতে দিলো। পরনের রক্তাক্ত পাজামা বদল করে সেটি পরানো হলো। অবশ্য এ পাজামাটি মেয়েদের ছিল। তা সত্ত্বেও পাজামাটি তিনি পরলেন আর বুড়িকে তার সমুদয় সরকারী খাজনা থেকে আজীবন অব্যাহতি দান করেন।

হুমায়ুন পশ্চিম মুখ হয়ে বসেছিলেন। হুমায়ুনের ভক্তদের মধ্য থেকে সুলতান মোহাম্মদ কারহোয়াল নামক একজন তার জীবন হুমায়ুনের জন্যে উৎসর্গ করার প্রস্তাব করেন, যেমন বাবুর হুমায়ুনের রোগশয্যায় করেছিলেন। হুমায়ুন লোক-টিকে অশেষ ধন্যবাদ জানান, কিন্তু তাকে এই কাজ থেকে বিরত থাকতে বলেন।

প্রায় তিনমাস ধরে কাবুলের লোকরা মনে করে বসে আছে যে হুমায়ুন আর বেঁচে নেই। অনেক আমীর-ওমরাহ হুমায়ুনের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে কামরানের দলে যোগদান করেন।

কামরান কাবুল অধিকার করার সময় আকবর সেখানে ছিলেন। কামরান ও আসকরী তার সাথে কোন দুর্ব্যবহার করেননি বরং তার ব্যাপারে বিশেষ যত্নবান হন। অবশ্য বলা হয়ে থাকে যে, হুমায়ুন যখন কাবুল অবরোধ করেন এবং দুর্গে তোপ-কামান বর্ষণ করেন তখন কামরান আকবরকে দুর্গ শীর্ষে দাঁড় করিয়ে দেন।

গুলবদন বেগমও এই অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করেন। তা সত্ত্বেও গুল-বদন একথা বলেননি যা অন্যান্য ঐতিহাসিকরা বলে গেছেন যে, মহম আংগা এ সময় নিজেকে আকবরের ঢাল হিসেবে আকবরের সামনে গিয়ে দাঁড়ান। গুলবদন বেগম এই শক্তিমতী মহিলার কথা আর কোথাও বলেন নি। যা হোক, যদি এ ঘটনাকে সত্য বলে ধরে নেয়া হয় যে, মির্জা কামরান শাহজাদা আকবরকে তোপ-কামানের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন, তার মানে এই নয় যে, আকবরের সাথে দুর্ব্যবহার করা হয়েছে।

কথিত আছে, আসকরীর স্ত্রী আকবরকে কোয়েটাতে (হুমায়ুনের পালিয়ে যাবার সময়) কোলে তুলে নিয়েছিলেন এবং তাকে খুব আদর করতেন। এখানে

এটাও স্মর্তব্য যে, কামরান ইতিপূর্বে আকবরকে খানজাদা বেগমের কাছে সোপর্দ করেছিলেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, কামরান মূলতঃ হুমায়ুনের দুশমন ছিলেন না। যদি দুশমনই হতেন তাহলে আকবরকে হাতে পেয়ে তার উপর নির্যাতন চালিয়ে বা অন্য কোন অঘটন ঘটিয়ে তার ইচ্ছা চরিতার্থ করতেন।

মিসেস এনিটার কাছে এই ঘটনাটি খুবই বিস্ময়কর মনে হয়েছে যে, কামরান মির্জা শাহী পরিবারের গণ্যমান্য মহিলাদের কাছে আব্দার করেছিলেন যেন তার নামে খোৎবা পাঠ করার অনুমতি দেয়া হয়। গুলবদন বেগমও বলেন, কামরান নিজের নামে খোৎবা পাঠ করার পূর্বে পরিবারের সকলের সাথে এ ব্যাপারে আলাপ করেন। এ ব্যাপারে দীর্ঘ বিতর্কের সূত্রপাত হয় এবং বিষয়টি নিয়ে দিলদার বেগম থেকে খানজাদা বেগম পর্যন্ত সকলে আলোচনা করেন।

মিসেস এনিটা গুলবদন বেগমের উক্তির সূত্রে বলেন যে, আসলে কামরান সকল বিষয়ে খারাপ ছিলেন এমন কথা বলা ঠিক হবে না।

হুমায়ুন এ সময় ইন্দেরাবে ছিলেন। তার ক্ষত দিন দিন সেরে উঠছিল আর ওদিকে সৈন্যরাও তাঁর জীবিত হবার সংবাদ পেয়ে তাঁর চারদিকে জমা হতে লাগল। অতঃপর বদখশানের সৈন্যদের ওপর বিরাট প্রভাবশালী, খুবই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি হেরেম বেগমও পর্দার বাইরে চলে এলেন।

এ সময় মির্জা ইব্রাহীম এবং সোলায়মান কোথায় ছিলেন তা জানা যায়নি। তবে এটুকু বলা হয়েছে যে, হুমায়ুন বাদশাহ হেরেম বেগমকে এক পত্র লেখেন এবং বদখশান সৈন্য বাহিনীকে তলব করেন। হেরেম বেগম এই পত্র পাওয়ার পর নিজেই সৈন্য সংগঠনের কাজে নেমে পড়েন। কয়েক হাজার সৈন্য একত্রিত করে নিজেই তাদের পরিচালনা করে 'দোররা' অবধি নিয়ে আসেন এবং তাদেরকে প্রয়োজনীয় সকল আদেশউপদেশ দিয়ে ইন্দেরাবের দিকে প্রেরণ করে তিনি নিজের বাড়ীতে চলে আসেন।

মিসেস এনিটা বলেন, সম্ভবতঃ এ সময় মির্জা ইব্রাহিম ও সোলায়মান হুমায়ুনের সাথে ছিলেন। আর হেরেম বেগম যে সৈন্য প্রেরণ করেন তা ছিল 'কমক'-এর সৈন্যবাহিনী।

যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে হুমায়ুন মির্জা কামরানের সাথে সন্ধি স্থাপনের চেষ্টা করেন। কিন্তু কামরান এবং তার সেনাপতি কেরাচা খান কোনমতেই কাবুল হস্তান্তর করতে নারাজ।

আরো একটি প্রস্তাব পেশা করা হয়েছিল যে, কামরানের কন্যার সাথে আকবরের বিবাহ সম্পন্ন করে এদের নামে কাবুল ছেড়ে দেয়া হোক। কিন্তু কামরান মির্জা এ প্রস্তাবেও রাজী হননি।

অতঃপর যুদ্ধ হলো। যুদ্ধে হুমায়ুন জয় লাভ করেন। এ সময় হুমায়ুনের সবচাইতে আনন্দঘন মুহূর্ত ছিল এটা যে, আকবরকে তার শিবিরে পৌছে দেয়া হলো। হুমায়ুন আকবর সম্পর্কেই বেশী রকম চিন্তিত ছিলেন। আকবরকে পেয়ে অনেক দানখয়রাত করেন এবং শপথ করে বলেন যে, আর কোনদিন প্রিয়তম পুত্রকে কাছ ছাড়া করবেন না।

এই যুদ্ধের সময় আরো একটি চমকপ্রদ ঘটনা হলো, হুমায়ুন তার দু'টি উটের পিঠে পাণ্ডুলিপি ও বইপুস্তকের যে সম্ভার তুলে দিয়েছিলেন, সে দু টি উট 'দোররা কাবচাকে' নিখোজ হয়েছিল। কিন্তু এ যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই এই উট দুটো হঠাৎ সশরীরে শিবিরে এসে হাজির হলো।

উটের পিঠের এসব গ্রন্থাবলী ও পাণ্ডুলিপির মধ্যে ফারসী ভাষায় রচিত বহু মূল্যবান দিওয়ান (কাব্য সংকলন) ছিল। হুমায়ুন এসবের বেশ কদর করতেন, কিন্তু নিজে কাব্য রচনা করতে পারতেন না।

মির্জা কামরান পরাজিত হয়েও হুমায়ুনের সৈন্যদের উপর 'মরণ কামড়' হানতে চেষ্টা করেন এবং যার ফলে মির্জা হিন্দালকে নির্মমভাবে প্রাণদান করতে হয়েছে। মির্জা হিন্দালের এই নির্মম হত্যাযজ্ঞের পর মির্জা কামরানকে বাধ্য হয়ে পালিয়ে যেতে হয়। তিনি প্রথমে সেলিম শাহ সুরীর সাহায্য প্রার্থনা করেন। অতঃপর 'আদম গখর'-এ পৌছেন। আদম তাকে হুমায়ুনের কাছে পৌছে দেন। হুমায়ুন সভাষদ ও অন্যান্যদের পরামর্শক্রমে কামরানের চোখের পল্লব সেলাই করে দেন এবং বাকী জীবন মক্কাতে অতিবাহিত করার অনুমতি দেন।

সকল ঐতিহাসিকরা এ ব্যাপারে এক মত যে, কামরানের আরগাউন স্ত্রী মাহচুচক অন্ধ স্বামীর সাহার্য্যার্থে থাকেন। তাছাড়া হুমায়ুনের ভৃত্যদের একজন (নাম—চালমা বেগ) এই হতভাগ্য মির্জা কামরানের সাথে থাকে।

অন্ধ কামরান চারবার হজ্জ করার সৌভাগ্য লাভ করেন। অতঃপর ১৫৫৭ সালে ৫ই অক্টোবর তিনি পরলোকগন করেন। স্ত্রী মাহচুচক বেগমও কামরানের মৃত্যুর সাত মাস পর মৃত্যুবরণ করেন। কামরান মির্জার স্ত্রীদের সম্পর্কে মন্তব্য

করে বলা হয়েছে যে, অন্ধত্বের সময় আমরণ তাঁর সাথে এক স্ত্রী ছিলেন। কিন্তু অন্যান্য স্ত্রীদের সম্পর্কে কোন কিছু বলা হয়নি।

মিসেস এনিটার মতে, ইতিহাসে মাহচুচকের নাম এজন্যে রয়ে গেছে যেহেতু তার পিতা শাহ হোসাইন অন্ধ স্বামীর সাথে তাকে যেতে বাধা দান করেছিলেন। কিন্তু মাহচুচক জিদ ধরেছিলেন যে, তিনি যাবেনই। অন্যান্য স্ত্রীদের কথা ইতিহাসে এজন্যে উল্লেখিত হয় নাই যেহেতু অন্ধ স্বামীর সাথে যাবার ব্যাপারে কেউ তাদের পথ রোধ করেনি। কোন রকম বাঁধা ছাড়াই অন্যান্য স্ত্রীরা তার সাথে রওনা হয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে অন্যান্য স্ত্রীরাও অন্ধ কামরানের সাথে ছিলেন। হুমায়ুন নামার উর্দু অনুবাদক রশিদ আক্তার নদভী মিসেস এনিটার এ উক্তির ব্যাপারে একমত নন। কেননা, কামরান মির্জা শেষবারের মতো যখন পলায়ন করেন তখন সাথে তার কোন স্ত্রী ছিল না। তার স্ত্রীরা পেছনে রয়ে গেছে। কামরান যখন সেলিম শাহ সুরীর কাছে পৌঁছেন, মেয়েদের পোশাক পরিধান করে তিনি পলায়ন করেন। তখন নিশ্চয়ই ঐতিহাসিকরা বলতেন যে, তাঁর স্ত্রীরা তার পেছনে রয়ে গেছে। তিনি যখন 'আদম সখর' পৌঁছেন তখনও তিনি একাকী ছিলেন, কোন মেয়েলোক ছিল না তার সাথে।

মিসেস এনিটা বলেন, কত ভালো হতো, মির্জা কামরান যদি তার কোন আত্মজীবনী লিখে যেতে পারতেন। যদিতিনিও বাবুরের মতো কোন আত্মজীবনী অথবা কোন বিশ্বস্ত লোক তার কোন জীবনালেখ্য লিখে রাখতেন তাহলে আজ চিত্রের অপর পিঠ সম্পর্কেও অবহিত হওয়া যেতো। সত্যিকারভাবে জানা যেতো যে, কামরান মির্জার আশাআকাঙ্ক্ষা এবং জীবনের উদ্দেশ্য কি ছিল।

মিসেস এনিটা বলেন, বিশ্বস্ত ভাইদের কাহিনী শেষ করার পূর্বে এটা বলা প্রয়োজন যে, মির্জা আসকরীও মক্কা যাবার অনুমতি প্রাপ্ত (১৫৫১) হয়েছিলেন এবং সাত বছর জীবিত থেকে ১৫৫৮ সালে বদখশান এবং দামেস্কের মধ্যবর্তী একটা শহরে মৃত্যুবরণ করেন। অতএব আসকরীর চরিত্রের এই দিকটি বেশ সুস্পষ্ট যে, সহোদর ভ্রাতা কামরানের তিনি ছিলেন পুরো বিশ্বস্ত অনুচর। লক্ষ্যনীয় যে, আসকরী ভাই কামরানের মৃত্যুর এক বছর পরে মৃত্যুবরণ করেন। নিঃসন্দেহে ভ্রাতৃশোকেই কিছুকাল পর তার মৃত্যু হয়।

১৫৫১ সালের পরবর্তী পারিবারিক ঘটনাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে মিসেস

এনিটা বলেন, সর্বাগ্রে মির্জা সোলায়মানের স্ত্রী হেরেম বেগমের পুত্র ইব্রাহিমের সাথে হুমায়ুনের কন্যা বখশী বানুর বিবাহ সম্পন্ন হয়।

হুমায়ুন বাদশাহ অতঃপর বদখশানের সবচাইতে শক্তিশালী এই মহিলা হেরেম বেগমের সাথে সম্পর্ক আরো নিবিড় করার জন্যে তার মেয়ে শাহজাদা খানমকে বিয়ে করার জন্যে দুজন কাসেদ (খাজা জালালুদ্দিন মাহমুদ মীর সামান ও বিবি ফাতেমা) প্রেরণ করেন। এই কাসেদদ্বয় পৌঁছবার পর হেরেম বেগম তাদেরকে বললেন, 'এমন একটা প্রস্তাব নিয়ে আসার জন্যে তিনি তোমাদের ছাড়া আর কোন লোক পেলেন না? যাক কথা যা-ই হোক, প্রস্তাবটি সমর্থন লাভ করেনি। অবশ্য শেষাবধি তাঁর পুত্র মোহাম্মদ হালিম মির্জার সাথে হেরেম বেগমের কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহ সুসম্পন্ন হয়। এভাবে হেরেম বেগম ও হুমায়ুনের মাঝে দু'রকমের আত্মীয়তার বন্ধন সুদৃঢ় হয়।

সোলায়মান মির্জা বেশ রোমান্টিক লোক ছিলেন। ১৫৫৭ সালে কামরান মির্জার মৃত্যুর পর তার স্ত্রী মোহতারেমা খানম চুগতাইর প্রতি তার দৃষ্টি নিপতিত হয় এবং পরে তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেন। কিন্তু হেরেম বেগমের মতো মেয়ে এটা কোনদিনই বরদাস্ত করবে না যে, মোহতারেমা তার সপত্নী হয়ে আসবে। তিনি এ প্রস্তাব রদ করে দেন এবং মির্জা সোলায়মানের এ অভিপ্রায় যাতে পদদলিত হয় এজন্যে বরং তার পুত্র ইব্রাহিমের সাথে এই মহিলার বিয়ে দেন।

মির্জা কামরান ২০শে নভেম্বর মির্জা হিন্দালকে হত্যা করেন। গুলবদন বেগম এই শোক সহ্য করতে পারেননি। তিনি এ সম্পর্কে বলেন, হিন্দালের বদলে যদি তার স্বামী খাজা খিজির অথবা তার পুত্র নিহত হতেন তাহলে এত দুঃখ হতো না। গুলবদন বেগম ভাই হিন্দালকে খুব ভাল বাসতেন।

গুলবদন বেগম ছাড়াও শাহী পরিবারের অন্যান্য মহিলারাও হিন্দালের মৃত্যু শোকে বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন। বিশেষতঃ তিনমাস ধরে তারা হুমায়ুন মৃত বলে শোক পালন করে আসছিলেন, কিন্তু তিনমাস পর যখন সে ভ্রম কেটে গেল তখন হিন্দালের মৃত্যু সংবাদ বয়ে নিয়ে এলো নিদারুন শোকাবহ স্মৃতি।

খিজির খাজার জায়গীর অঞ্চলে হিন্দাল নিহত হয়েছিলেন এজন্যে হুমায়ুন তাকে হুকুম দিলেন যে, আমানতস্বরূপ হিন্দালের শবদেহ সেখানে দাফন করা হোক। পরে এই লাশ তুলে নিয়ে বাবুরের কবরের পাদদেশে সমাহিত করা হয়।

হিন্দাল বত্রিশ বছর বয়সে নিহত হন। মৃত্যুকালে তার রোকেয়া নাম্নী এক মেয়ে ছিল এবং সম্রাট আকবরের প্রথমা পত্নী ছিলেন তিনি। তার গর্ভে আকবরের কোন সন্তানাদি হয় নি। এই মেয়ে চুরাশী বছর বয়েসে আকবরের মৃত্যুর কয়েক বছর পর মারা যান।

এটা পাঠকদের দুর্ভাগ্য যে, গুলবদন বেগম বিরচিত 'হুমায়ুন নামা' মির্জা কামরানের চোখের পল্লব সেলাই করে দেযার পরই হঠাৎ শেষ হয়ে যায়। আক-বরের সিংহাসন আরোহণের তখনও তিনবছর বাকী। ইতিহাসে গুলবদন বেগমের নাম আকবরের সিংহাসন আরোহণের প্রথম বছরে কাবুল থেকে হিন্দু-স্থানে আসার সময়ে—কোথাও উল্লেখ নেই।

এ সময়ে শাহী পরিবারে এক বিরাট বিপর্যয় সূচিত হয়। এজন্যে গুলবদনের পাণ্ডুলিপির বিনষ্টপ্রাপ্ত পৃষ্ঠাগুলোর ঘটনাবলী জানবার প্রয়োজনীয়তা আজ অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। সত্যি, ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের ঘটনাবলী ও তথ্য এভাবে অনুদ্ঘাটিত রয়ে গেল।

যা হোক, কামরান মির্জার চোখের পল্লব সেলাই করার চার বছর পর হুমায়ুন বাদশাহ এতখানি শক্তিশালী হয়ে ওঠেন যে, হিন্দুস্থান ভূখণ্ডে আবার ভাগ্য পরীক্ষা করতে সচেষ্ট হন। ১৫৫৪ সালের ১৫ই নভেম্বর তিনি কাবুল থেকে হিন্দু-স্থানে রওনা হন। সাথে ছিলেন শাহজাদা আকবর। তিনি ক্রমান্বয়ে সাফল্যের সিংহদ্বারে পৌছেন এবং ১৫৫৫ সালের ২৩শে জুলাই দ্বিতীয়বার দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন।

হুমায়ুনের সিংহাসনে আরোহণের ঘটনা প্রসঙ্গে মিসেস এনিটা সদ্দি আলী রইস নামক একজন পর্যটকের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বর্ণনা করেন। তুরস্কের সোলায়মানে আজম (আলেকজাণ্ডার) নৌঅধ্যক্ষ এই পর্য্যটক এই সংক্ষিপ্ত সময়ে ভারতে পদার্পণ করে হুমায়ুনের দরবারে পৌছেন। যেহেতু পথে ঘাটে দাঙ্গা, রাহাজানি ও বিপদাপদ ছড়িয়ে ছিল। নিরাপত্তার জন্যে তিনি ক'জন উচ্চপদস্থ অফিসার ও ৫০ জন সৈন্য সহ সুরাত থেকে লাহোর পৌছেন এবং সেখান থেকে নিজের দশ তুর্কীতে পৌছেন। এই সফরের সময় তিনি যেখানেই যান, মুসলমানরা তাদের পূর্ব প্রভু সোলায়মানে আজম (আলেকজাণ্ডার)-এর সুবাদে তার প্রতি খুব সম্মান প্রদর্শন করেন। হুমায়ুন তার দরবারের এক উচ্চ আসনে তাকে বসাবার প্রস্তাব দেন। কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন।

তিনি যখন সিন্ধুতে পৌছেন, তখন শাহ হোসাইন আরগাউন বার্ধক্যজনিত রোগে আক্রান্ত। পর্যটক সিদ্দি বলেন, এসময় বাদশাহ আরগাউন তার রাজত্বের চল্লিশ বছরে উপনীত হন। শেষের পাঁচ বছর তিনি এত বেশী দুর্বল হয়ে পড়েন যে, তিনি ঘোড়ার পৃষ্ঠে পর্যন্ত বসতে পারতেন না। কোথাও যেতে হলে নৌকায় চড়ে যেতেন।

অন্য এক বইতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শাহ হোসেন যে ধরনের জ্বরে ভুগছেন, তার পক্ষে নদীর আবহাওয়া বেশ উপযোগী। এজন্যে প্রায়শঃ তিনি নদীতেই সময় অতিবাহিত করতেন। নৌ-অধ্যক্ষ পর্যটক সিদ্দি আলী সিন্ধুতে অবস্থান কালে শুনেছিলেন যে, শাহ হোসেনের স্ত্রী মাহচুচক মির্জা তুর্খানের কাছে বন্দী ছিলেন, পরে শাহ হোসেনের কাছে চলে আসেন। পর্যটক সিদ্দি বলেন, তিনি লোকদের মুখে শুনেছেন যে, মাহচুচক বেগম শাহ হোসেনকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেছে। এর স্বপক্ষে যুক্তি হলো যে, মাহচুচক বন্দীদশা থেকে ফিরে আসার মাত্র ১০ দিনের মধ্যেই শাহ হোসেন মৃত্যুবরণ করেন।

মিসেস এনিটা এ কথার প্রতিবাদ করে বলেন, একাহিনী যদি সত্য হতো তাহলে মৃত্যুর পর শাহ হোসেনের শবদেহ মাহচুচক বেগম মক্কাতে প্রেরণ করতেন না। বলাবাহুল্য, অন্তিম ইচ্ছা অনুযায়ী স্ত্রী স্বামীর জন্যে এ কর্তব্য সম্পাদন করেন। যাতে তার আত্মা শান্তি পায়।

সিদ্দি আলীর সফরের চমকপ্রদ দিক হলো তিনি প্রথমবার হুমায়ুনের প্রজাদের সাথে দেখা করেন এবং লাহোর পৌছেন আগস্টের শুরুতে। তিনি এই সময় লাহোর পৌছেন এবং লাহোরের গভর্ণর তাকে পথ প্রদর্শন করতে অসম্মত হয়ে বলেন, আপনি বাদশাহ হুমায়ুনের সাথে দেখা না করা পর্যন্ত এখান থেকে যেতে পারবেন না।

গভর্ণর তুর্কী নৌ-অধ্যক্ষের আগমনের খবর দ্রুতগামী কাশেদ-এর মাধ্যমে বাদশাহকে অবহিত করেন। হুমায়ুন নৌ-অধ্যক্ষকে ডেকে পাঠান। অক্টোবরের পনের তারিখে তাকে দিল্লীর উপকণ্ঠে এক বিরাট অভ্যর্থনা জানান হয়। খান খানান বৈরাম খান ও অন্যান্য আমীর-ওমরাহ এক হাজার অশ্বারোহী, চারশো হাতী সহ উপস্থিত ছিলেন। রাতের বেলা তিনি বৈরাম খানের সাথে আহার করেন এবং পরে হুমায়ুনের সকাশে উপস্থিত হন।

সম্রাট হুমায়ুন চেষ্টা করেছিলেন এই নৌ-অধ্যক্ষকে তার দরবারে রেখে দেবেন। যদি একান্তই তিনি না থাকেন, অন্ততঃ দরবারের জ্যোতিষীদের যেন কতগুলো মৌলিক দীক্ষা দান করে যান।

এই নৌ-অধিকর্তার সবচাইতে আকর্ষণীয় দিক হলো তিনি চুঘতাই তুর্কীতে চমৎকার কবিতা রচনা করতে পারতেন। এজন্যে হুমায়ুন তাকে আলী শের-নাওয়াই (দ্বিতীয়) বলে উপাধি দান করেন।

এই সফরে নৌ-অধ্যক্ষ একটি মহান রাজনৈতিক দায়িত্বও পালন করেন। সিন্ধুর সুলতান মাহমুদ ভক্কর এবং হুমায়ুনের মধ্যকার একটি চুক্তির মুসাবিদা তিনি তৈরী করেন। এবং তাতে হুমায়ুনের হাতের ছাপ (জাফরান রং-এ প্রদত্ত) দিয়ে সুলতান মাহমুদ ভক্কর-এর কাছে প্রেরণ করেন।

সুলতান মাহমুদ ভক্কর এবং তার উজির এতে খুব খুশী হন এবং নৌ-অধ্যক্ষের দ্বারা সম্পাদিত এই চুক্তি-নামার জন্যে তাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানান। তিনি এই চুক্তির ওপর ভিত্তি করে কবিতা রচনা করেন। এছাড়া অন্যান্য বিষয়েও তিনি দরবারে কবিতা এবং গজল পাঠ করেন, যার ফলে তিনি হুমায়ুনের আরো নৈকট্য লাভ করেন। অতঃপর এক সময় তার দেশে ফিরে যাবার ইচ্ছা প্রবল হলো। তার এই ইচ্ছাও কবিতার মাধ্যমে তিনি বাদশাহ্‌কে জানান। তার এই কবিতাও এতখানি হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল যে, তিনি খুশী হয়ে এই গুণী পর্যটককে দেশে ফিরে যাবার অনুমতি দেন এবং অনেক উপঢৌকনও সাথে দেন।

সিদ্দি আলী সবে দিল্লী ত্যাগ করে নিজের দেশে রওনা দিয়েছেন এমন সময় এক দুর্ঘটনা ঘটে এবং সম্রাট হুমায়ুনের প্রাণনাশ হয়।

দিনটি ছিল শুক্রবার। হুমায়ুন জুমার নামাজের পর নিজের লাইব্রেরীতে সময় কাটাচ্ছিলেন। শের শাহের নির্মিত ভবন 'শের মঞ্জিল'-এর দ্বিতীয় তলার এক কক্ষে হুমায়ুন কাবুল থেকে আগত চিঠিপত্র পড়ছিলেন। তাছাড়া ক'জন হজ্বফেরতা বন্ধুবান্ধব এসেছিলেন, হুমায়ুন তাদের মুখে নির্বাসিত ভাইদের খবরাদি শুনছিলেন। এরপর হুমায়ুন সিঁড়ি দিয়ে নামছিলেন। তিনি সবে সিড়ির দ্বিতীয় সোপানে পা রেখেছেন এমন সময় পার্শ্ববর্তী মসজিদে আজান দেয়। হুমায়ুনের অভ্যাস ছিল যখনি আজান ধ্বনি শুনতেন মাথানত করে 'রুকু' ভঙ্গি করতেন। এ সময়েও অভ্যাসবশে আজান শুনে রুকু ভঙ্গি করেন এবং পা পিছলে পড়ে যান।

অন্যত্র বলা হয়েছে, তাঁর হাতে যে ছড়ি ছিল তা হঠাৎ সিড়িতে ফসকে যায়, ফলে তিনিও পিছলে পড়েন এবং গড়াতে গড়াতে সিড়ির শেষ সোপানে যেয়ে পড়েন। এতে তাঁর মাথায় এবং বাহুতে ক্ষত হয়।

কেউ কেউ বলেন, হুমায়ুন এ সময় সজ্ঞান অবস্থায় ছিলেন এবং এ সময় তিনি নিজের অবস্থা বর্ণনা করে পুত্র আকবরকে চিঠি লেখেন।

সিদ্দি আলী এ দুর্ঘটনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব। এজন্যে অনুমিত হয়, হুমায়ুন মাথায় এবং গায়ে এত চোট পেয়েছিলেন যে, তিনি একেবারে বেহুশ হয়ে পড়েছিলেন। এর তিন দিন পর হুমায়ুন মৃত্যুমুখে পতিত হন। ১৫৫৬ সালের ২৭ শে জানুয়ারীতে তাঁর তিরোধান ঘটে। এ সময় তাঁর বয়েস হয়েছিল ৪৮ বছর।

সিদ্দি আলী এ ঘটনা বর্ণনা করার প্রাক্কালে 'ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজেউন' পড়েছিলেন।

সিদ্দি আলী বলেন, তিনি এ ব্যাপারে একটি পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, শাহজাদা আকবর না পৌঁছা পর্যন্ত হুমায়ুনের মৃত্যু সংবাদ যেন গোপন রাখা হয়। এই পরামর্শানুযায়ী কাজ করা হয় এবং এ ব্যাপারে কতগুলো মিথ্যার আশ্রয় নেয়া হয়। এক ব্যক্তি হুমায়ুনের পোশাক পরে নকল বাদশাহ সেজে দরবারে আসেন। আমীর-ওমরাহ তার উদ্দেশ্যে কুর্নিশ জানান এবং তার রোগমুক্তির জন্যে আনন্দোৎসবের আয়োজন করা হয়। এমতাবস্থায় সিদ্দি আলী বিদায়ের অনুমতি নেন এবং সর্বত্র হুমায়ুনের মিথ্যা রোগ মুক্তির খবর ছড়াতে ছড়াতে লাহোরের উদ্দেশ্যে চলেন।

সিদ্দি আলী লাহোর পৌঁছে জানতে পারলেন, আকবর সিংহাসনে বসেছেন এবং তার নামে খোৎবা পাঠ করা হচ্ছে।

এবারেও সিদ্দি আলীর লাহোরে যাত্রা রোধ করা হয় এবং তাকে কলাফুরে যেতে বাধ্য করা হয়। সেখানে তিনি বাদশাহ আকবরের দর্শন লাভ করেন। সিদ্দি আলী তার নিজের দেশে ফিরে যাবার জন্যে ব্যাকুল ছিলেন। তিনি আকবরকে হুমায়ুনের দেয়া 'পরোয়না' প্রদর্শন করেন। আকবর তার প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করে সিদ্দি আলীকে অনেক অর্থ উপঢৌকন এবং এক সৈন্য বাহিনী সহ কাবুলে যাবার অনুমতি দেন।

সিদ্দি আলী দেশ ত্যাগ করার সময়টা ছিল রাত্রি বেলা। কেননা, আশংকা ছিল পথে না আবার 'আদম গখর'-এর সাথে দেখা হয়ে যায় আর তাকে আবার গ্রেফতার করে ফেলে। আদম গখরই মির্জা কামরানকে পাকড়াও করে হুমায়ুনের হাতে সোপর্দ করেছিলেন।

কাবুলে পৌঁছে সিদ্দি আলী হুমায়ুনের পুত্রদ্বয় মোহাম্মদ হাকিম মির্জা ও ফররুখ ফালের সাথে দেখা করেন। এরা দু'জনই ১৫৫৩ সালে একই মাসে জন্মলাভ করেছিলেন। একজনের মা ছিলেন মাহ চুচক ও অপরজনের খানেশ আগা খাওয়ারেজমী।

মিসেস এনিটা বলেন, সিদ্দি আলীর এ তথ্য সম্পূর্ণ বিস্ময়কর, কেননা বায়েজিদ বিয়াতের মতে ফররুখ ফাল সম্রাট হুমায়ুনের মৃত্যুর ক'দিন পরই মৃত্যু বরণ করেছিলেন। যদি সিদ্দি আলীর কথা সত্য হয় তাহলে বায়েজিদের উক্তি অমূলক, অথচ বায়েজিদের বর্ণনা এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত রয়েছে।

সিদ্দি আলী কাবুল শহরের সৌন্দর্যের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। বরফে আবৃত কাবুলের বাড়ী এবং বৃক্ষরাজির বর্ণনা রয়েছে তার লেখায়। কাবুলের স্রোতস্বিনী নদীরও বর্ণনা করেছেন তিনি নানা স্থানে। কাবুলে অবস্থানের সময় তিনি চারদিকে আনন্দের সমাবেশ দেখতে পেয়েছিলেন। সর্বত্র তার সমাদর এবং নিমন্ত্রণের হিড়িক ছিল। তিনি কাবুলে মোনেম খানের সাথেও দেখা করেন। মোনেম খান তাকে জানান, নগর এলাকা তেমন নিরাপদ নয়। পথে ঘাটে এমন লোক জমা হয়ে থাকে যারা বিদেশী মেহমানদের কোন কদর রাখতে জানে না। এজন্যে স্থানীয় একজন নেতা তাকে নিয়ে একটি সংকীর্ণ পথে রওনা দেন। পথটি খুবই দুর্গম ছিল, কিন্তু নিরাপদ ছিল। পথটি তালেকানগামী ছিল। অতঃপর তারা তালেকান এবং বদখশান পৌঁছেন। সেখানে মির্জা সোলায়মান ও মির্জা ইব্রাহিমের সাথে দেখা হয়। এদের দু'জনকে সিদ্দি কবিতা এবং গজল পাঠ করে শোনান। তবে তিনি হেরেম বেগম সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব ছিলেন।

আকবরের আমল

মিসেস এনিটা তার বিবরণে ইতিহাসের সেই করিৎকর্মা লোকদের বিবরণ পেশ করেন যাদের কল্যাণে আকবর উন্নীত হয়েছেন উচ্চ শিখরে আর যার ফলে

শাহী খান্দানের মহিলা সম্প্রদায়কে আর শত্রুদের উৎপাতে বিপন্ন হয়ে এখান থেকে সেখানে পালিয়ে বেড়াতে হয়নি।

মৃত্যুর পূর্বে হুমায়ুন কাবুল থেকে শাহী খান্দানের মহিলাদের হিন্দুস্থানে নিয়ে আসার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু এ পরিকল্পনা কার্যকরী করার পূর্বেই তিনি পরলোক গমন করেন। আকবর সিংহাসনে আরোহণের পর এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার জন্যে কয়েকবারই হুকুম জারি করেন এবং তা বাতিল করেন। বাতিল হয়েছে তিনটি যুদ্ধগত কারণে। প্রথমতঃ, আবুল মা আলীর বিদ্রোহ দমন। দ্বিতীয়তঃ, সিকান্দার আফগানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা এবং সর্বশেষ হিমুর সাথে যুদ্ধ।

শেষাবধি শাহী খান্দানের মহিলাদের আনয়নের জন্য এক বাহিনী সৈন্য মোতায়েন করা হলো। এই বাহিনীর নেতৃত্ব যেসব আমীর-ওমরাহের হাতে ন্যস্ত করা হলো তাদেরকে বাড়তি দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে বলা হলো কাবুলে পৌঁছে প্রথমে সোলায়মান মির্জার কুশলাদি যেন জিজ্ঞেস করা হয়। সোলায়মান মির্জা হুমায়ুনের মৃত্যু সংবাদ শুনে কাবুল অবরোধ করে রেখেছিলেন।

সম্রাট আকবরের সৈন্য বাহিনী কাবুলের উপকণ্ঠে পৌঁছলে মির্জা সোলায়মান মোকাবেলা করার সাহস হারিয়ে ফেললেন। তবে এক শর্তে তিনি আকবরের সৈন্য বাহিনীর হাতে কাবুল ছেড়ে দিতে রাজী হলেন, আর তা হলো চলতি সপ্তাহের জুমাবারে যেন তার নামে খোৎবা পাঠ করা হয়।

আকবরের লোকরা স্বচ্ছন্দে এ প্রস্তাব মেনে নিলেন এবং জুমাতে তাঁর নামে খোৎবা পাঠ করা হলো। মির্জা সোলায়মান এতেই সন্তুষ্ট হয়ে বদখশান রওনা হয়ে যান আর ওদিকে শাহী পরিবারের মহিলাগণও হিন্দুস্থান রওনা হন।

এই কাফেলা ১৫৫৭ সালের রবিউল আউয়াল মাসের মতো শুভ সময়ে 'মানকোট' পৌঁছেন। পূর্ব থেকেই আকবর সেখানে শিবির রচনা করে অবস্থান করছিলেন। তাদেরকে স্বাগত জানাবার জন্যে আকবর শিবির ছেড়ে আরো এক মনজিল এগিয়ে গেলেন। আকবর তাঁর মাতা হামিদা বানু বেগম-এর সাথে দ্বিতীয়বার মিলিত হতে পেরে যার-পর-নাই আনন্দিত হন। তাঁর মাতার সাথে ফুফী গুলবদন বেগম, গুলচেহারা বেগম, হাজি বেগম, সলিমা বেগম এবং অজ্ঞাতনামা আরো অনেক মহিলা ছিলেন।

মিসেস এনিটা বলেন, সম্ভবতঃ এই (অজ্ঞাতনামা) মহিলা সম্প্রদায় যতদিন এখানে শিবির ছিল, এখানেই ছিলেন, অতঃপর কাফেলার সাথে লাহোরে আসেন এবং সেখান থেকে দিল্লী আসেন। এই কাফেলা যখন জলন্ধর পৌঁছে সলিমা বেগমের (বাবুরের বংশোদ্ভূত) সাথে বৈরাম খানের বিবাহ সম্পন্ন হয়। সলিমা হুমায়ুনের সৎ ভাতিজী এবং আকবরের চাচাত বোন ছিলেন।

আল্লামা আবুল ফজল বলেন, হুমায়ুন তাঁর জীবদ্দশাতেই এই বিবাহের পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন এবং জলন্ধরে তা সম্পন্ন করা হলো।

মিসেস এনিটা বলেন, কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে সলিমা সুলতানার বয়েস এসময় পাঁচ বছর ছিল। কিন্তু সলিমার জীবন সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্য থেকে তা নিশ্চিত করে বলা যায় না।

এই বিবাহ বৈরাম খানের জন্যে একটা উপহারস্বরূপ ছিল। হিন্দুস্থানে হুমায়ুনের ক্ষমতাকে নতুনভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে বৈরাম খানের অসাধারণ ত্যাগ ও সংগ্রামের প্রতিদান ছিল এই কন্যাদান। বৈরাম খান এর চাইতেও বড় উপঢৌকন পাবার যোগ্য ছিলেন। তিনি হুমায়ুনের জামাতা হবার যোগ্য ছিলেন। তার জ্ঞান, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, বিশ্বস্ততা এবং উন্নত মানের কর্মদক্ষতা দিক দিয়ে তিনি ছিলেন সমকালীন সকল আমীর-ওমরাহের শীর্ষস্থানীয়।

সলিমা সুলতানা যদিও তেমন যোগ্যতাসম্পন্ন মেয়ে ছিলেন না, তবু বৈরাম খানের স্ত্রী হবার যোগ্যতা তার পুরোপুরি ছিল। বেশ বুদ্ধিমতী এবং লেখাপড়া জানতেন। ভাল কবিতা পাঠ করতে পারতেন এবং সামগ্রিকভাবে সব গুণাবলী ছিল তার মধ্যে।

গুলবদনের স্বামী খিজির খাজা ১৫৫৪ সালে হুমায়ুনের সাথে হিন্দুস্থানে এসেছিলেন এবং ১৫৫৬ সালের প্রথম দিকে আকবর তাঁকে লাহোরের গভর্ণর মনোনীত করেন। আকবর তাকে সিকান্দর আফগানকে নিপাত করার জন্যে প্রেরণ করেছিলেন, যখন তিনি হিমু বকালের সাথে পানিপথে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। সিকান্দর আফগানের কাছে খিজির খাজা পরাজিত হয়েছিলেন। খিজির খাজা সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে যা কিছু জানা যায় তা থেকে অনুমিত হয় তিনি ভাল সমরকৌশলী ছিলেন না। এজন্যে তাকে পরবর্তীকালে তেমন কোন দায়িত্বপূর্ণ কাজ দেয়া হয়নি। তবে তিনি একজন ভাল দরবারী লোক ছিলেন। একবার তিনি

আকবরকে ভালজাতের কতগুলো ঘোড়া উপঢৌকন দিয়েছিলেন। ১৫৬৩ সালে আকবর যখন আহত হন খিজির খাজা তার ক্ষতস্থানে মলম ও পট্টি বাঁধার ব্যাপারে খুব সহযোগিতা করেছিলেন। পরবর্তীকালে আমীরুল-ওমরাহ (প্রধান সভাসদ) হবার সৌভাগ্য হয়েছিল তার। কিন্তু আইনে আকবরীতে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নামের তালিকায় তার নাম সন্নিবেশ করা হয়নি। তবে 'তবকাতে নিজামুদ্দিনে' পাঁচ হাজার আমীর-ওমরাহের (সভাসদ) মধ্যে তার নাম তালিকাভুক্ত করা হয় ১২ নং ব্যক্তি হিসাবে।

১৫৫৭ সালে গুলবদন বেগম যখন হিন্দুস্থানে আসেন তখন থেকে ১৫৭৪ সাল (যখন তিনি হজ্জে গমন করেন) পর্যন্ত ঐতিহাসিকরা তার সম্পর্কে কোন মন্তব্য রাখেননি।

এই দীর্ঘ বিরতি গুলবদন বেগম এবং সমসাময়িক মহিলাদের জন্য চমকপ্রদ ঘটনা বই কি। এ সময়ে যেসব লোকরা বৈরাম খানকে সম্রাট হুমায়ুনের একান্ত বিশ্বস্ত হিসাবে কাজ করতে দেখেছে, পরবর্তীকালে বৈরাম খানের পতনকে বিশেষ তাৎপর্যের সাথে লক্ষ্য করেছেন।

এমনিতে হামিদা বেগম বৈরাম খান কেন্দ্রিক ষড়যন্ত্র সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। কেননা, তার পতনের মূলে ছিলেন মহম বেগম, আওহাম খান এবং শাহাবুদ্দিন নিশাপুরি। শাহাবুদ্দিন নিশাপুরি ছিলেন দিল্লীর গভর্নর। হামিদা বেগম সেখানেই থাকতেন। আকবরকে বৈরাম খান থেকে আলাদা করার যে ষড়যন্ত্র পাকানো হয় তার প্রাথমিক কাজ হিসাবে আকবরকে মায়ের সাথে দেখা করাবার জন্যে দিল্লী নিয়ে আসা হয়—যাতে করে পুরো ষড়যন্ত্রটা শাহাবুদ্দিন-এর নেতৃত্বে পরিণতি প্রাপ্ত হয়।

হামিদা বেগমের স্মৃতিশক্তি এতখানি দুর্বল ছিল যে, তিনি বৈরাম খানের পূর্বেকার সকল সুকর্মের কথা ভুলে যান। ইরানে তিনি হুমায়ুনের জন্যে যেসব দুঃসাধ্য কাজ করেছেন তা কিছুই যেন তার মনে ছিল না।

সম্ভবতঃ শাহাবুদ্দিন নিশাপুরির মতো একজন ধর্মীয় নেতার একটা বিরাট প্রভাব ছিল হামিদা বানু বেগম-এর উপর।

শাহাবুদ্দিন আহমদ বৈরাম খানের পতনের জন্য যে চেষ্টাচরিত্র করেন তার বিস্তারিত বিবরণ জানা যায়নি। অবশ্য এই ষড়যন্ত্রের মূল কুশলী ছিলেন আওহাম

খান। তিনি বৈরাম খানকে আকবরের কাছে (কানকথা বলে) খারাপ প্রতিপন্ন করার কোন ক্রটি বাকী রাখেন নি।

মহম আংগা নাদিম খান কোকার স্ত্রী এবং হুমায়ুনের বিশ্বস্ত সেবিকা ছিলেন। একজন ধাত্রী মাতার মতো সব রকম কর্তব্য তিনি পালন করেছেন এবং শেষ অবধি তিনি আকবরকে সন্তুষ্ট রাখতে চেষ্টা করেছেন। এতদসঙ্গে তার নিজের সন্তানদের স্বার্থ চিন্তাও ছিল বেজায়রকম। তবে এটা নিসন্দেহে বলা চলে যে, আওহাম খানের জন্যে তিনি যেটুকু চেষ্টা দেখিয়েছেন, নিজের বড় সন্তানদের জন্য সে অনুপাতে উপরে তোলার চেষ্টা তিনি করেননি। বায়েজিদ বিয়াত মহম আংগা সম্পর্কে এমন অনেক কথা লিখেছেন, যা পড়ে মনে হয় তিনি আওহাম খানের প্রতি বিশেষ প্রসন্ন ছিলেন।

মিসেস এনিটা বলেন যে, তিনি মহম আংগা সম্পর্কে যা কিছু পড়েছেন, তাতে প্রতীয়মান হয় মহম আংগা খুব বেশী বুদ্ধিমতি সুশীলা মহিলা ছিলেন না। তার যা কিছু মূলধন ছিল তা হলো আকবরের ভালবাসা এবং হামিদা বানু বেগমের অনুগ্রহ। তা ছাড়া আহমদ জামী বংশের মহিলাগণ তার শক্তিমত্তার বশ ছিল। তন্মধ্যে হুমায়ুনের স্ত্রী হাজি বেগম-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যদিও তিনি আকবরের বিমাতা ছিলেন, তবু তার প্রতি আকবরের শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম।

বৈরাম খানের মৃত্যুর পরবর্তী বছরে আওহাম খান (তবকাতের মতে) মালুহ্-এর বাজবাহাদুর সুরের সাথে যুদ্ধ করতে যান। সকল দরবারী এবং সভাসদ-এর তুলনায় আকবর তার প্রতি একটু উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। কেননা, তিনি ছিলেন মহম আংগার পুত্র আর আকবর মহম আংগাকে তার আপন মায়ের ন্যায় মনে করতেন। বৈরাম খানের মৃত্যুর পর মহম আংগা প্রধান মন্ত্রীর সমতুল্য মর্যাদা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। মোনেম খানকে খানে খানান (প্রধান সভাসদ) মর্যাদা প্রদান করা হলো। আংগা চেষ্টা করতেন মোনেম খান যাতে প্রধান মন্ত্রীর পদ লাভ করতে পারে।

বাজবাহাদুর আওহাম খানের কাছে পরাজিত হয়ে সারেংপুরের দিকে পালিয়ে গেল।

হিন্দুধর্মের রীতি অনুযায়ী বাজবাহাদুর এরপর হুকুম দিলেন মেয়েদেরকে

নিজের হাতে হত্যা করে ফেলতে হবে। ক'জন মেয়ে এই হুকুমের শিকারে পরিণত হলো, ইতিমধ্যে শাহী ফৌজ ঘটনাস্থলে উপনীত হলো।

বাদায়ুনী আওহামের ওপর অভিযোগ আনয়ন করে বলেন, তিনি অনেক লোকজন হত্যা করেন এবং সহকর্মী পীর মোহাম্মদকে সঙ্গে করে শহরময় একটা ত্রাসের সৃষ্টি করেছিলেন।

আওহাম খান বাজবাহাদুরের নর্তকী রূপমতীর সাথে খুব সদ্ব্যবহার করেন। বাজবাহাদুর পালিয়ে যাবার পর সে নিজের দেহ ক্ষত করেছিল (আত্মহত্যার মানসে)।

আওহাম তা দেখে খুব প্রভাবান্বিত হন এবং তাকে কথা দেন যে, তার পুরাপুরি দেখাশুনা তিনি করবেন এবং তার প্রভুর কাছে তাকে ফিরিয়ে দেবেন। রূপমতী আওহাম খানের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে দ্রুত তার ক্ষত ভাল হওয়ার জন্যে মলম ইত্যাদি লাগিয়ে চিকিৎসা করতে লাগল।

সে যখন সুস্থ হলো আওহাম খান রূপমতীকে তার প্রভুর কাছে না পাঠিয়ে বরং নিজের জন্যে মানোনীত করলেন।

কিন্তু আওহাম খান প্রথম রাতে যখন রূপমতীর বাসর ঘরে প্রবেশ করেন, তাকে মৃত অবস্থায় পান।

মিসেস এনিটা রূপমতীর প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে বলেন, এই কাহিনীটিতে একটি মজলিসি অপমানের দিক অনুদ্‌ঘাটিত রয়েছে। রূপমতীর জন্ম হয়েছিল পাপের পৃথিবীতে। তবে ব্যক্তিগতভাবে তার কোন দোষ ছিল না। এছাড়া তার একটি মাত্র মন ছিল। তার দুর্ভাগ্য এই ছিল যে, সকল নর্তকীদের মধ্যে সে-ই ছিল সবচাইতে সুন্দরী ও চিত্রাকর্ষক। তার সম্পর্কে একটি প্রবাদ ছিল যে, কাউকেই সে সত্যিকারভাবে মন দিতে পারেনি।

আওহাম খান বাজবাহাদুরের রাজ্য থেকে অজস্র ধনসম্পদ ও মালে গণিমত (লুটের মাল) লাভ করেন। আওহাম পূর্বেকার নিয়ম ভঙ্গ করে বাদশাহকে এই প্রাপ্ত সম্পদের নির্বাচিত দ্রব্যাদি দান থেকে বিরত থাকেন।

আওহাম এমনভাবে কথা বলতেন এবং চলতেন, যেন মনে হতো তিনি কারো, কাছে কোন ব্যাপারে জবাবদিহি করবেন না। তিনি নিজেই স্বয়ং সম্পূর্ণ শাসনকর্তা, তার এই অভিব্যক্তি দেখে বাদশাহ আকবর খুব ক্ষুব্ধ হন

এবং হঠাৎ একদিন অতর্কিতে আগ্রা থেকে সারংপুর রওনা হয়ে যান। মহম আংগা ব্যাপার অনুমান করে একজন দ্রুতগামী কাসেদ সেখানে প্রেরণ করেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে কাসেদের পূর্বেই আকবর সেখানে পৌঁছেন। দ্বিতীয় দিন মহম আংগাও সারংপুর পৌঁছেন এবং পরিস্থিতি আয়ত্তে আনেন। মহম আংগা আওহামের সমদয় 'মালে গণিমত' এনে আকবরের পদপ্রান্তে উপস্থিত করেন। সম্রাট খুশী হয়ে আগ্রা ফিরে আসেন। কিন্তু আওহাম সব কিছু দেওয়ার পর গোপনে প্রাপ্ত দু'জন নর্তকী নিজের কাছে রেখে দিয়েছিলেন। গোপনে কে একজন বাদশাহকে লিখে জানিয়ে দিল ব্যাপারটা। বাদশাহ নর্তকী দু'জন পাঠিয়ে দেবার জন্যে লিখলেন। মহম আংগা দেখলেন এতে অনেক গোপন তত্ত্ব ফাঁস হয়ে যাবে, এজন্যে তাদেরকে মেরে ফেলা হল।

মিসেস এনিটা আকবরের প্রশংসা করে বলেন, বহুকাল ধরে মহম আকবরকে প্রতিপালন করেছেন। এই ঘটনা ছাড়া মহম-এর কার্যকলাপে আর কোন খুঁৎ ছিল না। আকবরের বয়েস যখন উনিশ তখনই এ ঘটনার প্রেক্ষিতে মহমের বিরুদ্ধে তিনি প্রকাশ্য বিদ্রোহ প্রকাশ করেন। এই বিদ্রোহ এমন সময় করেন যখন মহম আংগা তার ব্যক্তিত্ব এবং রাজত্বকে ধ্বংস করার পথে চালিত করতে সচেষ্ট হন।

আকবর জানতে পেরেছিলেন বন্দী নর্তকী দুটোকে মহম আংগাই হত্যা করিয়েছেন। কিন্তু এই কথা মহমের কাছে প্রকাশ করলেন না আকবর। তবে তার আধিপত্য থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি।

আওহাম এবং মহম-এর অভিপ্রায় ছিল মোনেম খান প্রধান মন্ত্রীর আসন অলংকৃত করবেন। কিন্তু তাদের প্রস্তাবের বিরোধিতা করে আকবর শামসুদ্দিন আহমদ গজনভীকে তলব করে এই পদ প্রদান করেন।

শামসুদ্দিন আহমদ একজন অশিক্ষিত লোক ছিলেন। কিন্তু খুবই শক্তিশালী এবং দৃঢ়চেতা লোক ছিলেন। কিন্তু তিনি এলে মহম এবং আওহাম তার পতনের জন্যে চক্রান্ত শুরু করেন। একদিন ঘটনাক্রমে শামসুদ্দিন আহমদ দরবার হলে বসে কোরআন তেলাওয়াত করছিলেন এমন সময় আওহাম অতর্কিতে সেখানে পৌঁছে তাকে নির্মমভাবে হত্যা করেন। এ ঘটনা ১৫৬২ সালের ১৬ই মে তারিখে সংঘটিত হয়। হত্যা করার পর আওহাম হেরেমের দ্বার উন্মুক্ত পেয়ে সেদিকে

দৌড়াল। শোরগোল শুনে আকবর বেরিয়ে এলেন। আওহাম ধরা পড়ে গেল এবং প্রকৃত ঘটনা লুকালো না। আকবর অগ্নিশর্মা হয়ে আওহামকে আক্রমণ করেন এবং ছাদ থেকে নীচে ফেলে দিয়ে হত্যা করেন। অতঃপর আকবর নিজেই মহমকে যেয়ে সব ঘটনা ব্যক্ত করেন। বায়েজিদ বিয়াতের বর্ণনা মতে, আকবর মহমকে চীৎকার করে সজোরে বললেন, 'আমি আওহামকে হত্যা করেছি।'

শোকে দুঃখে মহম রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। এই ঘটনা তার অন্তরাত্মাকে মোচড়ে দিয়েছে যেন।

বাদায়ুনীর বর্ণনা মতে, মহম আংগা তার পুত্রের মৃত্যুর চল্লিশ দিন পর (ইসালে ছওয়াব উপলক্ষে যখন ফকির মিসকিনকে দান খয়রাত করা হচ্ছিল) মৃত্যুবরণ করেন। এই মৃত্যু মহম আংগার একটি বিশ্বাসেরই বহিঃপ্রকাশ যে, প্রিয়জনদের আত্মা চল্লিশতম দিনে শেষ বারের মতো বিদায় নেয়। এবং চল্লিশ-তম দিনে যে কাঙ্গালী ভোজ দেয়া হয় তা খেয়েই তৃপ্ত মৃত ব্যক্তির আত্মা চিরতরে সকলের কাছ থেকে বিদায় নেয়।

মা এবং পুত্রকে একই স্থানে দাফন করা হয়। আকবর ধাত্রীমাতার প্রতি তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রদর্শনের জন্য জানাজা নামাজে শরীক হন।

শাহী পরিবারের মহিলাদের মধ্যে মাহচুচক বেগমের কার্যকলাপ সকলের শিরপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মাহচুচক সম্রাট হুমায়ুনের সর্বকনিষ্ঠা বেগম ছিলেন। ১৫৪৬ সালে হামিদা বেগম যখন কান্দাহার থেকে কাবুলে আসেন তখন হুমায়ুন তাকে (মাহচুচক) বিয়ে করেন। তিনি কোন উচ্চ বংশীয় মহিলা ছিলেন না তবে মোহাম্মদ হাকিম মির্জার মাতা ছিলেন বিধায় বেশ সম্মানীয়া ছিলেন।

১৫৫৪ সালে হুমায়ুন যখন কাবুল থেকে হিন্দুস্থান অভিমুখে যাত্রা করেন তখন মাহচুচকের তিন বছর বয়স্ক পুত্রকে নাম মাত্র কাবুলের গভর্নর মনোনীত করেন। প্রকৃতপক্ষে গভর্নর ছিলেন মোনেম খান। ১৫৫৬ সালে যখন আকবর সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন পূর্বেকার নিয়ম বলবৎ করা হয়।

১৫৬১ সালে মোনেম খানকে যখন দরবারে তলব করা হলো তখন কাবুলে তিনি তার পুত্র 'গনি'কে রেখে আসেন। কিন্তু গনি ছিল একটু বোকা প্রকৃতির। এজন্যে মাহচুচক বেগম চক্রান্ত করে তাকে কাবুল থেকে বিতাড়িত করেন। গনি

অতঃপর হিন্দুস্থানের দিকে রওনা হয়। এই ফাঁকে মাহচুচক তাঁর পুত্রকে পুনরায় কাবুলের সিংহাসনে বসান এবং দিব্যি শাসনকার্য চালাতে থাকেন। তিনি (মাহচুচক) এ ব্যাপারে তিনজনের সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন ; তন্মধ্যে দু'জনকে গোপনে হত্যা করা হয় এবং একজনকে উপদেষ্টা হিসাবে বলবৎ রাখা হয়।

এসব খবর যখন আগ্রাতে পৌঁছে সম্রাট আকবর সৈন্যসামন্ত সহ মোনেম খানকে কাবুলে প্রেরণ করেন। মোনেম খানের সৈন্য সংখ্যা কম ছিল। জালালাবাদ অঞ্চলে মাহচুচক ও মোনেম খানের সৈন্যদের মোকাবিলা হয় এবং যুদ্ধে মোনেম খান শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। এর পর মোনেম খান হিন্দুস্থানের দিকে পালিয়ে আসেন।

এই বিজয়ের পর মাহচুচক অপেক্ষাকৃত গর্বিনী হয়ে পড়েন এবং তিনি তার অবশিষ্ট উপদেষ্টাকে হত্যা করে হায়দর কাশেম কোহবর নামক এক ব্যক্তিকে উপদেষ্টা নিয়োগ করেন। শোনা যায়, এই লোকটি মাহচুচকের শয্যাসঙ্গীও ছিলেন।

১৫৬৪ সালে আবুল মা আলী হিন্দুস্থান থেকে পালিয়ে কাবুলে পৌঁছেন। মাহচুচক তাকে স্বাগত জানান এবং তার স্বল্প বয়েসী মেয়ে ফখরুন্নেসার সাথে তার বিয়ে দেন।

আবুল মা আলী বড় দুষ্ট লোক ছিলেন। কিছুকাল পরই তিনি মাহচুচককে নিজের হাতে জবাই করে হত্যা করেন। এরপর হায়দর কাশেমকেও হত্যা করেন। কাবুলের লোকরা এভাবে যখন তার অত্যাচার এবং সন্ত্রাসে নিপীড়িত হয়ে প্রতিবাদ করতে শুরু করে, তখন তিনি কাবুলে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেন।

মোহাম্মদ হাকিম মির্জা সমুদয় ঘটনা সোলায়মান মির্জা এবং হেরেম বেগমকে লিখে জানান। হেরেম বেগম স্বয়ং সৈন্য পরিচালনা করে বদখশান থেকে কাবুলের দিকে অগ্রসর হন। আবুল মা আলী তাকে স্বাগত জানান এবং পরাজিত হয়ে বন্দী হন। হেরেম বেগম তাকে শাহাজাদা হাকিম মির্জার কাছে প্রেরণ করলে মির্জা তাকে হত্যা করেন।

হেরেম বেগম ওদিকে সোলায়মান মির্জার কার্যকলাপে বিশেষ অসন্তুষ্ট ছিলেন। পূর্বে বলা হয়েছে তিনি কি.ভাবে তার স্বামীর দয়িতা মোহতারেমা বেগমকে কৌশলে তার পুত্রের সাথে বিয়ে দেন। এর কিছুকাল পর পিতাপুত্র মিলে হেরেম বেগমের এক ভাইকে হত্যা করে ফেলে। হেরেম বেগম স্বামীর

বিরুদ্ধে স্বচ্ছন্দেই লড়তে পারতেন, কিন্তু পুত্রের বেলায় তিনি কিছুই করতে পারছিলেন না। নিজের মনোকষ্ট দূর করার জন্যে তিনি কাবুলে চলে আসেন। এখানে মোনেম খানের সাথে দেখা হলে তিনি তার নিকট আকবরের কাছে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। মোনেম খান মধ্যস্ততা করে স্বামীস্ত্রীর সাথে সমঝোতা করিয়ে দেন। এরপর হেরেম বেগম বদখশান চলে যান।

সম্ভবত: এ ঘটনা আবুল মা আলীর পরিণতির পূর্বেকার ঘটনা। আবুল মা আলী নিহত হওয়ার পর সোলায়মান মির্জা তার কন্যাকে বদখশান থেকে আনিয়ে নেন এবং হাকিম মির্জার সাথে বিয়ে দেন। কিন্তু যেহেতু তিনি কাবুলের আবুল মা আলীকে অসির বলে দাবিয়ে রেখেছিলেন এজন্যে কাবুলের কিছু জায়গীর বদখশানীদের মধ্যে বণ্টন করে দেন এবং কিছু লোককে এখানে রেখে যান। সোলায়মান মির্জা কিছুদিন পর কাবুল থেকে বদখশান ফিরে চলে আসেন। তিনি ফিরে এলে কাবুলের লোকরা বদখশানীদেরকে খুব মার পিট করে। বাধ্য হয়ে সোলায়মান মির্জাকে আবার কাবুলে আসতে হলো। হাকিম মির্জা তার জামাতা হওয়া সত্ত্বেও কাবুল থেকে পালিয়ে গেল এবং সিন্ধু নদীর দিকে ধাবিত হলো। উদ্দেশ্য ভাই-এর কাছে অভিযোগ করবেন। যখন শাহী ফৌজ কাবুলের দিকে অগ্রসর হলো সোলায়মান মির্জা এবং হেরেম বেগম বদখশানের দিকে পালিয়ে যাওয়াকেই শ্রেয় মনে করলেন।

১৫৬৬ সালে হেরেম বেগম, মির্জা সোলায়মান এবং তার মেয়েরা পুনরায় কাবুল উপনীত হলো। এবারে তাদের পরিকল্পনা ছিল যে ভাবে হোক, হাকিম মির্জাকে ছলনার মাধ্যমে পাকড়াও করবেন। কিন্তু তাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

মির্জা সোলায়মান খুবই অযোগ্য লোক ছিলেন। হেরেম বেগমের কল্যাণেই তার সব স্বার্থ সংরক্ষিত হয়েছিল। এদিকে হেরেম বেগমের মৃত্যুর পর সোলায়মান মির্জার কাছ থেকে পৌত্র শাহরুখ (মোহতারেমার পুত্র) বদখশান কেড়ে নেন এবং মির্জাকে বদখশান থেকে বহিষ্কার করেন।

মিসেস এনিটা এরপর হামিদা বানু বেগমের ভাই খাজা মোয়াজ্জেম-এর ঘটনাবলী বিবৃত করেন। এই খাজা মোয়াজ্জেম শাহী মহিলাদের জন্যে একটা শির পীড়ার কারণ ছিল। শৈশব এবং যৌবনকালে তার কিছু পাগল সুলভ কার্যকলাপ দৃষ্ট হয়। আসলে তার মধ্যে কিছু পাগলামীর বীজ ছিল। এজন্যে

বৈরাম খান কৌশলে তাকে রাজ্য থেকে বহিষ্কার করেছিলেন এবং তার খরচ নির্বাহের জন্য কিছু দেয়া হতো। বৈরাম খানের পতনের পর খাজা মোয়াজ্জেম একটা জায়গীর লাভ করেন। ক্রমশঃ আকবর তার প্রতি একটু দৃকপাত করেন। অবশ্য আকবর তাকে ভাল চোখে দেখতেন না। কিন্তু যে বারে খাজা দুজন লোক হত্যা করে ফেলল আকবর তার উপর আরো ক্ষেপে গেলেন।

খাজা মোয়াজ্জেম বোন হামিদা বানুর উপর প্রয়োজনের চাইতে বেশী বোঝা চাপাত। হুমায়ুনের সাথে তার বিয়ে হবার সময় হামিদা বেগমের এই উপলব্ধি ছিল যে, বংশ মর্যাদার প্রশ্নে তিনি হুমায়ুনের চাইতে নিম্নস্তরের। এজন্যে হুমায়ুনের সাথে তার বিবাহ অসামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ বিবাহ সম্পন্ন হলো। এই বিবাহের কল্যাণে খাজা মোয়াজ্জেমও জাতে ওঠার সুযোগ পেল। প্রকৃতপক্ষে তার নিজের যোগ্যতার চাইতে তিনি বেড়ে গিয়েছিলেন।

১৫৬৪ সালে বিবি ফাতেমা সম্রাট আকবরের কাছে অভিযোগ করলেন যে, খাজা মোয়াজ্জেম তার পত্নী জোহরাকে মেরে ফেলার ধমকী দিচ্ছে। বলা বাহুল্য বিবি ফাতেমা জোহরার মাতা ছিলেন। একথা শুনে সম্রাট আকবর খাজার কাছে পয়গাম পাঠালেন যে, তিনি তার কাছে আসছেন। আকবর যখন তার কাছে পৌঁছলেন, খাজা তার স্ত্রীকে ছুরিকাহত করে হত্যা করেন এবং রক্তাক্ত ছুরি আকবরের লোকদের চোখের সামনে এমনভাবে আন্দোলিত করেন যে, মনে হলো বেশী বাড়াবাড়ি হচ্ছে এবং তাদের উপরও ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেন। আকবর এই বেআদবী সহ্য করতে পারলেন না। নিজের খাদেমকে নির্দেশ দিলেন তাকে যেন তুলে এনে নদীতে নিক্ষেপ করা হয়। আবুল ফজলের নির্দেশ মতো তাকে নদীতে নিক্ষেপ করা হলো, কিন্তু খাজা ডুবে যাননি।

নিজামুদ্দিন আহমদের বর্ণনা মতে, নদীতে নিক্ষেপ করার পূর্বে শাহী ভৃত্যকুল তাকে খুব মারধোর করে এবং পরে নদীতে ফেলে দেয়। নদীতে ফেলে দেবার পর তিনি যখন ডুবে মরেননি, তখন তাকে পাকড়াও করে গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী করে রাখা হয় এবং আমরণ এই অবস্থাতেই ছিলেন।

১৫৭১ সালে শাহী খান্দানের আরো এক মহিলা পর্দার বাহিরে চলে এলেন তাঁর নাম ছিল নাহিদ বেগম। সম্রাট বাবুরের বৈমাত্রেয় ভাই কাশেম কোকার কন্যা এই নাহিদ বেগম সম্পর্কে গুলবদন বেগম বলেন, নাহিদের মা ছিলেন মাহচুচক বেগম আরগাউন। খলিফা নিজামুদ্দিন বলাসের পুত্র মোহেব আলীর

সাথে তার বিয়ে হয়েছিল। মোহেব আলী সামরিক বাহিনীতে উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌঁছেছিলেন। কিন্তু আজকাল একান্ত নিরিবিলি জীবন যাপন করছেন।

নাহিদের মাতা মাহচুচক তৃতীয় বার ঈসা তোর্খানের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ঈসা তোর্খানের প্রথম পক্ষের পুত্র মোঃ বাকী তোখান আর-গাউনের সাথে অবনিবনা ছিল। এজন্যে ঈসা তোর্খানের সাথে মাহচুচকের বিচ্ছেদ ঘটে।

নাহিদ ১৫৭১ সালে তার মায়ের সাথে দেখা করতে যান। বাকী তোর্খান নাহিদের উপস্থিতিতেই তার মাকে জেলে আবদ্ধ করেন এবং নাহিদের সাথে দুর্ব্যবহার করেন। নাহিদ ফিরে এসে সম্রাট আকবরের কাছে এসব বৃত্তান্ত ব্যক্ত করেন। নাহিদ আকবরকে এও জানান যে, তিনি সুলতান মাহমুদ ভক্করের সাথে এ ব্যাপারে আলাপ করেছেন। ইনি শাহ হোসাইনের পক্ষ থেকে ভক্করের শাসনকর্তা ছিলেন এবং ইনিই ভক্করে হুমায়ুনকে বেদখল করেছিলেন। এজন্যে ১৫৫৫ সালে সিদ্দি আলী রইস আপোষ-মীমাংসার চেষ্টা করেছিলেন। সুলতান মাহমুদ প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে, তিনি থাট্টা আক্রমণ করবেন যদি মোগল সৈন্য তার সহযোগিতা করে।

বাকী আরগাউনকে আক্রমণের জন্য নাহিদ আকবরের প্রতি চাপ দেন এবং সৈন্য ও অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করতে থাকেন। ত্বরিৎ মোহেব আলীকে এনে সেনাধ্যক্ষ বানিয়ে সিন্ধু অভিমুখে বাহিনী রওয়ানা করা হলো। এদের সঙ্গে নাহিদ বেগমও ছিলেন। তাছাড়া মোহেব আলীর অন্য এক পত্নী এবং তার পুত্র মোজাহেদ সঙ্গে ছিল।

এই অভিযানের চমকপ্রদ দিক হলো—ছামিয়া যখন দেখতে পেলেন যে, পরিস্থিতি তার ইচ্ছামাফিক নয় তখন তিনি আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং শাহী বাহিনীর বিরুদ্ধে এক মজবুত মোর্চা তৈরী করেন। শেষাবধি মোহেব আলী অন্য শহরে তার অবস্থান করে নেন। এরপর নাহিদ বেগম এবং ছামিয়া বেগম-সম্পর্কে আর কিছু জানা যায়নি। সম্ভবতঃ তারা শেষাবধি আকবরের দরবারে স্থান করে নিয়েছিলেন।

নিজামুদ্দিন আহমদ গুজরাটের অভিযানের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, এই অভিযানে মহিলারা এত বেশী আনন্দ করেছিল যে, আনন্দ করতে করতে মৃত্যুর দ্বার পর্যন্ত উপনীত হয়েছিল। এতে মনে হয় তখন এরা সকলে আকবরের

সাথে ছিলেন। এই সফরের সময় একটি খবর রটিয়ে গেল যে, কামরানের মেয়ে গুলরুখ তার ছেলেকে নিয়ে পালিয়ে গেছে। গুলবদন বেগমও এই সফরে রাজকীয় কাফেলার সাথে ছিলেন। শিবিরের বর্ণনার সময় তার-শিবির হামিদা বেগমের পাশে রচনা করা হয়েছিল বলে বলা হয়েছে। এই শিবির শাহী আওতার বাইরে ছিল না এবং আকবরের ব্যক্তিগত শিবিরের দূরে ছিল না।

আমাদের লেখিকা গুলবদন বেগম সম্পর্কে ঐতিহাসিকরা এ ধারা নীরব রয়েছেন এজন্যে যে, সম্ভবতঃ গুলবদন ব্যক্তিগতভাবে স্বামী ও পুত্র পরিজন নিয়ে সংসারধর্মে নিয়োজিত ছিলেন বেশীর ভাগ। অবসর সময়ে তিনি কাব্যরচনা করতেন, বইপুস্তক পড়তেন এবং চিত্তবিনোদনমূলক কাজে নিয়োজিত থাকতেন। তিনি হিন্দুস্থানে এসে এমন কিছু হয়ত পেয়েছিলেন যার মধ্যে ডুবে থেকে তিনি সময় কাটাতেন।

গুলবদন বেগম হিন্দুস্থানে অবস্থান কালে একজন মেয়ে হিসাবে তিনি তার পরিচিত পরিবেশের মেয়েদের জীবন সম্পর্কে নিশ্চয়ই কৌতূহলী হয়েছেন। স্বামীর মৃত্যুর পর এখানকার মেয়েদের সতী জীবন যাপন কেমন ঠেকেছে অথবা 'জওহর' রীতি তার কাছে কেমন লেগেছে তাই বা কে জানে।

এই দু'টো হিন্দু রীতি, অন্যান্য প্রচলিত রীতির তুলনায় একটু ব্যাতিক্রম ছিল।

গুলবদন বেগম নিজের পরিবারের কয়েদী মেয়েদের জীবন নিয়ে পর্য-বেক্ষণ করেছেন। কেননা, তাঁর কিছু সংখ্যক আত্মীয় পরিস্থিতির চাপে বাধ্য হয়ে শত্রুদের বিবাহ করেন এবং এই বিজাতীয়দের সাথে শান্তিপূর্ণভাবে জীবন পাত করেন।

তৈমুরী মহিলাগণ ভারতীয় মেয়েদের জীবনকে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখেছেন। এখানকার বিবাহিত জীবনের মানদণ্ড এবং প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্নতর ছিল। গুলবদন বেগম এই ভিন্নতর জীবন সম্পর্কে কিছু তাঁর শৈশবে অবলোকন করেছেন, কিছু তার পরিণত পারিবারিক জীবনে। তিনি সম্মিলিত পারিবারিক জীবনের সমস্যাবলী বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। তিনি নিশ্চয়ই হিন্দু-স্থানের রাজপুত মহিলাদের রীতিনীতি সম্পর্কে শুনে থাকবেন। স্বামীর মৃত্যুর পর রাজপুত মহিলাগণ সতী হয়ে যান। পক্ষান্তরে তাদের স্বামীরা

স্ত্রীদের সন্দেহ পোষণ করলে নিজহস্তে পুত্র ও স্ত্রীকে হত্যা করেন এবং স্বচ্ছন্দে দুশমনদের সাথে যুদ্ধ করে প্রাণ দান করেন।

গুলবদন আকবরের আমলে এ ধরনের অনেক ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করেছেন। বিশেষতঃ হিন্দুস্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীরা স্বামীর চিতার সাথে সহমরণ বরণ করেন, এ দৃশ্য তার মনে কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে।

যেহেতু গুলবদন তাদের ভাষা বুঝতে পারতেন না। এজন্যে আকবরের রাজপুত স্ত্রীগণ গুলবদন ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনদের সে গীত শুনাতে পারেননি, যা কিনা রাজপুত মহিলারা স্বামীদের মৃত্যুর পর গেয়ে থাকে। অথবা সে গীত যা, সতী সাবিত্রী—রাজপুত মহিলাদের উদ্দেশ্যে তাদের কবিরা পাঠ করতেন, অথবা তাদের ঐতিহ্যবাহী পুরা কাহিনীসমূহ।

গুলবদন বেগম প্রত্যক্ষ করেছেন আরো একটি ব্যাপার, তা হলো হিন্দু মেয়েরা যুগপৎ তাদের মন্দির ও দর্শনীয় তীর্থস্থানগুলোতে এবং মুসলমানদের পীরমোরশেদদের মাজারে সমান ভক্তি সহকারে যোগদান করতো।

গুলবদন বেগম ১৫৭৫ সালে হজ্জে গমন করেন। হজ্জ থেকে ফিরে আসতে তার বিলম্ব হচ্ছিল, আকবর এই বিলম্ব সহ্য করতে পারছিলেন না, সম্ভবতঃ তিনিও ফুফুর সাথে হজ্জে যেতে চেয়েছিলেন।

আকবর পাকা শপথ নিয়েছিলেন যে, তিনি হজ্জ করবেনই। কিন্তু যখন হজ্জের কাফেলা চলতে শুরু করে তিনি শুধু তাদের সাথে কিছু দূর পর্যন্ত চলেন এবং হাজীদের মতো এহরাম বেঁধে 'আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক' পাঠ করতে থাকেন। আকবর যদিও নিজে হজ্জ করেননি, তবে তিনি অন্যান্যদের করতে সুযোগসুবিধা প্রদান করেন। হাজীদেরকে প্রচুর অর্থদান করেন। প্রতিবার যেসব হাজীরা মক্কায় যেতেন তাদের জন্যে আকবরই 'আমীর' নিযুক্ত করতেন এবং অনেক অর্থদান করতেন। মক্কা ও মদীনার জন্যে বহুমূল্য উপঢৌকনও তাদের হাতে দেয়া হতো।

গুলবদন বেগম এর সাথে 'মহরম' হিসাবে গমন করেছিলেন সুলতান খাজা। আকবর তাকে বার হাজার খেলাত প্রাদান করেছিলেন। ফেরার সময় সুলতান খাজা তাকে নিয়ে আসার দায়িত্ব পালন করেন নি। ইয়াহিয়া খাজা গুলবদনকে নিয়ে আসেন।

আবুল ফজল এই হজ্জযাত্রী মহিলাদের একটি তালিকা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। এছাড়াও অন্যান্য যেসব মহিলা গুলবদন-এর একান্নযাত্রী (হামরেকাব) ছিলেন তাদের সকলের খরচপত্র শাহী কোষাগার থেকে পূরণ করা হয়েছিল।

এই তালিকায় গুলবদনের নাম ছিল শীর্ষে। দ্বিতীয় নম্বর বৈরামখানের বিধবা ও আকবরের স্ত্রী সেলিমা সুলতান বেগম-এর নাম ছিল। তার হজ্জ করার খুব শখ ছিল বলে আকবর তাকে হজ্জের অনুমতি দিয়েছিলেন। তৃতীয় মহিলা ছিলেন আকবরের চাচী সুলতানুম বেগম আসকরী মির্জা। আকবর যখন শৈশবে একবার বন্দী হয়েছিলেন এই মহিলা তাকে আদরযত্ন—করেছিলেন। অনুমিত হয়, এই মহিলা বহু দিন ধরে আকবরের আশ্রয়ে রয়েছেন। আকবরই তার সকল খরচপত্র বহন করছেন। এরপর গুলবদন বেগম ও দুজন ভ্রাতুষ্পুত্রী (কামরান মির্জার কন্যা), হাজী বেগম ও গুলজার বেগম-এর নাম ছিল। হাজী বেগম-এর সম্ভবতঃ এটা ছিল দ্বিতীয় দফা হজ্জব্রত। প্রথম বার তিনি তার পিতা কামরান মির্জার সাথে যখন মক্কায় গিয়েছিলেন তখন হজ্জ করেছিলেন। এই দুই বোন হজ্জব্রত ছাড়াও তাদের পিতা কামরান ও মাতা মাহচুচক বেগমের মাজারে অশ্রু বিসর্জন করার জন্যে গিয়েছিলেন। এরপর গুলবদনের পৌত্রী উম্মে কুলসুম (পুত্র সাদত ইয়ার-এর কন্যা) এবং শেষ নামটি ছিল সেলিমা খানম-এর। ইনি বোধহয় গুলবদন অথবা খিজির খাজার কন্যা ছিলেন।

শাহী পরিবারের এই মহিলা ছাড়াও এই দলে গুলবদনের এক পুরনো সই গুলনার আগাচা ছিলেন। সম্ভবতঃ এই গুলনার আগাচা সম্রাট বাবুরের সম্মানে শাহ তাহমাসপ'-এর পক্ষ থেকে প্রদত্ত বাঁদীদের অন্যতম। ইনি বয়েসে গুলবদন বেগম-এর চেয়ে বড় ছিলেন। সম্রাট বাবুরের অন্য একজন বাঁদী 'সেরুকদইয়া সারভে' এই দলে ছিলেন। ইনি মোনেম খানের বিধবা ছিলেন।

হুমায়ুনের বাঁদীদের মধ্যে থেকে সাফিয়া ও শামিমও এ দলে ছিলেন।

১৫৭৫ সালের ১৫ই অক্টোবর এই হজ্জযাত্রীগণ ফতেহপুর সিক্রি থেকে রওনা করেন। নির্ধারিত সময়ের বহু পুর্বেই এঁরা রওনা হন। কারণ, মহিলাগণ ভাল ঘোড়াসওয়ার ছিলেন না। সাধারণতঃ হজ্জযাত্রীগণ আগ্রা থেকে দশম মাসে রওনা হয়, কিন্তু এইদল সপ্তম মাসে রওনা হন।

আকবরের দ্বিতীয় পুত্র মুরাদ এই দলের সাথে সমুদ্রতীর পর্যন্ত আসেন। সেলিম (জাহাঙ্গীর) এদের সাথে কিছুদুর এসে ফিরে যাবার অনুমতি প্রার্থনা করেন। মুরাদের দায়িত্ব ছিল সুরাত অবধি এদের সাথে থাকবেন। কিন্তু গুলবদনের আবেদনক্রমে তাকে তাড়াতাড়ি ছুটি দেয়া হলো এবং তিনি আগ্রাতে ফিরে এলেন। মজার ব্যাপার হলো যে, এ সময় শাহজাদার বয়েস ছিল মাত্র ৪/৫ বছর। এই দলের দেখাশুনার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল মোহাম্মদ বাকী খান ও রুমী খান আলীপু (উভয়ে সম্রাট বাবুরের তোপ-খানাধ্যক্ষ ছিলেন)-এর ওপর। কিন্তু সবচাইতে দুঃখের বিষয়, গুলবদন বেগম এই হজ্জযাত্রার বিবরং, তিনি নিজে লিপিবদ্ধ করেন নি।

এই দল সুরাট থেকে জাহাজে আরোহণ করেন। কিন্তু সুরাট অবধি তারা কোন পথে গমন করেছিলেন তা জানা যায়নি।

১৫৮০ সালে ফাদার রুডলেফ আগ্রা এবং সুরাটের মধ্যবর্তী অঞ্চল সফর করেছিলেন। এ সময়ে এতদঞ্চলে যে ফৌজি কার্যকলাপ হয়েছিল তার ভিত্তিতে অনুমান করা চলে যে, এই মহিলারা যেসব অঞ্চলে গমন করেননি ফাদার রুড-লেফ সেখানেও গিয়েছিলেন। এই কাফেলা সুরাটে এসেছিলেন এমন সময় যখন সুরাট দু'বছর পূর্বে শাহী শাসনাধীনে এসেছিল। ফাদার রুডলেফ যখন সুরাট থেকে ফতেহপুর সফর করেন পথেঘাটে রাজপুতরা তখনো নতুন শাসকদের বিরুদ্ধে অস্ত্র প্রদর্শন করছিল।

মহিলাদের সাথে যে সৈন্যবাহিনী ছিল, তারা বিভিন্ন ষ্টেশনে অবস্থান করে করে অগ্রসর হচ্ছিল, নূতন অঞ্চল জয় করা তখন তাদের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।

হাজিদের এই কাফেলার অগ্রগামী দল একটি দুর্গম রাস্তা ধরে সৈন্যদল-এর সাথে যোগসূত্র রচনা করে চলছিল। এদেরকে সৈন্যরা গোলকুণ্ডা অবধি পাহারা দিয়ে নিয়ে আসে এবং আহমদাবাদের পথে এসে নদীপথে সুরাতের দিকে অগ্রসর হয়।

এ সময় কালিজখান আন্দজানী সুরাতের শাসনকর্তা ছিলেন। উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি তৈমুর শাসনের সাথে সম্পর্কশীল ছিলেন। তাঁর পিতা সুলতান হোসেন বেকারার-এর আমীর ছিলেন।

ফ্রেংকস দ্বীপপুঞ্জের সাথে এ সময় সন্ধি ছিল। অথচ মহিলাদের সমুদ্র পারাপার হতে এক বছর গত হয়ে গেল। আকবরনামার মতে, তাদের এই বিলম্বের কারণ এই যে, ভূ-কম্পনের মতো একটা দুঃসংবাদ রটে গেল যে, হাজীদের এক জাহাজ ফিরিঙ্গি দস্যুরা আক্রমণ করেছে। এ খবর এমন সময় রটে গেল যখন মহিলাগণ সালমা নামক এক তুর্কী জাহাজে আরোহণ করেছেন।

প্রকৃত কারণ ছিল পথ প্রদর্শনের সমস্যা। এ সময় ভারতীয় সমুদ্রের—মালিক ছিল পর্তুগীজরা। কোন জাহাজই কূলে নোঙ্গর করতে পারতো না যতক্ষণ পর্যন্ত না পর্তুগীজদেরকে মাসুল দিয়ে পরোয়ানা (ছাড়পত্র) গ্রহণ না করা হতো।

পর্তুগীজদের সম্পর্কে যে আশংকা করা হতো তা খুবই স্বাভাবিক। কেননা, মাসুল (কর) প্রদান করা হলেও এরা প্রায়শঃ জাহাজের লোকদেরকে হত্যা করে জাহাজ লুটে নিতো। এই মহিলাদের জাহাজের ব্যাপারেও পরোয়ানার প্রয়োজন ছিল বৈ কি। কারণ, তারা যে জাহাজে আরোহণ করেছিলেন তা ভাড়াটে জাহাজ ছিল। খাজা সুলতানের জাহাজে একবার পরোয়ানা ছিল না বলে কতদিন ঠেকিয়ে রেখেছিল।

বাদায়ুনী এই রহস্য উদঘাটন করে বলেন, 'মীর হজ্জ' সত্বর বাদশাহর কাছে কাসেদ প্রেরণ করেন। পরিস্থিতি সম্পর্কে বাদশাহকে অবহিত করা হয়। বাদশাহ জবাবে কালিজ খানকে বললেন, তিনি যেন অতি সত্বর এই সমস্যার নিরসন করেন। কালিজ খান সুরাত পৌঁছেন এবং পরিস্থিতি আয়ত্তে আনেন।

মহিলাগণ সুরাতে পৌঁছেন, এভাবে এক বছর গত হয়। অতঃপর তারা সামুদ্রিক জাহাজে আরোহণ করেন এবং তাদের সাগর যাত্রা শুরু হয়।

মক্কা শরীফে পৌঁছে তারা সেখানে সাড়ে তিন বছর অবস্থান করেন এবং চারটি হজ্জ সম্পন্ন করে প্রত্যাবর্তন করেন। যদি গুলবদন বেগম এই হজ্জব্রতের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করতেন তাহলে আমরা জানতে পারতাম, এই সাড়ে তিন বছর মক্কাতে তাদের কিভাবে দিনকাল কেটেছে বা মনমেজাজই বা কি চিন্তায় আচ্ছন্ন ছিল। তাছাড়া কিভাবে হজ্জ সমাপন করেছেন বা রীতিনীতি পালন করেছেন, তাও জানা যেত।

তারা মক্কার উপকণ্ঠে পৌঁছে ছ'মাইল দূরে থাকতেই অন্যান্য হাজীদের সাথে এহরাম বেঁধেছিলেন। 'লাব্বায়েকা, আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক' পাঠ করেছিলেন। শোকরানা নামাজ পড়েছিলেন এবং 'হাজরে আসওয়াদকে' চুম্বন করেছিলেন।

সাত বার কা'বা ঘর প্রদক্ষিণ করেছিলেন। অতঃপর তারা সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে সাতবার দৌড়ান এবং পরে অন্যান্য হাজীদের সাথে মিলিত হয়ে কা'বাতে আসেন হজ্জের নামাজ আদায় করেন। এভাবে হজ্জের অন্যান্য কার্যাবলীও তারা পালন করেন।

শাহজাদী গুলবদন বেগম হজ্জের এই কার্যাবলী দশ দিন একই 'এহরাম বেঁধে' সম্পন্ন করেন। ততদিনে তার এহরাম নোংরা হয়ে গিয়েছিল এবং কোরবানী প্রদানের পর তিনি এহরাম খুলে ফেলেন। অতঃপর পরিচ্ছদ খুলে স্নান করেন। এরপর তিনদিন বিশ্রাম করে পুনরায় কা'বা প্রদক্ষিণে বেরিয়ে পড়েন। পরবর্তী পর্যায়ে অন্যান্য হাজীদের সাথে মদিনা শরীফে রওজা মোবারক জেয়ারত করতে যান।

১৫৭৯ সালে খাজা এহিয়া 'মীরে হজ্জ' (হজ্জযাত্রীদের নেতা) ছিলেন। তাকে বাদশাহ আকবর হুকুম দিলেন যে, তিনি যেন মহিলাদের নিয়ে ফিরে চলে আসেন এবং আসার সময় (সেখানকার) নিদর্শনাদি, উপঢৌকন এবং আরবী গোলাম নিয়ে আসেন। আরবী গোলাম আনয়নের উদ্দেশ্য ছিল সম্রাট হুমায়ুনের সমাধির পাশে যে আরবী সরাইখানার পত্তন করা হয়েছিল তাতে মোতায়েন করা।

প্রত্যাবর্তনের সময়টা আনন্দঘন ছিল, সন্দেহ নেই। কিন্তু কষ্টদায়ক ও দুর্যোগপূর্ণ প্রতিপন্ন হলো এই সফর। সামুদ্রিক জাহাজ এডেনের কাছাকাছি এসে স্থলভূমির সাথে প্রচণ্ড ধাক্কা খায়। এজন্যে শাহজাদী গুলবদন বেগমকেও অন্যান্যদের সাত অথবা বার মাস এডেনে অপেক্ষা করতে হয়েছিল। এডেনের গভর্নর শাহী মহিলা ও অন্যান্য হাজীদের সাথে সদ্ব্যবহার করেননি। এজন্যে তার প্রভু সুলতান মুরাদ (তুর্কীর শাসনকর্তা) তাকে কঠোর শাস্তি দান করেন।

এই অসহনীয় দীর্ঘ প্রতীক্ষার সময় একটি চমকপ্রদ ঘটনার সূত্রপাত হয়। ১৫৮০ সালের কোন একদিনে এই যাত্রীগণ হঠাৎ দেখতে পেলেন যে, সমুদ্রে একটি পালতোলা জাহাজ ক্রমশঃ তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। খোঁজ নেবার জন্যে একটি নৌকা প্রেরণ করা হলো। সৌভাগ্যক্রমে এই জাহাজে বায়েজিদ বিয়াত, আকবরের স্ত্রী-পরিজন ও ছেলেপিলেরা ছিলেন। তারা পরিস্থিতি জানতে পেরে আর সামনের দিকে অগ্রসর না হয়ে তাদেরকে সান্ত্বনা এবং ধৈর্য ধরতে বলেন। আরো বলেন যে, তাদেরকে উদ্ধারের জন্য অতি সত্বর

জাহাজ প্রেরণ করা হবে। যথা সময়ে তাদেরকে উদ্ধারের জন্য জাহাজ এলো। এই জাহাজে চড়ে গুলবদন এবং অন্যান্যরা কখন এডেন ত্যাগ করে সুরাট পৌঁছেন তা জানা যায় না। সুরাটে পৌঁছে গুলবদন বেগম বেশ কিছুকাল এখানে অবস্থান করেন। কেননা, সম্রাট আকবর এ সময়ে কাবুলে ছিলেন। অবশেষে ১৫৮২ সালের মার্চ মাসে গুলবদন বেগমের কাফেলা ফতেহ্‌পুর সিক্রিতে পৌঁছে।

ফতেহ্‌পুর পৌঁছে গুলবদন শাহজাদা মুরাদের পরিণতি দেখে অবশ্যই দুঃখিত হয়েছেন যে, সম্রাট আকবর মুরাদকে ফাদার রুডলেফ-এর কাছে দীক্ষা নিতে নিয়োজিত করেছেন আর ফাদার তাকে খ্রীস্টান ধর্মের তালিম দিচ্ছিলেন। গুলবদন এটা দেখেও যারপর নাই বিস্মিত হয়ে থাকবেন যে, তার ভ্রাতুষ্পুত্র (আকবর) ফাদার রুডল্যাফের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতেন এবং তার সান্নিধ্য কামনা করেন।

স্বয়ং ফাদার রুডলেফের বর্ণনা এই যে, এ ব্যাপারে হামিদা বানু বেগম প্রতিবাদ করেছিলেন। মহলের অন্যান্য পুরনারীগণও তার প্রতিবাদে সাড়া জানান। গুলবদনও এই দলে ছিলেন নিঃসন্দেহে। এমনকি, এ ব্যাপারে হিন্দু মেয়েরাও হামিদা বানুর মনোভাবকে সমর্থন করেছিলেন।

যখন ফাদার রুডলেফ গোয়াতে ফিরে যাচ্ছিলেন সম্রাট আকবর তার সামনে প্রচুর অর্থ সম্ভার উপস্থিত করেন। কিন্তু ফাদার শুধু মাত্র প্রয়োজনের জন্য কিছু টাকা গ্রহণ করেন, যা দিয়ে গোয়া পর্যন্ত খরচ নির্বাহ করা চলে। অবশ্য যাওয়ার সময় ফাদার হামিদা বানু বেগমের কাছে একটি বিষয় উত্থাপন করেন। তাহলো হামিদা বানু বেগমের কাছে একজন রুশ, তার স্ত্রী এবং পুত্রগণ গোলাম হিসাবে নিয়োজিত ছিল। ফাদার তাদেরকে গোয়া নিয়ে যাবার জন্যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন।

হামিদা বানু বেগম যেহেতু ফিরিঙ্গিদের দু'চোখে দেখতে পারতেন না। এজন্যে তার আবেদনের প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপ করলেন না। কিন্তু সম্রাট আকবর যেহেতু ফাদারের অনুরক্ত ছিলেন, এজন্যে এ ধরনের ভৃত্যদের অচিরেই মুক্তি দেয়া হল।

এরপর আমাদের আলোচ্য গুলবদন বেগম 'হুমায়ুন নামা' লিখতে শুরু করেন। 'হুমায়ুন নামাই' এই প্রয়াসের আসল প্রমাণ। এছাড়া অন্য কোন ঐতিহাসিক এ ব্যাপারে কোন কিছু মন্তব্য করেন নি।

'হুমায়ুন নামা' কোন মহৎ সাহিত্য কীর্তি নয়। কিন্তু এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য হলো

লেখিকা যা কিছু নিজ চোখে দেখেছেন এবং শুনেছেন তা প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করেছেন, যাতে করে আকবর নামার লেখকরা তা থেকে তথ্য আহরণ করতে পারেন।

'হুমায়ুন নামা'ই তাঁর একমাত্র লেখা নয়। তিনি মহিলা কবি সুলভ কায়দায় অনেক কাব্য রচনা করেছেন।

মীর মেহদী শিরাজী তাঁর লিখিত 'তাজকেরাতুল খাওয়াতীন' গ্রন্থে গুলবদন বেগমের কবিতার দু'টো চরণ উদ্ধৃত করেছেন:

হার পরী কেউ আশ্‌ক্

খোদ ইয়ার নাশ্‌ত্‌,

তু ইয়াকিন ময়দানী কে হিচ

আজ ওমর বর খোর্দার নাশ্‌ত।

বায়েজিদ হুমায়ুন নামার ৯টি কপি তৈরী করেছিলেন। তন্মধ্যে দু'টি বাদশাহ আকবরের লাইব্রেরীতে রক্ষিত হলো। তিনটি শাহজাদা সেলিম, শাহজাদা মুরাদ ও শাহজাদা দানিয়ালকে দেয়া হল। এক কপি গুলবদন বেগমের কাছে ছিল, দু'কপি আল্লামা আবুল ফজল ও এক কপি বায়েজিদ-এর কাছে রক্ষিত ছিল।

বাদায়ুনী তাঁর পুস্তকে নিজের সম্পর্কে একটি নোট লিখেছিলেন, তাতে প্রতীয়মান হয় যে, সেলিমা সুলতানা পাঠাভ্যাসের প্রতি আসক্ত ছিলেন।

এই নোটটি ছিল—"খোদ আফজা' গ্রন্থ সম্পর্কে। এই গ্রন্থখানি শাহী পাঠাগার থেকে হারিয়ে গিয়েছিল এবং সেলিমা সুলতানা বেগম গ্রন্থখানি পড়তে চেয়েছিলেন। গ্রন্থখানি না পাওয়াতে আমাকে (বাদায়ুনী) সম্রাট আকবর হুশিয়ার করে দিয়ে এক ফরমান জারি করন যে. আমার ভাতা যেন বন্ধ করে দেয়া হয় এবং এই গ্রন্থটি আমার কাছ থেকে উসুল করা হয়।"

এই নোটে বাদায়ুনী প্রসঙ্গক্রমে একথাও উল্লেখ করছেন যে, আল্লামা আবুল ফজল নিজের কোন অভিযোগ আকবরের সামনে পেশ করতেন না। এবং একথাও সুস্পষ্টভাবে বলেন নি যে, সেলিমা সুলতানার প্রার্থিত গ্রন্থটি সম্পর্কে পরবর্তী পর্যায়ে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল।

গুলবদন বেগমের পরবর্তী জীবন সম্পর্কে খুব কম তথ্য জানা যায়। যখন তার বয়েস সত্তর বছর তখনকার কিছু কথা মোহাম্মদ ইয়ারের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। মোহাম্মদ ইয়ার খান তার পৌত্র ছিলেন। তিনি হতাশ হয়ে আকবরের দরবার ত্যাগ করেছিলেন।

বর্ণনা চিত্রে একবার গুলবদন বেগম এবং সেলিমা সুলতানা বেগমকে মিলিত-ভাবে সেলিম সম্পর্কে আকবরের কাছে সুফারিশ করতে দেখা যায়। অন্য এক চিত্রে দেখা যায় সম্রাট আকবর একবার গুলবদন বেগম ও হামিদা বানু বেগমকে টাকাকড়ি ও হীরাজহরত উপঢৌকন দিচ্ছেন।

গুলবদন বেগম খুবই দানশীলা এবং ন্যায়পরায়ণা মহিলা ছিলেন। জীবনে তিনি বহু দানখয়রাত করেছেন। বয়োবৃদ্ধির সাথে তার চরিত্রের এই বিশেষ দিক আরো বেশী উন্নতি লাভ করে। আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র হওয়ার জন্য তিনি বহু অভাবী মানুষের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য প্রদান করেছেন। তিনি আশি বছর বয়েসে ইন্তেকাল করেন। ১৬০৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর সময় হামিদা বানু বেগম তার পাশে ছিলেন। বলা হয়ে থাকে যে, হিন্দাল মির্জার মেয়ে রোকেয়ার মৃত্যুর সময়ও তিনি তার পাশে ছিলেন।

মৃত্যুর মুহূর্তে যখন তিনি নিঃসাড় হয়ে চক্ষু বন্ধ করে নেন, হামিদা বানু বেগম অশ্রু ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললেন, 'আল্লাহ্ তোমাকে বাঁচিয়ে তুলুক'। কিন্তু মৃত্যু পথযাত্রী কোন জবাব দিলেন না। কিছুক্ষণ পর চোখ খুলে কলেমা তৈয়ব পড়লেন এবং একটি কবিতার পুনরাবৃত্তি করে বললেন. 'আমি মরে যাচ্ছি, তুমি যুগ যুগ বেঁচে থাকো'। তারপর শেষ বারের মতো চোখ মুদে ফেললেন।

সম্রাট আকবর তার বর্ষিয়সী ফুফুর জানাজা অনেক দূরে সম্পন্ন করেন এবং তার নামে বহু দান-খয়রাত করেন। তার কবরে দাঁড়িয়ে তিনি নীরবে মৃতের মাগ-ফেরাতের জন্য দোয়া করেন এবং অন্যান্যদের আহাজারী ও মাতম প্রত্যক্ষ করেন।

প্রাসংগিক আলোচনা

গুলবদন বেগমের 'হুমায়ুন নামা' সম্পর্কে ইংরেজ (পাশ্চাত্য জগতের) ছাত্র ছাত্রীরা সবিশেষ অবগত নহেন। অনেকেই জানেন না যে, গুলবদন বেগম 'হুমায়ুন নামা' নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেছেন।

এমনকি মিঃ আরস্কাইন-এর মতো বিশেষজ্ঞ এ গ্রন্থ সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। যদি জানতেন তাহলে তিনি, এই গ্রন্থ থেকে তথ্যাবলী সংগ্রহ করে বাবুর এবং হুমায়ুন সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারতেন। প্রফেসর বেলুচ-ম্যানও এগ্রন্থ সম্পর্কে জানতেন না। অথচ ফারসী গ্রন্থাবলীর ক্যাটালগ

সম্পর্কে তিনি সুবিদিত ছিলেন। যতক্ষণ অবধি ডঃ রিও গুলবদনের হুমায়ুন নামা ক্যাটালগে সন্নিবেশিত না করেন ততদিন তার সম্পর্কে সবই গোপন ছিল। অবশ্য এর পরবর্তী পর্যায়ের খবর কিছুই জানা যায় নি।

বিস্ময়ের ব্যাপার যে, আবুল ফজলের মতো লোকের অবগতির জন্যে যে গ্রন্থ রচনা করা হয়েছে তিনি তার উল্লেখ কোথাও করেন নি। তবে আকবর নামাতে তার কিছু তথ্য অজান্তে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

বায়েজিদের 'তারিখে হুমায়ুন' লেখা সম্পন্ন হওয়ার কয়েকবার তা নকল করা হয়। অথচ তারিখে হুমায়ুন রাজকীয় নির্দেশের প্রেক্ষিতে লিপিবদ্ধ হয়েছিল। হুমায়ুন নামাও নির্দেশ প্রসূত রচনা। স্বভাবতঃই এই গ্রন্থের অনুলিপি হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু এর এমন কোন অনুলিপি নেই যা ইউরোপ বা হিন্দুস্থানের কোন 'কুতবখানা'য় পাওয়া যেতে পারে। মিসেস এনিটা বলেন, এ ব্যাপারে তার স্বামী মিঃ বিউরেচ কয়েক বার বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। ব্যক্তিগতভাবেও খোঁজ খবর নিয়েছিলেন, কিন্তু কোথাও এই গ্রন্থের দ্বিতীয় নোসখা (অনুলিপি) পাওয়া যায়নি। একবার এক ব্যক্তি পত্রে জানাল যে, তার কাছে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় 'নোসখা' রয়েছে। পাণ্ডুলিপি হস্তগত করে পরীক্ষা নিরীক্ষার পর দেখা গেল আসলে তা খেন্দা মীর কৃত 'কানুনে হুমায়ুন' নামক একটি গ্রন্থ। এই পাণ্ডুলিপি বর্তমানে বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে।

শামসুল ওলামা মোহাম্মদ হোসাইন আজাদ তার লিখিত 'দরবারে অকবরী' গ্রন্থে গুলবদন কৃত হুমায়ুন নামার উল্লেখ করে একবার বলার প্রয়াস পেয়েছিলেন যে, এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অনুলিপি তাঁর জ্ঞাতসারে কোথাও রক্ষিত আছে বলে অনুমিত হচ্ছে। একথা শুনে মিঃ বিউরেজ তাঁর সাথে দেখা করেন। কিন্তু জনাব আজাদ তাকে কোন সন্তোষজনক জবাব দিতে পারলেন না। তিনি স্মৃতিশক্তি হারিয়ে রীতিমত অস্বীকার করে বসলেন। বললেন, তিনি এ ধরনের কোন গ্রন্থের নাম পর্যন্ত শোনেন নি।

মিসেস এনিটা তার অনুবাদের পাশাপাশি মূল 'হুমায়ুন নামা'র যে ফারসী টেক্সট ছেপেছেন, তা বৃটিশ মিউজিয়ামের হ্যামিল্টন সংরক্ষণে সুরক্ষিত রয়েছে। বৃটিশ মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষ ১৮৬৮ সালে কর্ণেল জর্জ উইলিয়াম হ্যামিল্টন-এর বিধবা স্ত্রীর কাছ থেকে তা ক্রয় করেন। এই পাণ্ডুলিপিকে ডঃ রিউ ৩৫২ খানি

গুরুত্বপূর্ণ পাণ্ডুলিপির অন্তর্ভুক্ত করেন, যে পাণ্ডুলিপিসমূহ কর্ণেল হ্যামিল্টনের সংগৃহীত (দিল্লী এবং লক্ষ্ণৌ থেকে) এক হাজার পাণ্ডুলিপির অন্যতম।

যেহেতু এই পাণ্ডুলিপির উপরে অযোধ্যার বাদশাহর মোহর (সিল) ছিল না এজন্যে অনুমিত হয় এই পাণ্ডুলিপি দিল্লী থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। লাল রং-এর চামড়ার বাঁধাই ছিল পাণ্ডুলিপিখানি এবং অভ্যন্তরে মার্গিন লাগানো। এই গ্রন্থে কোন সময় কোলোফোন ছিল কিনা জানা যায় না। কেননা, গ্রন্থের শেষ দিকের অনেক পৃষ্ঠা হারিয়ে গেছে। এসময় পুনরায় যে পৃষ্ঠাবলী শেষের দিকে সন্নিবেশিত করা হয়েছে তা যথাস্থানের নয়। সম্ভবতঃ দ্বিতীয়বার বাঁধাই করার সময় এই ভুল করা হয়েছে।

এই গ্রন্থের অন্য কোন অনুলিপি যেহেতু দুষ্প্রাপ্য, এজন্যে অনুমিত হচ্ছে এর খুব কম সংখ্যক কপি করা হয়েছিল। ডঃ রিউ মনে করেন, বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত এই 'হুমায়ুন নামা' লিপিবদ্ধ করার সময় হলো সতের শতাব্দীতে।

স্বাভাবিকভাবে এই গ্রন্থে তুর্কী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। পুরো তুর্কী বাক্যও এতে রয়েছে। সম্ভবতঃ অনবধানবশতঃ ফারসী গ্রন্থে তুর্কী বাক্য লিপিবদ্ধ হয়েছিল। তবে পাণ্ডুলিপি সংশোধনের বেলায় বেশ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে।

গুলবদন বেগমের মাতৃভাষা ছিল তুর্কী। তার স্বামীও তুর্কী ভাষী ছিলেন। সম্ভবতঃ বিয়ের পরে তার পারিবারিক ভাষাও দাঁড়িয়েছিল 'তুর্কী', ফারসীর সঙ্গে গুলবদনের সম্পর্ক কতটুকু ছিল? এ জন্যে প্রশ্ন দাঁড়ায় গুলবদন কাব্যচর্চা কোন্ ভাষায় করতেন, ফারসীতে, না তুর্কীতে? তবে তিনি তুর্কী ভাষা পড়তে পারতেন। কেননা তিনি 'তুজুকে বাবুরী' পড়তেন তা থেকে অনেক কথা 'কোটেশন' হিসাবে গ্রহণ করতেন। এক 'কোটেশন' তো তিনি মৌখিকভাবে শুনেই তা হুমায়ুন নামায় লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

মিসেস এনিটা বলেন, শুধু এক পাণ্ডুলিপির সাহায্য নিতে যেয়ে প্রতিপদে তাকে অসুবিধার সমুখীন হতে হয়েছে। বিশেষতঃ যে সব স্থলে ভাষার গভীরতা সুস্পষ্ট সেখানে এ ধারা সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। *

* 'হুমায়ুন নামার' ইংরেজী অনুবাদক মিসেস এনিটা বিভরেজ ও উর্দু অনুবাদক রশিদ আক্তার নদভীর ভূমিকা অবলম্বনে।